

অধ্যায়-১-৪

২৬৬০

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

১০২. H০৪৪৭৭-৬০-১৯৩৭

(ত্রৈমাসিক)

৬০ ভাগ, প্রথম সংখ্যা-৪২৩৩

৬০.৭৫

৭৬০

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

S. K. Lahar



(৬০)

২৪৩১, বাপার সারদার রোড, কলিকাতা-৩

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির

হইতে প্রিন্টিং প্রেসে ও প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৫৯শ বার্ষিক অধিবেশন

সভাপতি

শ্রীমল্লনীলাস দাস

সহকারী সভাপতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

শ্রীশ্রীকান্তনাথ রায়

শ্রীআচার্য শ্রীযতুনাথ সরকার

শ্রীসেবপ্রসাদ ঘোষ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সম্পাদক

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সহকারী সম্পাদক

শ্রীপাচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

শ্রীস্বলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ সাহা

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীগণপতি সরকার

গুণীকৃত্যধ্যক্ষ : শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীচিত্তাঙ্গরঞ্জন ক্রবর্জী

কার্যনির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

- ১। শ্রীমতুল সেন, ২। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ৩। শ্রীউজ্জ্বল রায়, ৪। শ্রীকান্তনাথ রায়, ৫। শ্রীকানিনীকুমার কব রায়, ৬। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৭। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীকোষাধ্যক্ষ ঘোষ, ১০। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১১। শ্রীজিদিবনাথ রায়, ১২। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়, ১৩। শ্রীশ্রীকান্তনাথ রায়, ১৪। শ্রীসেবপ্রসাদ ঘোষ, ১৫। শ্রীমল্লনীলাস দাস, ১৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১৭। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৮। শ্রীবিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য, ১৯। শ্রীমনোহরেন ঘোষ, ২০। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ২১। শ্রীঅতুলচন্দ্র দে, ২২। শ্রীঅরুণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীমল্লনীলাস দাস, ২৪। শ্রীমল্লনীলাস সিংহ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৬০ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা

সূচি

১। চণ্ডীমঙ্গলেব আরও দুই জন কবি—শ্রীঅজিতোষ ভট্টাচার্য্য	...	১
২। ময়ূর ভট্ট	—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	১৩
৩। গোড়ীয় সমাজ	—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	১৬
৪। ব্রজেননাথ ও বসন্তরঞ্জন	—শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী	২৩
৫। অনুপনারায়ণ তর্কশিবোম্বি	—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৬
৬। বচনসমগ্র, না বিভক্তিবিত্রাট	—শ্রীনীনীগোপাল দাশশর্মা	৩০



পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রদত্ত বহুমুদানিত ১৯৫১-৫২
রবীন্দ্র-স্মারক-পুরস্কারপ্রাপ্ত



ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী :

সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম-২য় খণ্ড : মূল্য ১০/- + ১২/-

সেকালের বাংলা সংবাদপত্রে (১৮১৮-৪০) বাঙ্গালী-জীবন
সম্বন্ধে যে-সকল অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়, তাহারই সম্বলন।

বঙ্গীয় নাট্যশালায় ইতিহাস : (৩য় সংস্করণ)

১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশের
সংস্কৃত ও সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রামাণ্য ইতিহাস।

বাংলা সাময়িক-পত্র : ১ম-২য় ভাগ

৫/- + ২৫/-

১৮১৮ সালে বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্মাবধি বর্তমান
শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সকল সাময়িক-পত্রের পরিচয়।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ১ম-৮ম খণ্ড (২০খানি পুস্তক)

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সাধক ইহার
উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

১৯৪২-৫৩ রবীন্দ্র-স্মারক-পুরস্কার প্রাপ্ত।

বাংলা সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (বঙ্গোত্তর) ১০/-

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—২৪৩/১ আগার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলীর নিম্নলিখিত গ্রন্থকণ্ঠলি প্রকাশিত হইল

সম্পাদক : শ্রীসদলীকান্ত দাস

১। বৃত্তসংহারা কাব্য (১-২ খণ্ড) ৫৯ ২। আশাকামন ২৯ ৩। বীরবাহু কাব্য ১৯

৪। ছারামরী ১১০ ৫। দশমহাবিজ্ঞা ৫০ ৬। চিত্ত-বিকাশ ১৯

সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী পুস্তক পুর্বেই প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্যরমীদের গ্রন্থাবলী

সম্পাদক : ব্রজেন্দ্রনাথ বসুপাধ্যায় ও শ্রীসদলীকান্ত দাস

বঙ্কিমচন্দ্র

উপজ্ঞাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গীতা

আট খণ্ডে বেঙ্গিনে স্মৃতি বোধাই। মূল্য ৭২৯

ভারতচন্দ্র

অন্নদামঙ্গল, বসমঙ্গরী ও বিবিধ কবিতা

বেঙ্গিনে বোধানো—১০৯

কাগজেব মলাট—৮৯

দ্বিজেন্দ্রলাল

কবিতা, গান, হাসির গান

মূল্য ১০৯

পাঁচকড়ি

অধুনা-দুস্তাপ্য পত্রিকা হইতে নির্বাচিত

সংগ্রহ। দুই খণ্ডে। মূল্য ১২৯

মধুসূদন

কাব্য, নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা

বেঙ্গিনে স্মৃতি বোধাই। মূল্য ১৮৯

দীনবন্ধু

নাটক, প্রহসন, গল্প-পঞ্চ দুই খণ্ডে

বেঙ্গিনে স্মৃতি বোধাই। মূল্য ১৮৯

রামেন্দ্রসুন্দর

সমগ্র গ্রন্থাবলী পাঁচ খণ্ডে।

মূল্য ৪৭৯

শরৎকুমারী

‘জীববিবাহ’ ও অন্যান্য

সামাজিক চিত্র। মূল্য ৬১০

রামমোহন

সমগ্র বাংলা রচনাবলী বেঙ্গিনে স্মৃতি বোধাই। মূল্য ১৬১০

বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী। মূল্য ১২১০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—২৪৩১ আপাব গারকুশার রোড, কলিকাতা-৬

ষষ্টিতম বর্ষের

প্রবন্ধ-সূচি

প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠা
নারায়ণ তর্কশিরোমণি	— শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	২৬
নৈতিক বৈয়ব গীতকার	— শ্রীঅমলেন্দু মিত্র	১২৫
ব ও পূর্বভারতীয় সাধনা	— শ্রীমুখার্জ চট্টোপাধ্যায়	৫২, ১০৭
হুজুরগীরীর আবাহপথ	— শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ	১৬৩
‘বিজয়ের রচসিঁতা’		
এবংয়ের প্রতিবাদ	— মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	১১৪
ীয় সমাধ	— শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	১৬
এ প্রতিবাদ	— শ্রীপ্রবোধকুমার দাস	৮৯
এ উত্তর	— শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল	১১
দাস সম্ভা	— মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	৩৩
লের আরও দুই জন কবি	— শ্রীআনুভোষ ভট্টাচার্য্য	১
মজা, না বিভক্তিবিলাট	— শ্রীননী গোপাল দাশশর্মা	৩০
নাথ ও বসন্তরঞ্জন	— শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী	২৩
আ ভাষায় বিজ্ঞানম্বর কাব্য	— শ্রীত্রিদিবনাথ রায়	৬১, ১২২, ১৭৫
ভট্ট	— মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	১৩
কবিচন্দ্রকান্ত		
বিশাললোচনীর গীত	— সঙ্ক° শ্রীকৃষ্ণেন্দু সিংহ রায় ও	
বা বাতুলীমদল	— শ্রীজুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৭, ১৪২, ২০৬
কার বারমাস্তা	— শ্রীমনোবঞ্জন জগদ	১৪০
	— শ্রীননী গোপাল দাশশর্মা	২০২
সিনিষ্ঠাকুর	— শ্রীযাপিকলাল সিংহ	১৩৮
তিন অভিভাষণ	— শ্রীসত্যদীকান্ত দাস	১৫

(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা)

বহুতম ভাগ

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রী গণেন্দ্রকৃষ্ণ নাহা

শ্রী ত্রিদিবনাথ রায়



১৩৬০ বঙ্গাব্দ

চতুর্থীমঙ্গলের আরও দুই জন কবি

শ্রীনাথতোষ ভট্টাচার্য্য

মধ্যযুগের বাংলার মঙ্গলকাব্যের অন্তর্গত বাঙ্গলীমঙ্গল নামক একখানি পুথির কেহ অনুপ-কেও উল্লেখ মাত্র করিয়াছেন, কিন্তু ইহায সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত কোনও পাঠ্যের কোনও আধু. প্রকাশিত হয় নাই। এই পুথিখানি কে কবে, রচনা করিয়াছিলেন, ইহার বিনয়-বতাই বা কবী কি ছিল, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে জানবারীদিগের মিকট গল্প-এই নকল রূপে একেবারেই অজ্ঞাত ছিল। সম্প্রতি বর্ধমান জিলার চকদীঘি গ্রামের 'গোর' বাচ মিউজিয়মে' ইহায একখানি পুথি সংগৃহীত হইয়াছে। পুথিখানির কোন বিবরণ আর পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই।^১ নানা কারণে ইহায বিবরণ একটু সিন্ধিত ভাবে গোপ্য উল্লেখযোগ্য।

পুথিখানির রচয়িতার নাম মুকুন্দ; বচনার মধ্যে তিনি এই প্রকার ভণিতা ব্যবহায করিয়াছেন,—

গা

মুকুন্দ ইতি ভারতী

গা

পদ মঙ্গল নারথী

বচন

যাচয়তি বর পিনাকির্মা।

ব্রজ ৭৭৭।

বাং

মুকুন্দ নাটক

বাংলী মঙ্গল

ময়ূ

ত্রিপুরাচরণাযুগে।

মুকু

মুকুন্দ অভিহিত ব্রাহ্মণ ছিলেন। কারণ, তিনি কোন কোন বিশিষ্ট বিবেচনা দ্বারা মঙ্গল কাব্যের মধ্যে বিজ্ঞ কথোপকথন মুক্ত করিয়াছেন, যেমন,—

চতুর্থীপদ সরসিজে

বাঁ

সেবিয়া মুকুন্দ দিবে

লঙ্গ

বিরচিত মঙ্গল মঙ্গল।

এটা ও

ভাষায় উপস্থাপিত করিয়াছেন; কারণ, কোন কোন ভাষায় তিনি ভাষা ভেদে ভেদে উল্লেখ করিয়াছেন,—

ত্রিপুরা পদারবিহ

মঙ্গলমঙ্গল মঙ্গল

কবিচরিত্রীমুকুন্দ ভণে।

১। বঙ্গী-সাহিত্য-গদ্যবিদে নবাবী-সম্প্রদায় প্রযুক্ত হইয়াছে বঙ্গী-সাহিত্যের বহুবিধ ইহায উপর্য্য উপর্য্য পাঠ্যের কাহিনী আদার কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এইমুদ্রা শুভেন্দু দিগে গ্রামের মঙ্গলদায় শ্রীমতী এই। লক্ষ্যণে ৭৭৭র কথা শুনিতেছি।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দ নামক ব্রাহ্মণ কবির অভাব নাই। তিনি তাঁহাদেরই কেহ কি না, এই বিষয়ে অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারা যায় যে, তিনি তাঁহাদের কেহ নহেন, তিনি একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। বিষয়টি একটু বিস্তৃত আলোচনা করিবা দেখা যাইতে পারে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুকুন্দনামক ব্রাহ্মণ কবিদিগের মধ্যে কবিকল্প মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর নাম সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালীমঙ্গল-বচয়িতা দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দ যে তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র ব্যক্তি, ইহা উভয়ের ব্যবহৃত ভণিতার তুলনা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে। বাঙ্গালীমঙ্গল-রচয়িতা নিজেকে মুকুন্দ বলিয়া উল্লেখ করিলেও কোথাও মুকুন্দরাম বলেন নাই, কিংবা দ্বিজ বলিয়া বাব বাব উল্লেখ করিলেও চক্রবর্তী পদবীর ব্যবহার করেন নাই। তিনি কবিচন্দ্র উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন, কিন্তু কবিকল্প ব্যবহার করেন নাই। অবশ্য মুকুন্দরামের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল কবিচন্দ্র, কিন্তু বাঙ্গালীমঙ্গলের ভণিতায় কবিচন্দ্র স্বতন্ত্র কোন ব্যক্তির নাম নহে, ইহা মুকুন্দের উপাধি। অতএব কবিচন্দ্র মুকুন্দ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কবিকল্প মুকুন্দরাম হইতে স্বতন্ত্র একজন কবি। কবিচন্দ্র মুকুন্দ তাঁহার কাব্যমধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত আত্মপরিচয় দিয়াছেন; তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, তাঁহার পিতামহের নাম দেবরাজ মিশ্র, পিতার নাম বিকর্ত্তন মিশ্র, মাতার নাম হারাবতী, সহোদর ভ্রাতার নাম গদাধর মিশ্র ও তিন পুত্রের নাম রমানাথ, চন্দ্রশেখর ও সনাতন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পরিচয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অতএব মুকুন্দরামের নামে পরবর্তী কালে কেহ এই কাব্যখানা রচনা করিয়াছে, এমন ভুল করিবারও কোনও কারণ নাই।

মধ্যযুগে দ্বিজ মুকুন্দনামক একজন কবি ‘জগন্নাথবিজয়’ বা ‘জগন্নাথমঙ্গল’ নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তিনি মুকুন্দ ভারতী নামে পরিচিত। তাঁহার কোন পরিচয় উক্ত দ্বিজ কবিচন্দ্র মুকুন্দের পরিচয়ের অন্তর্ভুক্ত নহে। অতএব ইহারাও যে পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। দ্বিজ মুকুন্দনামক আর একজন কবি ‘অর্জুনসংবাদ’ বা ‘বৈষ্ণবায়ুড’ নামক একখানি গীতার অনুবাদভাষ্যীয় কাব্য রচনা করেন। তিনি নিজেকে মুকুন্দদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। কবিচন্দ্র মুকুন্দ কোথাও নিজেকে মুকুন্দদাস বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। বিশেষতঃ একজন বৈষ্ণবভাষ্যীয় কাব্য ও অভ্যেক্ষন শাস্ত্র কাব্য রচনা করিয়াছেন। অতএব ইহারাও উভয়ে পরস্পর স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালীমঙ্গল-প্রণেতা কবিচন্দ্র মুকুন্দ মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি। কিন্তু পূর্বোক্ত পরিচয় ব্যতীত কবির আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

আলোচ্য পুঁথিখানি বর্ধমান জিলার মণ্ডলঘাট পরগণার আহুরিয়া গ্রামে অমূল্যিখিত হইয়াছিল বলিয়া পুঁথিখানিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। কবি এই অঞ্চলেরই অধিবাসী হইতে পারেন। বর্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র রায়ের রাজত্বকালে ১৬৫৭ শকাব্দ বা ১১৪২ সাল

পুথিখানির লিপিসমূহ বর্ণিত উল্লিখিত আছে। ইহাতে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। ইহার কবির হস্তলিখিত পুথি নাই; কারণ, ইহাতে লিপিকরের নাম পাওয়া যায় (বিশ্বনাথবাস দি. বিজ্ঞ ১)। অতএব যদি ইহার পূর্বেই বর্তমান ছিলেন, কিংবা তৎপূর্বে বর্তমান ছিলেন, তাহা বলা সঙ্গতসাধ্য নহে। পুথিখানির রচনাকাল সম্পর্কে ইহাতে এই সাক্ষ্য উল্লেখ আছে,—

শান্তে বন বন বেদ পশাদগণিতে।

বাস্তুলীমদল গীত হৈল সেই হতে।

সকলেই অবগত আছেন যে, কবিকল্প মুকুন্দরাম চক্রবর্তিকৃত চণ্ডীমঙ্গলের বঙ্গবাসী-সংস্করণে ইহার রচনা-কালজ্ঞাপক এই দুইটি পদ লেখিতে পাওয়া যায়—

শান্তে বন বন বেদ পশাদগণিতা।

কভ গিঅ দিলা গীত হরেক বনিভা।

কিন্তু ইহা তাঁহার আর কোন মুদ্রিত সংস্করণ কিংবা হস্তলিখিত পুথিতে পাওয়া যায় না। বঙ্গবাসী কর্তৃক ব্যবহৃত মুকুন্দরামের পুথির কোন সন্ধান পাওয়া যাব না। অতএব এমন মনে করা যাইতে পারে কি যে, নাসনামগ্রন্থের অন্য বঙ্গবাসীর মুকুন্দরামকৃত চণ্ডীমঙ্গল-সম্পাদক কবিচন্দ্র মুকুন্দকৃত বাঙ্গালীমঙ্গল রচনার কালনির্ণায়ক পদ দুইটি মুকুন্দরামের পুথি সম্পর্কেই ব্যবহার করিয়াছেন? তাহা না হইলে উক্ত পদ দুইটি বঙ্গবাসী-প্রকাশিত মুকুন্দরামের পুথিতে কোথা হইতে আসিল? এই পদ দুইটি যে মুকুন্দরামের পুথিতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, এই বিষয়েও সন্দেহ এখন কাহারও সংশয় নাই। যদি এই পদ দুইটি কবিচন্দ্র মুকুন্দরামের বাঙ্গালীমঙ্গল হইতেই আনিয়া থাকে, তবে দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালীমঙ্গলের রচনা-কাল ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ বা ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। তাহা হইলে কবিচন্দ্র মুকুন্দ কবিকল্প মুকুন্দরাম হইতে পূর্ববর্তী কবি বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলা যাইতে পারে না। ইহার দুইটি কাবয়; প্রথমভঃ, কবিচন্দ্র মুকুন্দরামের আশীর্বাদে রচনা করিয়া লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়ভঃ, মুকুন্দরাম তাঁহার সময়ে কিছুই উল্লেখ করেন নাই, বরং লিখিত ক্রমে ‘সংগত আজ কবি’ বলিয়া শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। তবে ইহার উত্তরেও বলা যাইতে পারে যে, অন্তর্যঃ কবিচন্দ্রের পুথি পরবর্তী কালে লিপিকর কর্তৃক আধুনিকভায়ে পরিবর্তিত হইয়াছে এবং মুকুন্দরামের বিবরণে কতকটা খণ্ডিত ছিল বলিয়া কিংবা তিনি স্বতন্ত্র অঙ্গলের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া কবিচন্দ্রের বিবরণ ইহা করিয়াই তাঁহার কাব্যে কিছু উল্লেখ করেন নাই, অথবা তাঁহার বিষয় তিনি কিছুই অবগত ছিলেন না। কিন্তু কবিচন্দ্র মুকুন্দরামের বাঙ্গালীমঙ্গল কাব্যের বাব কোন পুথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত এই সকল বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই।

কবিচন্দ্র মুকুন্দরামের বাঙ্গালীমঙ্গলের বিবরণ কবিকল্প মুকুন্দরাম-রচিত অন্তর্ভুক্তকালের বিবরণ হইতে কতকটা খণ্ডিত। কবিচন্দ্র মুকুন্দরামের পুথি দ্বাদশ পাতার বিভক্ত, কবিকল্প মুকুন্দরামের পুথি তেরো পাতার বিভক্ত। কবিচন্দ্র মুকুন্দরামের পুথিতে প্রথম সাতটি পাতা

মূল মার্কণ্ডেয় চণ্ডী অবলম্বনে অষ্ট মন্বন্তরকথা, সুরথ রাধার উপাখ্যান, মধুকৈটভবধ, মহিষাসুর বধ, শুক্লনিউক্ল বধ প্রভৃতি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট পাঁচটি পালায় বর্জমানের ধুসদন্ত সঙ্গারের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। দেবী বিশালাক্ষী বা বাসুলীর পূজা প্রত্যাখ্যান করায় সঙ্গার ধুসদন্ত বাণিজ্য উপলক্ষ্যে পাটনে গিয়া ষাটশ বৎসর বন্দী থাকিবার পর পুত্র শুক্লমন্ত কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত হন। অতএব চণ্ডীমঙ্গলেয় ধনপতি সঙ্গারের কাহিনীর সঙ্গে ইহার কাহিনীগত বিশেষ অনৈক্য নাই। তবে কালকেতুর কাহিনীটি ইহাতে নাই।

ধুসদন্তের কাহিনী কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের সমসাময়িক কালে ব্যাপক ভাবে প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। কারণ, মুকুন্দরাম তাঁহার অভয়ামল বা চণ্ডীমল কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

বর্জমানে ধুসদন্ত যার বংশে সোমদন্ত
মহাকুল বেণ্যার প্রধান।
বাসুলীর প্রতিবন্দী ষাটশ বৎসর বন্দী
বিশালাক্ষী কৈল অপমান ॥

মুকুন্দরাম ধনপতি সঙ্গারকে ধুসদন্তের মামাত ভাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ধুসদন্তের পরীক্ষা গ্রহণকালে ধুসদন্ত আসিয়া তাহাকে 'জ্যোষর' বা অতুগ্ধ করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন,—

‘তুমি মামাইত ভাই অবশ্য কল্যাণ চাই
কহিতে মানহ পাছে রোষ।
তোমারে কহিলুঁ সাধু জ্যোষর করুক বধ
তবে সন্তে করিব নির্দোষ ॥

মুকুন্দরামের পরবর্তী কবি কেশবকান্ত ক্ষেমানন্দও ধুসদন্তের কথা উল্লেখ করিয়াছেন,—

বর্জমান হৈতে আন্য ধুসদন্ত বাণ্যা।

অতএব কবিচন্দ্র মুকুন্দ যদি মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবিও হন, তাহা হইলেও তাঁহার পক্ষে ধুসদন্ত বর্ণিতের কাহিনী বর্ণনা করা কিছুই অসম্ভব ছিল না।

কবিচন্দ্র মুকুন্দের ভাষা সম্পূর্ণ গ্রাম্যভাষাকৃত। তাঁহার উপর সংস্কৃত সাহিত্য ও বাংলা বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। সেই ক্ষুদ্র ভাষা হইতে তাঁহার কাল-বিচার করা সম্ভব নহে। নিয়ে তাঁহার রচনাব যে সকল আদর্শ উল্লেখ করা যাইতেছে, তাহা হইতেই তাঁহার ভাষার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যাইবে। শিবের বর্ণনায় তিনি দিখিতেছেন,—

শিবোপরি গছ গৌরী আশ অল
জিশূল দিগুম ভুজ্ঞে।

পেখি দিগধর মহিলা মণ্ডল

বদন লুকাঅহি লাঞ্জে ॥

বুরবেশী শিবের বর্ণনায় লিখিয়াছেন,—

আমাতা লাঙ্গট দেখিয়া বিকট
সর্বত্র ভাবহু হুঃখ ।

শিবস্তোত্রে লিখিয়াছেন,—

একানেকা লম্বুগুহ ব্যক্তাব্যক্ত তত্ব । ধ্যানেন না জানে ব্রহ্মা নারায়ণ স্বাপ্নু ॥
শ্রবণ পবন নিত্য শ্রমজ্বলহরা । মধুগন্ধ লোভে মন চপল ভ্রমরা ॥
কুমতিমহননক অবভয়হারী । নিয়ত ছয়িত হুঃখ ভগছপকারী ॥
মব শশী শিরে শোভে শরীর সুছান্দ । মৃদল বাদল পর পুনমিক চান্দ ॥
ত্রিপুয়াপদারবিন্দমধুকুমতি । ত্রীযুত মুকুল কহে মধুর ভারতী ॥

বাল্মলীমঙ্গলের কাহিনী চণ্ডীমঙ্গল শ্রেণীর কাহিনীব অন্তর্গত ; বাল্মলীই কালক্রমে চণ্ডীতে পরিণতি লাভ করিয়াছেন ; এই দিক্ দিয়াও বাল্মলীমঙ্গল কাব্যখানি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল হইতে প্রাচীনতর হওয়া সম্ভব । তবে, পূর্বেই বলিয়াছি, ইহার আরও দুই একখানি পুঁথি বঙ্গান না পাওয়া পর্যন্ত ইহার রচনাকাল সম্পর্কে অনিশ্চিত কোন ধারণা করিতে পারা যাইবে না ।

ভারতচন্দ্রের অনঙ্গদামঙ্গল রচনার পরও মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল রচনার ধারাটি যে একেবারে লুপ্ত হইয়া যায় নাই, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কবি অক্ষিপনের চণ্ডীমঙ্গল । ইহার পুঁথিখানি আজিও প্রকাশিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করে নাই, কিংবা বাংলা সাহিত্যের কোন ইতিহাসলেখক এই পর্যন্ত এই পুঁথিখানির বিষয় কোন উল্লেখ পর্যন্ত করেন নাই । সম্ভ্রতি ইহার একখানি পুঁথি আমার হস্তগত হইয়াছে,^২ এখানে তাহার বিষয়ই উল্লেখ করিব ।

পুঁথিখানি দুইটি খণ্ডে সম্পূর্ণ হইয়াছে—প্রথম খণ্ডে কালকেতু ব্যাধের কাহিনী ও দ্বিতীয় খণ্ডে ধনপতি সদাগরের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে ; বর্ণনা কোথাও সংক্ষিপ্ত নহে—সর্বত্রই মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের জায়গাই দীর্ঘ । যোড়টি পালায় দুইটি কাহিনী সম্পূর্ণ হইয়াছে ; প্রত্যেক পালায় নুতন কবিতা পত্রাঙ্ক দেওয়া হইয়াছে । পুঁথিখানি কোথাও একই পাতার দুই পৃষ্ঠায়, কোথাও বা দো-ভাঁজ করা দুই পাতার এক পৃষ্ঠায় করিয়া লিখিত । পুঁথিখানির অবস্থা ভাল, লিপি সূন্দর ও সহজপাঠ্য, তবে একাধিক হস্তে লিখিত । অক্ষিপের ছাঁদ দেখিয়া ত্রীতীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পুঁথিখানি লিখিত বলিয়া মনে হয় । ভণিতায় কবি এই ভাবে নিজের নাম উল্লেখ করিয়াছেন,—

চণ্ডিকার চরণ চিস্তিয়া অম্লক্ষণ । রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্তী অক্ষিপন ॥
আজ্ঞা পায়্যা অপাদিনী আরণ্ডে রক্ষন । রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্তী অক্ষিপন ॥ ইত্যাদি

২। যোদিনীপুর বিদ্যার অন্তর্গত ঘাটাল মহকুমার বেঘরাল গ্রামনিবাসী কবির বংশধর শ্রীতারাপাল চক্রবর্তী বি এ মহাপণ্ডের সৌজন্যে পুঁথিখানি আমার দেখিবার সুযোগ হইয়াছে । পুঁথিখানির বিষয়ে পূর্বে আমি নিজেও কিছু অবগত ছিলাম না ।

অর্ধাৎ কবির নাম অকিঞ্চন চক্রবর্তী, তাঁহার উপাধি কবীন্দ্র। ভণিতার অনেক স্থানে কেবল মাত্র তাঁহার উপাধিটিও ব্যবহার করিয়াছেন,—

চণ্ডীর আদেশ পায়া কবীন্দ্র কহেন গায়্যা

দূর কর আমার কলুষ।

অকিঞ্চন তাঁহার বাসস্থান সম্পর্কে উল্লেখ করিয়াছেন,—

বসতি বরদা বদনে সারদা

চণ্ডিকা দেবীর আদেশে।

নূতন মঙ্গল শ্রবণে কুশল

কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে ভাষে ॥

মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত বরদা একটি পরগণার নাম। প্রায় সমসাময়িক আর একজন মঙ্গল-কাব্যের কবি তাঁহার কাব্যে এই বরদা পরগণার অন্তর্গত যত্নপুর গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি শিবায়নের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য। অকিঞ্চন রামেশ্বরের পরবর্তী কবি, সেই কথা পরে আরও বিস্তৃত ভাবে উল্লেখ করা যাইবে। বর্তমানে কবির বংশধরগণ এই বরদা পরগণার অন্তর্গত বেঙ্গরাল নামক গ্রামে বসবাস করিতেছেন। কবির বংশধরদিগের গৃহে প্রাপ্ত একটি ব্রহ্মোত্তরের দলিলে কবির তিন পুত্র—রামচাঁদ, রামজলাল ও শিবানন্দকে এই বেঙ্গরাল গ্রামেরই অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। দলিলখানি ১২০৯ সালে লিখিত। কবি সেই সময় জীবিত ছিলেন না, তবে তিনিও বেঙ্গরাল গ্রামেরই অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কিন্তু পুত্রির মধ্যে তিনি কোথাও নিজের গ্রামের নামটি উল্লেখ করেন নাই। বরং তাঁহার পিতা আটঘরা নামক গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

বিপ্রকুলোৎপত্তি আটঘরা স্থিতি

ঠাকুর পুঙ্কনোত্তম।

তাঁহার নন্দন কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ

বচে কাব্য মনোরম ॥

আটঘরা-শ্রীরামপুর গ্রাম মেদিনীপুর জিলার ঘাটাল মহকুমাত্তেই অবস্থিত। কবি অথবা কিংবা তাঁহার পুত্রগণই সর্বপ্রথম আসিয়া ইহার অনতিদূরবর্তী বেঙ্গরাল গ্রামে বসতি স্থাপন করেন কি না, তাহা নিশ্চিতরূপে জানিতে পারা যায় না। কবি বর্দ্ধমানের অধিপতি কীর্ত্তিচন্দ্রের দেশে বাস করিতেন বলিয়া বার বার তাঁহার নাম কাব্যমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন,—

মহারাজ চক্রবর্তী কীর্ত্তিচন্দ্র কৃতকীর্ত্তি

ইচ্ছের সমান বর্দ্ধমানে।

নিবাস তাঁহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাষে

ব্রাহ্মণ কবীন্দ্র অকিঞ্চনে ॥

বর্ষসূচী

প্রবন্ধ	লেখক	পৃষ্ঠাঙ্ক
১। অসমাপিকা ক্রিয়াপদ, না অব্যয়—শ্রীননীগোপাল দাশ শর্মা	...	১০২
২। আধুনিক হিন্দী কাব্যসাহিত্যে বাংলার প্রভাব —শ্রীহৃদাকর চট্টোপাধ্যায়	...	১
৩। গোবিন্দদাসের অপ্রকাশিত পদাবলী—শ্রীঅজয়কুমার চক্রবর্তী	..	১০০
৪। গোবিন্দদাস কবিরাজের কয়েকটি অপ্রকাশিত পদ—শ্রীঅমিয়কুমার সেন	...	২১৬
৫। 'চণ্ডীদাস সমগ্র' প্রবন্ধ সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তর—পত্রিকাধ্যক্ষ	...	১০১
৬। টেলিমির্বাণিত কিরাদিয়া কোথায়?—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত	...	২১৩
৭। তাম্রিক ধর্মের ইতিবৃত্ত—শ্রীরমেন্দ্রচন্দ্র ভর্তুকী	...	৯২
৮। পর্তুগীজ মিশনারী ও বাংলা গল্প—শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১২৩
৯। বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়	১৭, ৮০, ১৪৫, ২০৪	
১০। বাঙ্গলা সর্বনাম পদ—শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র মাইতি	...	২১৭
১১। বালুরঘাটের পুরাকীর্তির পরিচয়—শ্রীকমলেন্দু চক্রবর্তী	...	১২৯
১২। বৈদিক অস্ত্র ও দেবতা—শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য	১৪, ৭৫, ১৩৬, ২২৪	
১৩। ভারতে সূর্য্যমূর্তির উৎপত্তি ও প্রাচীনত্ব—শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস	...	৬৯
১৪। মেহেন্-জো-দড়োর সীলমোহর—শ্রীমাহেন্দ্রচন্দ্র কাব্যতীর্থ	...	৯৮
১৫। সভাপতির ভাষণ—শ্রীসঞ্জনীকান্ত দাস	...	৫৩

চিঙ্গসেনের তাত , কীর্তিচন্দ্র নরনাথ

রাজা জগৎবায়ের নন্দন ।

বসিয়া তাঁহার দেশে নূতন মঙ্গল ভাবে

শ্রীবৃত্ত কবীন্দ্র অকিঞ্চন ॥

কিন্তু তিনি কীর্তিচন্দ্রের সমসাময়িক ছিলেন না ; কারণ, তিনি পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন,—

ভূপতি তিলকচন্দ্র বর্দ্ধমানে যেন ইন্দ্র

ভেজচন্দ্র তাঁহার নন্দন ।

নিবাস তাঁহার দেশে চণ্ডিকা মঙ্গল ভাবে

কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ অকিঞ্চন ॥

মনে হয়, তিনি যখন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন, তখন মহারাজ তিলকচন্দ্রের পুত্র মহারাজ ভেজচন্দ্র বর্দ্ধমানের অধিপতি ছিলেন। ভেজচন্দ্রের রাজ্যকাল 'খ্রীষ্টাব্দ ১৭৭০ হইতে ১৮৩২। তবে মনে হয়, খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই কাব্যখানি রচিত হয়। মহারাজ তিলকচন্দ্রের কথাও তিনি যে ভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তিনি তিলকচন্দ্রের রাজ্যকালের শেষ ভাগ হইতে ভেজচন্দ্রের রাজ্যকালের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন। এই বিষয়ে আরও একটি প্রমাণ আছে, তাহা পরে উল্লেখ করিব। পুথিখানিতে ইহার রচনা-কালজ্ঞাপক নির্দিষ্ট কোন তারিখের উল্লেখ পাওয়া যায় না ; অতএব ইহা অপেক্ষা এই বিষয়ে আর কিছু নির্দিষ্ট করিয়া বলা অসম্ভব।*

পুথিখানির নাম তিনি এক জায়গায় 'পার্বতীর সঙ্গীর্ষন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, অতঃপর সর্বদাই তিনি ইহাকে চণ্ডীর 'নূতন মঙ্গল' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, রামেশ্বরের 'শিবসঙ্গীর্ষন'র অনুল্লকরণেই একবার ইহাকে 'পার্বতীর সঙ্গীর্ষন' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ; যেমন,—

পাশা পূর্ণ হল্য পার্বতীর সঙ্গীর্ষন ।

বিরচিল কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন ॥

অকিঞ্চন বৃদ্ধ বয়সেই চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় ; কারণ ইহাতে তাঁহার তিন পুত্রেরই উল্লেখ আছে, যেমন,—

শ্রীরামচন্দ্রালাে রামচন্দ্র শিবানন্দে ।

কল্যাণে করিবে রক্ষা গঙ্গাপদমন্ডে ॥

এইবার কাব্যখানির আভ্যন্তরিক একটু পরিচয় দেওয়া প্রয়োজন। মুকুন্দরামের বসতি-

৩। কবির বংশধরদিগের গৃহে বে বংশলতা রক্ষিত আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, হরিনারায়ণের পুত্র পুরুষোত্তম, তাঁহার পুত্র কবি অকিঞ্চন, তাঁহার তিন পুত্র—রামচাঁদ, রামচন্দ্রলাল ও শিবানন্দ, রামচাঁদের পুত্র রামজীবন, রামজীবনের পুত্র বৈদ্যনাথ, তাঁহার পুত্র মাধন ও তৎপুত্র তারাপদ। অকিঞ্চন হইতে তারাপদ পর্যন্ত পঞ্চম পুরুষ চলিতেছে। চারি পুরুষ এক শতাব্দী ধরিবার নিয়ম, তাহা হইলে দেখা যায়, মাত্র ১২৫ বৎসর পূর্বে অকিঞ্চন বর্তমান ছিলেন।

স্থানের অনতিদূরবর্তী অঞ্চলে বাস করিয়া কবি-অকিঞ্চন যে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারিবেন না, তাহা স্বভাবতঃই মনে করা যাইতে পারে। যদিও বহুলাংশে অকিঞ্চন মুকুন্দরাম ষারাই প্রভাবিত হইয়াছেন, এ কথা সত্য। তথাপি কাহিনী ও চরিত্র পরিকল্পনায় তিনি কোন কোন স্থানে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। তাঁহার তাঁদ্র চরিত্রটি যদিও মুকুন্দরামের তাঁদ্র ছায়াতলেই অঙ্কিত, তথাপি ইহার কতকটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও প্রকাশ পাইয়াছে। যেমন,—

মধ্যেতে মণ্ডপ করে স্নাতকের ঘর। -তাঁদ্র দস্ত বৈসে তার তণ্ডের ঈশ্বর ॥
কড়ি সাধে কিঙ্করে করিয়া আটধরী। হাট বাট হইল তাঁদ্র আঙ্গারী ॥
কাপড়ার কাপড় কিনিয়া আনে ছলে। কড়ি নাঞি দেই তারে কলমের বলে ॥
ধূস্ত বুড়ো ধান কিনে ধার নাহি স্নেহে। মাগিলে মালের টাকা মার্যা প্রাণ বধে ॥
কুমারের কুস্ত্র লেই সরা ভাও হাঁড়ি। তাঁদ্র ভগিনী তারে নাঞি দেই কড়ি ॥
ছুটি বেটা দেই দেখা দোকানের কাছে। লুট কর্যা লাডু খায় লাঞ্ছিত হয়্যা নাচে ॥
অলে যায় যুবতী অঞ্জাল করে ঘাটে। বাটুলে কলসী-ভাজে খাদ খুলে বাটে ॥
পথে পাক পেগ্যা পাঁশ ঢাকা দিয়া তার। হেরি যুবতীর মুখ হাজা পাক খায় ॥
প্রবল প্রতাপ ধরে একটি জামাই। মার্যা ধর্যা লিঙ্গ(?) লেই মানা শুনে নাই ॥
দধি ছুধ দেখিলে দোকান শুদ্ধ লুটে। বীবের দোহাই দিলে বল কর্যা পিটে ॥
পথে যায় পথিক প্রতাপে গালি পাড়ে। দোষ বিনা বন্দ করে দণ্ড কর্যা ছাড়ে ॥
নগরের লোক যত নানা ছুঃখ পায়। বিষাদ করিয়া বীরে জানাইতে যায় ॥
বুলন মণ্ডল সঙ্গে বাইশ বাজার। কান্দিতে কান্দিতে বীরে করিল জোহার ॥
চণ্ডিকার চরণ চিন্তিয়া অমুক্ষণ। রচিলা কবীন্দ্র চক্রবর্তী অকিঞ্চন ॥
তাঁদ্র জামাতার কথা মুকুন্দরামে নাই, বুলন মণ্ডলের নামটি অকিঞ্চন মুকুন্দরাম হইতেই লইয়াছেন।

উৎপীড়িত গুজরাটবাসী কালকেতুর নিকট তাঁদ্র নামে যে অভিযোগ উপস্থিত করিতেছেন, তাহার চিত্রটি বাস্তব ও করুণ,—

মহাবীর, নগর নিবাসে নাঞি সাদ।
শুন বীরশিরোমণি, নিবাসে বসিল কণী
তাঁদ্র দস্ত পাড়িল প্রমাদ ॥
তোমার আশ্বাস পায়্যা সর্ব্বে ছিহু স্তম্ভী হৈয়া
অন্ন বস্ত্রে পরম কল্যাণে।
নাঞি ছিল রাজকর অপর আপদ ডর,
তোমার চরণ-কুপাদানে ॥
তোমার নগরে আসি আশ্বাসে সভাই বসি
প্রজা যোরা গুণের পায়রা।

যথা অপভ্রায় নাঞি সর্বের বসি সেই ঠাঁঞি
খুঁজি বড় বৃক্ষের ছায়রা ॥

রাভার অয়ার্য কড়ি দিতে নাঞি করি দেৱী
সোহি বাটপাড় নগরের ।

হিসাবি খাজনা লেয় কারখতি লিখিয়া দেয়
চরণে বিদায় মাগি ভোর ॥

প্রজাগণ যত বলে শুনি বীর কোপানলে
ভাঁড়ুরে আনাইল দিয়া লোক ।

অভয়া করিয়া ধ্যান কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ গান
সেবকে চণ্ডিকা দিবে স্নেহ ॥

অকিঞ্চনের চণ্ডীমঙ্গলে ধনপতি সদাগরের কাহিনীটিও সুরচিত হইয়াছে, নিম্নোক্ত
মগরা নদীতে ঝড়বৃষ্টির বর্ণনাটির মধ্যে কবির বাস্তব দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যাইবে,—

দেখি মগরার পানী বলে সাধুশিরোমণি
উপায় চিন্তহ কর্ণধার ।

ঝুঝি বড় অমঙ্গল রাখ ডিলা যথাহল
বিষম সঙ্কটে কর পার ॥

আসিতে মগরা নদে কোন দেবতার বাধে
ঝড় বৃষ্টি হৈল উপস্থিত ।

ভাল সম পড়ে শিলা বিদরে নৌকার খিলা
পবনে প্রবল হৈল শীত ॥

অঙ্গে জল পড়ে বেগে দশনে দশন লাগে
শীতে অঙ্গ হৈল কম্পমান ।

বারিষ বরিখে বারি জিতাগ ডুবিল তরী
আজি মোর সংশয় পরাণ ॥

প্রলয় হইয়াছে বা ঘুরে ঘুরুরা (?)
ঝলকে ঝলকে উঠে জল ।

কাণ্ডারী হৈল ভাঁড় বাহিতে না পারে দাঁড়
ঝুঝি ডিলা যায় রসাতল ॥

ঘেথে বৃহিষ্ণের পাশে মকর কুন্তীর ভালে
ভয়ঙ্কর বিজ্ঞার বদন ।

হু কুলে পড়িছে হানা রাশি রাশি ভাসে ফেনা
লহ লহ করে অহিগণ ॥

দশ দিন দেখা দিয়া দেশে পুন যাবে। শান্তড়ীর অন্ন খাইলে পরমাই বাড়িবে ॥
সে দেশের রাজা যদি ধনে করে বল। তুরিত গমনে আস্ত তোমার সিংহল ॥

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের সকল বিষয়েই যে রুচিহীন পরিচয় প্রকাশ পাইয়াছিল, অকিঞ্চনের কাব্যখানি তাহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। অকিঞ্চনের রুচিবোধ উন্নত ছিল; পরিচ্ছন্ন রচনার ভিতর দিয়া তাঁহার এই উন্নত রুচিবোধের বিকাশ হইয়াছে। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে সমগ্রভাবেই যে বাংলা সাহিত্য নৈতিক দুর্গতির চরম সীমায় গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহা অকিঞ্চনের কাব্য পাঠ করিয়া কিছুতেই মনে হইতে পারে না। অচলা দেব-ভক্তি লইয়াই তিনি তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রের মত দেবদেবীকে লইয়া অহেতুক কোতুক করেন নাই।

বিষয়-বিভ্রাসে মুকুন্দরামের প্রভাব অকিঞ্চনের উপর অনস্বীকার্য হইলেও তাহার দিক্ দিয়া তাঁহার উপর তাঁহার স্বদেশবাসী একজন কবির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া রহিয়াছে। পূর্বে তাঁহার কথা একবার উল্লেখ করিয়াছি, তিনি শিবমঙ্গল বা শিবায়নের কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য। সাহিত্যে ভাব-যুগের পর শব্দযুগেরই আবির্ভাব হইয়া থাকে; ভারতচন্দ্র শব্দযুগেরই কবি এবং শব্দশিল্পী হিসাবেই তাঁহার কৃতিত্ব। রামেশ্বর বিচিত্র ধ্বনিসংযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিয়া তাঁহার কাব্যদেহে এক অলঙ্কার পরিধান করাইয়াছিলেন, যেমন,—

ভাত নাই ভবনে ভবানী বাণী বাণ।
চমৎকার চন্দ্রচূড় চণ্ডী পানে চান ॥
গন্ধাবতী পার্শ্বতীকে প্রবোধিয়া আনে।
প্রাণনাথে প্রকারে তেটিব সেইখানে ॥ ইত্যাদি।

অকিঞ্চন রামেশ্বরের নিকট হইতে এই সহজ অনুপ্রাস ব্যবহারের কৃত্রিম রীতিটির এক অনুকরণ করিয়াছিলেন; যেমন,—

পুলোমজা পুরন্দরে প্রবোধিয়া দুর্গা।
অবিলম্বে অবনী আইলা অপবর্গা ॥
বিষ্মাতা বীরবরে বলেন মধুর।
কাস্তা সহ কালকেতু চল স্বর্গপুর ॥
বিমানে বসিল বীর বনিতা লইয়া।
বায় যমালয় পথে অন্ন অন্ন দিয়া ॥
দুর্গা বলা দুর্গাদূত হুন্দুতি বাজান।
সদনে শমন শব্দ শুনিবারে পান ॥ ইত্যাদি।

ইহা রামেশ্বর ও অকিঞ্চনেরই যে কেবল বৈশিষ্ট্য ছিল, তাহা নহে; ইহা যুগেরই বৈশিষ্ট্য ছিল। এই শব্দবিভ্রাসের কৃতিত্বের উপরই ভারতচন্দ্রেরও প্রতিভার প্রতিষ্ঠা হইয়াছে; তবে

ভারতচন্দ্রের এই বিষয়ে যে শিল্পবোধ ছিল, ইহাদের তাহা ছিল না; ইহারা শব্দ দ্বারা কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছেন মাত্র, ভারতচন্দ্রের মত কলগুঞ্জন সৃষ্টি করিতে পারেন নাই।

অকিঞ্চন একখানি শীতলামঙ্গলও রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত শীতলামঙ্গল শীতলাপূজা উপলক্ষ্যে ষাটাল মহাকুমার বিভিন্ন অঙ্গে এখনও গীত হইয়া থাকে। ইহার একখানি পুঁথি কবির বংশধরদিগের গৃহে রক্ষিত আছে, তাহাতে কবি বর্ধমানের মহারাজা তিলকচন্দ্রের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার পুত্র তেজশ্চন্দ্রের কোন উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে মনে হয়, শীতলামঙ্গলখানিই অকিঞ্চনের প্রথম রচনা, ইহার পর তিনি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন ও গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াও অকিঞ্চন গঙ্গামঙ্গল শ্রেণীর একখানি ক্ষুদ্র কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। রচনার পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া মনে হয়, ইহা তাঁহার সর্বশেষ রচনা।

এখন পর্য্যন্ত যত দূর জানিতে পারা গিয়াছে, তাহাতে মনে হয়, অকিঞ্চনই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বশেষ কবি। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের ধারাটিকে তিনি খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ সীমা পর্য্যন্ত অগ্রসর করিয়া দিয়াছেন। এই সময় হইতেই নাগরিক জীবনকে কেন্দ্র করিয়া বাংলার সংস্কৃতি এক নূতন রূপ লাভ করিতে আরম্ভ করে; চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মৌলিক ধারাটি ইহার সম্মুখীন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়—ইহার কেন্দ্রে নাগরিক রস ও রুচির অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিনিধি ভারতচন্দ্র একাধিপত্য স্থাপন করেন।

ময়ূর ভট্ট

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ধর্মমঙ্গলের সকল কবি ময়ূর ভট্টকে ধর্মমঙ্গলের আদিকবি বলিয়া প্রণতি জানাইয়াছেন—

“ময়ূর ভট্টে রূপাবিত হৈল করতাব ।

মরতে ধর্মের গীত করিতে প্রচার ॥”—(রূপরাম)

“বন্দিব ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম ।

বিজ্ঞ শ্রীমাপিক ভনে ধর্মগুণগান ॥”—(মাপিক গাভুলী)

“ময়ূর ভট্টকে বন্দিয়া মন্তকে

সীতারাম দাস গায় ।”—(সীতারাম দাস)

“আছিল ময়ূর ভট্ট সুকবি পণ্ডিত ।

রচিল পরার ছাঁদে অনাত্মের গীত ॥

ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্মশতদল ।

রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্মের মঙ্গল ॥”—(গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায়)

“স্থানে স্থানে বন্দিব যতেক দেবদেবী ।

ময়ূর ভট্টে বন্দিব সঙ্গীত আস্ত কবি ॥”—(ঘনরাম)

এই ময়ূর ভট্টের জীবনকথার মধ্যে আমরা এই মাত্র জানি যে, তিনি লাউসেনের পৌত্র ধর্মসেনের জ্যেষ্ঠ শ্রীধর্মপুরাণ রচনা করেন। লাউসেনের সময় ষাদশ শতকের মধ্যভাগ ধরিলে ময়ূর ভট্টের সময় ত্রয়োদশ শতকের আরম্ভে হইবে। সুতরাং তিনি বাণভট্টের সমসাময়িক স্বর্ধ্যশতকের রচয়িতা ময়ূর ভট্ট হইতে ভিন্ন। ডক্টর শ্রীমুকুমার সেন তাঁহাদিগকে অভিন্ন মনে কবিয়াছেন। কিন্তু স্বর্ধ্যশতকের রচয়িতা ময়ূর ভট্ট সপ্তম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন, তখন পালরাজবংশের উৎপত্তিই হয় নাই, অথচ ধর্মমঙ্গলের নায়ক লাউসেন পালরাজবংশের সহিত সম্পর্কিত এবং আমাদের ময়ূর ভট্ট সেই ধর্মমঙ্গলের কবি।

৮কালীকান্ত বিশ্বাস রত্নপুর-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (১৩১৮ সাল, ৪০ পৃ.)

‘ময়ূর ভট্ট’ শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন—“তাঁহার সম্বন্ধে রূপসনাতনের বক্তার প্রশংসার পলাবলীতে এইরূপ উল্লেখ আছে :—

‘ময়ূর কুম্বুক ভট্ট আচার্য্য উদয়ন ।

আদি কবিশিরোমণি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ’ ॥”

বসসাগর কৃষ্ণকান্ত ভাট্টীকৃত বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় ভট্টশালী-বংশের নিম্নলিখিত পরিচয় আছে,—

“বাংগে তটশালী শ্রোত্রিয় প্রবল ।

দানাদানে কুলমানে আছয়ে সবল ॥

এই বংশে সরস্বতী চিরদয়াবতী ।

ময়ূর ভট্টের নামে বংশে ছিল খ্যাতি ॥

ময়ূর তট পূর্বকবি ময়ূরসদৃশ ।

আজও নাহি দেখি তার কিছু বিসদৃশ ॥’

এই রসসাগর মহারাজ কৃষ্ণচক্রেয় সভাসদ ছিলেন। আমার পরলোকগত বিজ্ঞ সাহিত্যিক বঙ্গ ভট্টের নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ভট্টশালীবংশীয় ময়ূর ভট্টের নিম্নলিখিত কুলজি আমাদের প্রদান করেন—ধরাধর,—বেদ ওঝা—সিদ্ধেশ্বর—চতুর্বেদ—অন্নরাম মিশ্র—চক্রপাণি—নারায়ণ—পীতাম্বর—বলদেব—কামদেব—অধিপতি—মহীধর ভট্টশালী—ময়ূর ভট্ট। ময়ূর ভট্টের আদিপুরুষ ধরাধর বিখ্যাত আদিশূরের সমসাময়িক। আদিশূরের সময়নির্দেশক দুইটি শ্লোকাকর্ষ আছে। একটি হইতেছে—

“বেদবাণাঙ্গশাকে তু গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ ।”

ইহাতে ৯৫৪ শক বা ১০৩২ খ্রীষ্টাব্দ হয়। আর একটি হইতেছে—

“বেদবাণাঙ্গশাকে তু গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ ।”

ইহাতে ৬৫৪ শক বা ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ হয়।

৮নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিজ্ঞানমহার্ণব রাষ্ট্রীয় কুলমঞ্জরী হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—

“বেদবাণাঙ্গশাকে তু নৃপোহভূচ্চাদিশুরকঃ ।

বসুকর্মাঙ্গকে শাকে গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ ॥”

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজস্বকাণ্ড, ২২ পৃঃ)

ইহা হইতে আমরা পাই, ৬৫৪ শকে আদিশূরের রাজ্যপ্রাপ্তি এবং ৬৬৮ শকে বা ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে গোড়ে বিজয়গণের আগমন। আমার বিশ্বাস, এই শ্লোকটিই গ্রহণযোগ্য। ইহার দুই চরণের পাঠ্যমে “বেদবাণাঙ্গশাকে তু গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ” এই শ্লোকাকর্ষ সৃষ্টি হয়। এই শাস্ত্র পাঠ অধিকতর শাস্ত্র হইয়া “বেদবাণাঙ্গশাকে তু গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ” হইয়াছে। আমরা ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ধরাধরের কাল নির্ণয় করিতে পারি। তাহা হইতে ১৩ পুরুষ অধঃস্থিত ময়ূর ভট্টের জন্মকাল $৭৪৬ + ১৩ \times ৩৩ = ১১৭৯$ খ্রীষ্টাব্দ হয়। ইহা আমাদের প্রস্তাবিত বর্ষসেনের সময়ের কাছাকাছি।

আমরা ১২১১ শকে বা ১২৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে এক “পরমসৌগতপরমমহারাজাধিরাজ-শ্রীমদগোড়েশ্বরমধুসেন” নামক এক বৌদ্ধ রাজার কথা জানি। তাঁহার সময়ে একটি বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থ লিখিত হয় (History of Bengal, vol. 1, p, 228, D, U.)। তাঁহাকে পরম বৈষ্ণব লক্ষণসেনের বংশধর মনে করা অপেক্ষা লাউসেনের বংশধর মনে করাই অধিক সঙ্গত। সম্ভবতঃ ময়ূর ভট্টের পৃষ্ঠপোষক বর্ষসেন তাঁহার পিতা কিংবা

পিতামহ ছিলেন। শ্রীধর্মপুরাণে (পৃ: ১৫০) ধর্মসেনের চারি পুত্রের নাম মাধব, মধুসূদন, সত্য ও সনাতন। শ্রীধর্মপুরাণে ধর্মসেনের নামান্তর ধর্মদাস। সেইরূপ সম্ভবতঃ মধুসূদন কিংবা মাধবের নামান্তর মধুসেন। ছুঃখের বিষয়, আমরা ময়ূর ভট্টের ধর্মপুরাণ পাই নাই। যাহা তাঁহার রচিত বলিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্বন্ধে ডক্টর শ্রীমুকুন্দাব সেন মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, “তাঁহা অষ্টাদশ শতকের কবি রামচন্দ্র ঝাড়ুজের রচনা। মুদ্রিত সংস্করণের আকর-পুথির তথিত্য ‘বিজয় রামচন্দ্র’, ছাপা বইয়ে হইয়াছে ‘বিজয় ময়ূরক’।” (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃ. ৫০৫)। আমি বলিব, বর্তমান আকারে এই বইখানিকে নিতান্ত আধুনিক বলিতে হইবে। দৃষ্টান্ত—

শুন বাজা মতিমান্

পাতকে পাইবে ত্রাণ

প্রাণ দিতে হবে না তোমারে।

হইয়া ভক্তিচিত্ত

ধর্মনাম বিভূষিত

পুবান শুনিবে ব্রত কোরে ॥ (পৃ. ৭)

‘কোরে’ মধ্যযুগের বাংলায় হইবে করিআ, করিআ বা কব্যা। সুতরাং ‘তোমারে’ এবং ‘কোরে’ এই মিল গত শতাব্দীর পূর্বের হইতে পারে না।

“অরণ্য মাঝারে এসে

আক্রমিয়া ধর্মদাসে

সর্বধন কাড়িয়া লইল।” (পৃ. ১০০)

‘এসে’ মধ্যযুগের বাংলায় আসিআ, আসিআ বা আস্তা হইবে। সুতরাং ‘এসে’ এবং ‘ধর্মদাসে’ এই মিল আধুনিক। এইরূপ অনেক আধুনিকব্দের চিহ্ন আছে। পাণ্ডুলিপির তারিখ সন ১৩১০ সাল, ১৫ই বৈশাখ।

তবে মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গলগুলি যে প্রাচীন যুগের ঐতিহ্য কিছু পরিমাণে রক্ষা করিয়াছে, তাহা আমরা ধরিয়া হইতে পারি।

গৌড়ীয় সমাজ

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বর্তমানে বিভিন্ন নামে বহু সাহিত্য-সভা কলিকাতায় ও মফস্বলে আমরা দেখিতেছি। আমাদের দেশে এই সাহিত্য-সভার আদি 'গৌড়ীয় সমাজ'। এক শত ত্রিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতা নগরীতে এই সমাজ স্থাপিত হয়। তখন ইংরেজী 'সোসাইটি,' 'ইনস্টিটিউট' বা 'এসোসিয়েশন'কে প্রায়শঃ বাংলায় 'সমাজ' বলিয়া আখ্যাত করা হইত। গৌড়ীয় সমাজও এইরূপ একটি 'সোসাইটি'। বস্তুতঃ ইহার ইংরেজী অনুবাদ করা হইয়াছিল—'Native Literary Society'। তখনকার দিনের একটি বিষয় বিশেষ লক্ষণীয়। শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক সাধারণের হিতকর প্রতিষ্ঠানে গণ্যমান্ত ইংরেজ-বাঙালী একবোলে কার্য করিতেন। গৌড়ীয় সমাজ কিন্তু একেবারেই বাঙালী প্রতিষ্ঠান, ইহাতে ইংরেজের নামগন্ধ ছিল না। মাতৃভাষার অনুশীলন দ্বারা জাতীয় উন্নতি সাধনই ছিল এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য।

গৌড়ীয় সমাজের প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারি (বাংলা ১২২৯, ৬ই ফাল্গুন) হিন্দু কলেজ-ভবনে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন সুবিজ্ঞ সাহিত্যিক রামকমল সেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত রামজয় তর্কালঙ্কার, কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন, গৌরমোহন বিজ্ঞানদ্বার, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রাধাকান্ত দেব, বিশ্বনাথ মতিলাল, তারাতাঁদ চক্রবর্তী, শিবচরণ ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামচুলাল দে (সরকার), কাশীকান্ত ঘোষাল, রসময় দত্ত, কাশীনাথ মাল্লা প্রভৃতি। পূর্বেই সমাজের উদ্দেশ্য-সম্বলিত একখানি অস্থানপত্র রচিত হইয়াছিল। সভাপতির আহ্বানে পণ্ডিত গৌরমোহন বিজ্ঞানদ্বার ইহা সভায় পাঠ করিলেন। অস্থানপত্রখানি সম্বন্ধে একটু পরেই বলিতেছি। সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনার পর এইদিনকার মত সভা ভঙ্গ হয়। রাধাকান্ত দেব, দ্বারকানাথ ঠাকুরপ্রমুখ সভ্যগণের প্রজ্ঞাবে ও সমর্থনে রামকমল সেন এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর গৌড়ীয় সমাজের সম্পাদকপদে বৃত্ত হইলেন।

গৌড়ীয় সমাজের অস্থানপত্রখানি নানা দিক্ হইতেই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তখনকার দিনে নেতৃবর্গ জাতীয় কল্যাণচিন্তায় কতখানি উষ্ম হইয়াছিলেন, এই অস্থানপত্রখানি হইতে তাহা অবগত হওয়া যায়। এখানি বাংলার রচিত হইলেও মূল বাংলা অস্থান-পত্র-খানি পাইতেছি না। ইহার ইংরেজী অনুবাদ ঐ সময়ে কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এইরূপ একটি অনুবাদ* হইতে সমাজ-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য আমরা জানিতে পারি। অস্থানপত্রখানি সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে প্রথম দিনকার সভায় সমাজের উদ্দেশ্য-সম্বলিত যে কয়েকটি সাধারণ নিয়ম ধার্য হয়, তাহা এখানে পর পর উল্লেখ করিতেছি :

* "Native Literary Society"—*The Asiatic Journal*, December 1828, pp. 549-54. London.

- ১। যান্ত্রগণ্য স্বাভিজ্ঞ দেশীয়দের লইয়া একটি সমাজ গঠিত হউক।
- ২। দেশবাসীদের ভিতরে জ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য।
- ৩। এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বিভিন্ন ভাষা হইতে বাংলা ভাষার গ্রন্থাদি অনুবাদ করাইয়া সমাজের ব্যয়ে প্রকাশ করিতে হইবে।
- ৪। দেশবাসীদের মধ্যে নীতি এবং শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য দমন ও নিরোধকল্পে সমাজ যত্নপর থাকিবেন।
- ৫। এ উদ্দেশ্যে সমাজের ব্যয়ে ছোট ছোট পুস্তিকা বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশ করা যাইবে।
- ৬। প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক গ্রন্থাদি লইয়া একটি গ্রন্থাগার গঠন করা যাইবে।
- ৭। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও সংগ্রহ করা হইবে।
- ৮। আবশ্যক অর্থ সংগৃহীত হইলে গৌড়ীয় সমাজের জন্ত একটি ভবন ক্রয় করা হইবে। যতদিন পর্যন্ত না তাহা সম্ভব হয়, ততদিন হিন্দু কলেজগৃহে সমাজের অধিবেশন হইবে।

২

এখন অনুষ্ঠানপত্রখানির মর্ম লইয়া আলোচনার আসা যাক। অনুষ্ঠানপত্রখানি কাহার রচিত, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যাইতেছে না। বাংলার লিখিত মূল অনুষ্ঠানপত্রখানি পাইলে হয় ত এ বিষয়ে কিছু হৃদিস মিলিত। ইহার মুখবন্ধে বলা হইয়াছে যে, বিজ্ঞার উন্নতি ও প্রসারকল্পে ওরূপ একটি প্রতিষ্ঠানের অভাব বাঙালীপ্রধানেরা বহুদিন বাবৎ অনুভব করিতেছিলেন। নানা জনে কথাবার্তায় এই অভাবের বিষয় উত্থাপনও করিতেন। সাময়িক পত্র-পত্রীতেও এই অভাবের দিকে তাঁহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করা হইত। এইরূপ একটি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠায় কি কি সুফল পাওয়া যাইতে পারে, সাধারণের মধ্যে জ্ঞান-বিস্তারই বা ইহা দ্বারা কিরূপে সম্ভব, সেই সকল কথা ইহাতে পর পর এইরূপ আলোচিত হয় :

“অদেশের হিত-সাধনের জন্ত এরূপ বহু প্রচেষ্টা আবশ্যক, যাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা একক ভাবে নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে বহুজনের সমবেত প্রয়াস প্রয়োজন। আর এ প্রকার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ইতিপূর্বে বহু জনহিতকর কার্যই সাধিত হইয়াছে। সভা-সমিতির দ্বারা কত মহৎ কার্য অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ও পরিশ্রমে সুসম্পাদিত হইতে পারে, ইউরোপীয়দের সভা-সমিতিগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

“একই উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত যখন অনেকে সংঘবদ্ধ হয়, তখন খুব কম কাজই অসাধ্য থাকে। সমবেত বিজ্ঞা, বুদ্ধি ও অর্থের সমাবেশ হইলে একটি অদ্বুত শক্তি লব্ধ হয়। এবং এই শক্তি দ্বারা প্রত্যেকেই সমভাবে লাভবান হইতে পারেন। একক চেষ্টায় এরূপ শক্তিসাধ সম্ভব নয়, উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ না হইয়া বরং বহু দূরেই থাকিয়া যায়।”

নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা এই শক্তির কথা বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ইহার পর প্রাচীন যুগের ভারতবর্ষের কৃতিত্বের কথা অমুঠানপত্রে উল্লিখিত হয়। এ দেশে চৌষট্টি কলা বা বিজ্ঞান চর্চা হইত। কাব্য, নাটক, দর্শন, ব্যাকরণ, রসায়নাদি বিজ্ঞানশাস্ত্রের আলোচনাও এখানে সুরু হয়। অগতের প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থকগণ গ্রন্থ সকলেই এখানে মহাদেশের দেশসমূহ হইতে উদ্ধৃত। কিন্তু কালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ায় ভারতবর্ষের দুর্দশা আরম্ভ হয়। পরাধীনতার নিগড় ভারতবাসীরা গলায় পবিত্রে বাঁধ্য হইয়াছিল। ক্রমে সমাজে নানারূপ অশান্তি ও দুর্গতি পরিলক্ষিত হয়। এগুলির ভিতর পরস্পরের মধ্যে সামাজিক মেলামেশা, ভ্রমণ, শাস্ত্রাধ্যয়ন, জ্ঞানার্জন-স্পৃহা এবং পরস্পরের হিত-কামনার অভাব বিশেষভাবেই অমুদ্রিত হইতে থাকে। সমাজদেহে যে সব কারণে ক্ষত দেখা দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ, কাকন-কৌলীভাদি প্রধান। পরস্পরের প্রতি শ্রীতির ভাব ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। আত্মস্বার্থ বজায় রাখার জন্য জাতীয় স্বার্থকে বলি দিতে কেহই পশ্চাৎপদ হইতে চাহে না। আবার বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গে মেলামেশার অভাব হেতু পরস্পরের ভুলভ্রান্তি শোধরাইতে এদেশীয়েরা অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু পরস্পরের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি জানিয়া, পরস্পরের অজ্ঞিত বিত্তা ও জ্ঞানের দ্বারা পরস্পরকে শক্তিমান করিয়া তোলা সম্ভব; সম্বন্ধশক্তির স্রবণ তখন স্বয়ংক্রিয় হইতে পারে। অমুঠান-পত্রখানিতে এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই বলা হয় যে, কলিকাতার সম্পন্ন, শিক্ষিত ও মান্তগণ্য অধিবাসীদের একটি 'সমাজ' স্থাপন দ্বারা স্বদেশের স্বার্থ কল্যাণ সাধনে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য। ইহার পর অমুঠানপত্র বলেন :

“যখন এই দেশ হিন্দু রাজস্ববর্গের অধীনে ছিল, তখন বিজ্ঞান অমুশীলন, প্রসার এবং বিজ্ঞান-বিতরণের উদ্যম ও ব্যাপক ব্যবস্থা ছিল। তখন যদি কেহ কোন বিষয়ে বিজ্ঞানজ্ঞানের পর অজ্ঞিত বিজ্ঞান অজ্ঞকে দান করিতে পরামুদ্র হইত, অথবা যদি কোন ধনী ব্যক্তি বিজ্ঞান উৎসাহ দানে বা পণ্ডিতগণকে পুরস্কৃত করিতে পশ্চাৎপদ হইত, তাহা হইলে সমাজে তাহার কোনরূপ মর্যাদা থাকিত না। বর্তমানে ইহার বিপরীত ভাব দেখা যাইতেছে। বর্তমান শাসকসম্প্রদায় আমাদের শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন বা পণ্ডিতগণের প্রতি কতকটা সহানুভূতিশীল হইলেও পরস্পরের আচার-আচরণ ও ধর্মবিশ্বাস এতই বিভিন্ন যে, হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্মের মূল ভাব এবং সমাজব্যবস্থা অমুদ্রাবলন করা শাসকবর্গের পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকে আবার হিন্দুধর্ম ও আচার-আচরণের উপর একান্তই বিরূপ, হিন্দুরা ভ্রান্ত ধর্মে বিশ্বাসী বলিয়া তাহাদের কাহারও কাহারও দৃঢ় ধারণা। • এবং এই কারণেই তাহারা হিন্দু-শাস্ত্রামুশীলনের বিরোধী ও আমাদের উন্নতির প্রতি উদাসীন। সুতরাং এরূপ ব্যক্তিদের নিকট হইতে কোনরূপ সাহায্য বা উৎসাহ পাইবার আশা করা বৃথা।

“আমাদের নিজেদের মধ্যে জ্ঞান এবং অজ্ঞানের ভুল্যমূল্য দেওয়া হইতেছে। একের নিন্দা বা অজ্ঞের প্রশংসা কচিৎ করা হয়। এখন অর্থই পদমর্যাদার মাপকাঠি। ধনী ব্যক্তিই এখন সকলের মর্যাদার।”

কিন্তু এ অবস্থার প্রতীকার আশু আবশ্যক, এবং এক্ষণে এ-দেশবাসীদেরই অগ্রণী হইতে হইবে। জনসাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস ফিরাইয়া আনিতে হইবে যে, সত্যকার মান-মর্যাদা সুখ-শান্তির নিদান হইল যথার্থ জ্ঞানলাভ। এই জ্ঞান বহুবিধ—বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা, প্রকৃতির নিয়ম-কানুন, বিভিন্ন দেশ ও জাতির মানুষ ও আচার-ব্যবহার-সম্পর্কিত জ্ঞান। এই সকল জ্ঞানের মানদণ্ডে বিচার করিলে বাংলা সাহিত্যের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। অর্থাৎ—ফার্সী, আরবী, সংস্কৃত ও ইংরেজী ভাষা আয়ত্ত করিয়া সকলের পক্ষে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন বিত্তার যে-সব উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে, মাতৃভাষা বাংলার তাহার অনুবাদ করিলে একদিকে যেমন বাংলা সাহিত্যের উন্নতি হইবে, অল্প দিকে তেমনি আমাদের জ্ঞানের পরিচিতি বাড়িবে। অনুষ্ঠানপত্রের নিম্নের অংশ হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

“We therefore beg to suggest, that the wise and well-informed men of this country should combine, and, as far as their respective abilities admit, or by the employment of pundits, and translators, the compilation or preparation of literary works, both local and foreign, which may improve the general stock of knowledge ; and publish the same in the name of the authors or compilers ; and we may thus produce a considerable set of works, in a short time, which will be of great general utility.”

এখানে বলা হইয়াছে যে, আলোচ্য সমাজ বা সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন ভাষা হইতে দেশী-বিদেশী উৎকৃষ্ট পুস্তকাবলী অনুবাদ বা সকলনের জন্ত পণ্ডিতদের নিযুক্ত করিবেন। আর অনুবাদক বা সকলক, প্রত্যেকেরই নিজ নিজ নামে এ সকল প্রকাশিত হইবে। এই ভাবে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ হইবে। অবিলম্বে এমন এক গ্রন্থ পুস্তক রচিত হইবে, যাহা হারা বাংলাভাষাভাবী আপামর সকলে বিশেষ উপকৃত হইবে।

প্রস্তাবিত সমাজ দ্বারা আমাদের সামাজিক হীনীতিগুলিও নিরাকরণের উপায় হইবে। আর একটি বিষয়েও তাহা বা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে। কারণ, বিষয়টি আত্মরক্ষার পক্ষে সবিশেষ প্রয়োজন। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা দীর্ঘকাল যাবৎ হিন্দু ধর্ম ও শাস্ত্রের কদর্ঘ এবং নিন্দাবাদ করিয়া আসিতেছিল। নানা প্রলোভন দেখাইয়া বহু লোককে খ্রীষ্টান করিয়াও ফেলিতেছিল। তাহারা পুস্তক-পুস্তিকা প্রচার করিয়া হিন্দুধর্মের নিন্দা করিতেও কল্পর করে নাই। বাইবেলের বঙ্গানুবাদ দ্বারা পাদ্রীদের এই মিথ্যাচার ও প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধভাবে আন্দোলন করা ভারতবাসী মাত্রেয়কর্তব্য। অনুষ্ঠানপত্রে এ সম্বন্ধেও এইরূপ বলা হইয়াছে :

“It thus appears that the Hindu, who has always been submissive, humble and inoffensive, is now exposed to unprovoked attacks, and is injured in his reputation, and consequently even in the means of subsistence, by persons who profess to seek his good. As yet this cruelty and calumny have been little heeded, and scarcely an effort to repel

them been attempted ; had such conduct been offered to the mussal-mans, they would instantly have combined to resent it ; and in like manner it is now incumbent on the opulept and respectable Hindus, who delight not in the abuse of their Shastras and practices, and who wish to cherish and preserve them, to consider well these circumstances, and upon full deliberation, to unite to publish replies to the charge made against us, or to represent our grievances to the Governmet, by whose wisdom no doubt a remedy will be devised."

সমাজ পাত্রীদের উপদ্রব রোধ করার ভার লইবেন। এই উদ্দেশ্যে সমাজের পক্ষ হইতে পুস্তিকা প্রচারিত হইবে, প্রয়োজন বোধে গভর্নমেন্টেরও সাহায্য লওয়া চলিবে—অস্থানপত্রখানিতে এই মর্মে বিশেষভাবে বলা হইল।

৩

অস্থানপত্রখানি পাঠের পর ইহার বিষয়বস্তু লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা হইল। ধর্ম ও রাজসংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনায় রসময় দত্তপ্রমুখ কয়েক ব্যক্তি আপত্তি জানাইলেন। কিন্তু সভায় ব্যক্তিগণ অধিকাংশই অস্থানপত্রোক্ত বিষয়াদির পোষকতা করিলেন। এই দিনকার সভার বিবরণ অস্থানপত্র সমেত পুস্তিকাকারে ছাপিবার প্রস্তাবও গৃহীত হইল। রামচন্দ্রলাল দে (সরকার) এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

গৌড়ীয় সমাজের দ্বিতীয় অধিবেশন হইল পরবর্তী ২৩শে মার্চ ১৮২৩ (১১ চৈত্র ১২২২)। এদিনকার সভায় দুইটি আবশ্যিক কার্য নিষ্পন্ন হয়। প্রথমতঃ, নিম্নলিখিত সভ্যগণকে লইয়া একটি অধ্যক্ষ-সভা গঠিত হইল—লাডলীমোহন ঠাকুর, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকান্ত ঘোষাল, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হারকানাথ ঠাকুর, রামজয় তর্কালঙ্কার, রাধাকান্ত দেব, তারিণীচরণ মিত্র ও কালীনাথ মল্লিক। রামকমল সেন ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর সম্পাদক রহিলেন। এদিনকার অধিবেশনের দ্বিতীয় কার্য—একটি স্থায়ী ভাণ্ডার স্থাপন। সভাস্থলেই দুই হাজার এক শত একান্ন টাকা এককালীন দান পাওয়া গেল। ত্রৈমাসিক চাঁদার প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল দুই শত চৌষট্টি টাকার। রামকমল সেনের প্রস্তাবে 'সমাচার চক্রিকা'-সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মুদ্রিত অস্থানপত্রখানি পুনরায় পাঠ করিলেন। এ দিনও ইহার বিষয়বস্তু লইয়া নানাবিধ বাদাছুবাদ ও কথোপকথন হইয়াছিল। কলিকাতার বাঙালী সমাজের গণ্যমান্ত পণ্ডিতবর্গ, ইংরেজীশিক্ষিত ও অজ্ঞাত সাহিত্যসেবী এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই সমাজের উদ্দেশ্যের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। এদিনকার সভায় উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নাম হইতেই ইহা প্রতীত হইবে—পণ্ডিত রঘুরাম শিরোমণি, রামজয় তর্কালঙ্কার, গৌরমোহন বিভালঙ্কার, কালীনাথ তর্কপঞ্চানন, রাধামাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, লাডলীমোহন

ঠাকুর, কানীকান্ত ঘোষাল, উমানন্দ ঠাকুর, চন্দ্রকুমার ঠাকুর, ষারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবচরণ ঠাকুর, লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মতিলাল, রূপনারায়ণ ঘোষাল, শ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়, রাধামোহন চক্রবর্তী, তাবাতাচন্দ্র চক্রবর্তী, গোপীকৃষ্ণ দেব, রাধাকান্ত দেব, চন্দ্রশেখর মিত্র, বৈষ্ণবনাথ দাস, বিশ্বনাথ দত্ত, কানীনাথ মল্লিক, রাধাকৃষ্ণ মল্লিক, বিশ্বম্ভর পানি, অবৈতচন্দ্র রায়, মদনমোহন শীল ও শিবচরণ মল্লিক।

প্রথম ও দ্বিতীয় সভার বিবরণ হইতে একটি বিষয় স্বতঃই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রামমোহন রায় তখন বিজ্ঞান, বুদ্ধিতে, একেশ্বরবাদ প্রচারে, সতীদাহ নিবারণবিষয়ক আন্দোলনে এবং পাত্রীদের বিপক্ষতাচরণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। রক্ষণশীল নেতৃবর্গ কতকগুলি বিষয়ে তাঁহার ঘোর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে লইয়া গৌড়ীয় সমাজ স্থাপিত হয়, তাহাতে রক্ষণশীল ও প্রগতিপন্থীদের মধ্যে কোনই বিরোধ ছিল না। এ কারণ রামমোহন রায় ইহার সঙ্গে যুক্ত না হইলেও স্বদেশের কল্যাণার্থে রামমোহনপন্থী ষারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রক্ষণশীল নেতা রাধাকান্ত দেব ও রামকমল সেনের সঙ্গে হাতে হাত মিলাইয়াছিলেন।

সমসাময়িক সংবাদপত্রে গৌড়ীয় সমাজের অন্যান্য চারিটি সভার উল্লেখ আমরা পাইতেছি। হিন্দু কলেজগৃহে সমাজের অধিবেশন হইত বলিয়াছি। তৃতীয় অধিবেশনও (৪ মে ১৮২৩) সম্ভবতঃ এখানে হইয়াছিল। এই অধিবেশনে ‘ব্যবহারমুকুর’ নামক গ্রন্থের অংশবিশেষ পঠিত হয়। এখানির রচয়িতা ভূঁকৈলাসের কালীশঙ্কর ঘোষাল। গৌড়ীয় সমাজের পক্ষ হইতে এ গ্রন্থখানি প্রকাশের কথা হইয়াছিল। এ সভার বিবরণ দিতে গিয়া ‘সমাচার দর্পণ’ (১৭ মে ১৮২৩) লেখেন :

“আমরা বিবেচনা করি যে এ সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে হইবেক যেহেতু এ সমাজে কেবল বিজ্ঞাবিশয়ের বুদ্ধির আলোচনা হইবেক তৎপ্রযুক্ত অনেক গুণবান ও গুণগ্রাহক লোক অত্যন্ত আকৃষ্ট করিতেছেন অতরাং বোধ হয় এই সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া দেশের উপকারজনক অবস্থায় হইবেন।” (‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা,’ প্রথম খণ্ড, ৩য় সং, পৃ. ১২)

গৌড়ীয় সমাজের পরবর্তী দুইটি অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হইতে জানা যায়, একটি হইয়াছিল চন্দ্রকুমার ঠাকুরের বাটীতে, ১৪ই সেপ্টেম্বর ১৮২৩ তারিখে; দ্বিতীয়টি হয় ৮ই ডিসেম্বর ১৮২৩ তারিখে, কালীশঙ্কর ঘোষালের ভূঁকৈলাস-ভবনে। শেষোক্ত সভার সংক্ষিপ্ত বিবরণ-দান প্রসঙ্গে ‘সমাচার দর্পণ’ (২৩ ডিসেম্বর ১৮২৩) পুনরায় লিখিতেছেন :

“এই সংবাদ আনন্দিত হইয়া প্রকাশ করিলামি যেহেতুক পূর্বে সমাজ স্থাপন সময়ে অনেকে অনেক প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া কহিতেন যে এ সমাজে কাহারো মনোযোগ হইবেক না কিন্তু এইক্ষণে পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশত দশ মাসের মধ্যে অনেক বিজ্ঞ ভাগ্যবান লোকের মনোযোগ হইয়াছে এবং হইতেছে ইহাতে বোধ হয় যে ঐ সমাজ চিরস্থায়ী হইয়া এতদেশের লোকের সৎ ফলদায়ক হইবে।” (ঐ, ঐ, পৃ. ১৩)

গৌড়ীয় সমাজের একটি অধিবেশন হয় ১৮২৪ সনের ২৬শে জুন। সমাচার দর্পণের ৩ জুলাই ১৮২৪ সংখ্যায় এই শেষ উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। সমাজের আত্মকূল্যে অল্প দিনের মধ্যে বেদ পাঠারম্ভ হইবে স্থির হইয়াছিল।

ইহার পর গৌড়ীয় সমাজের আর কোন অধিবেশনের সংবাদ পাই না। হয় ত সমাজ আরও কিছুকাল চলিয়াছিল। কিন্তু গৌড়ীয় সমাজ-প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলে বঙ্গভাষার অমূল্যলন যে বিশেষ প্রেরণা লাভ করিয়াছিল, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। গৌড়ীয় সমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব বঙ্গের মধ্যে বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র, ঈশ্বরিক পত্র, বিজ্ঞানপত্রিকা, কাব্য, পুরাণ, ব্যাকরণ, অভিধান, মানচিত্র এবং সংস্কৃত শাস্ত্র-গ্রন্থাদির বঙ্গানুবাদ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইতে থাকে। এমন কি, নব্যশিক্ষাপ্রাণ হিন্দু কলেজের যুবছাত্রগণও বাংলা ভাষার চর্চায় তৎপর হইলেন। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই যে দ্রুত উন্নতি ও বহুমুখী প্রসারলাভ—ইহার মূলে গৌড়ীয় সমাজের মঙ্গল-হস্ত প্রত্যক্ষ করি। গৌড়ীয় সমাজের সভ্যগণ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দিকপাল ছিলেন। সভ্যদের মধ্যে পণ্ডিত, নব্যশিক্ষিত ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণেরও অপ্রতুলতা ছিল না। এই সকল সভ্য ব্যক্তি ও সমষ্টিগতভাবে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি বিষয়ে তৎপর হইয়াছিলেন। বৈদেশিক ধর্মের আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার নিমিত্ত সংস্কৃত নানা শাস্ত্রগ্রন্থ বঙ্গাঙ্করে মুদ্রিত হইয়া অলপে প্রচারিত হইতে থাকে। ইহারও মূলে গৌড়ীয় সমাজের প্রেরণা রহিয়াছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ (১২৯৮-১৩৫৯)

ও

বসন্তরঞ্জন (১২৭২-১৩৫৯)

ঐচ্ছিকাহরণ চক্রবর্তী

পঞ্চ পর সাহিত্য-পরিষদ দুই জন বিশিষ্ট অন্তরঙ্গ বন্ধু ও কর্মীকে হারাইয়াছে—বাংলা সাহিত্যের দুই জন নিষ্ঠাবান সেবকের অবসান হইয়াছে। দুই জনেই অতি সাধারণভাবে জীবন আরম্ভ করিয়া নিজ নিজ চেষ্টায় অসামান্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। একজন পরিণত বয়সে দেহত্যাগ করেন, আর একজন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে কর্মব্যস্ত জীবন হইতে অবসর গ্রহণ করেন। পত আশ্বিন মাসে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কাঠিক মাসে বসন্তরঞ্জন রায় বিধবদ্রব্রত পরলোক গমন করিয়াছেন।

প্রায় কুড়ি বৎসর ধরিয়া ব্রজেন্দ্রনাথ নানারূপে সাহিত্য-পরিষৎকে অক্লান্তভাবে সেবা করিয়াছেন। ১৩৪০ সাল হইতে তিনি মৃত্যুর পূর্বে পর্যন্ত পরিষদের কর্ম-পরিচালনার সহিত অনিষ্টভাবে সংযুক্ত ছিলেন। সহকারী সম্পাদক, সম্পাদক, গ্রন্থাধ্যক্ষ, পত্রিকাধ্যক্ষ প্রভৃতি বিভিন্ন পদে বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষিত হইয়া তিনি পরিষদের গুরু দায়িত্বনির্বাহে প্রবৃত্ত পরিশ্রম করিয়াছেন। বস্তুতঃ তিনি যখন যে পদেই থাকুন না কেন, দীর্ঘকাল যাবৎ তিনিই ছিলেন পরিষদের কর্ণধার—সর্বময় কর্তা। পরিষদের আর্থিক দুর্বস্থা দূর করিয়া ইহার ভিত্তিকে দৃঢ় করিবার জন্য ব্রজেন্দ্রনাথ বিশেষ আগ্রহান্বিত ছিলেন। প্রধানত এই উদ্দেশ্যেই ঝাড়গ্রামরাজ গ্রন্থপ্রকাশ তহবিলের সাহায্যে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার খ্যাতনামা জনপ্রিয় গ্রন্থকারদের গ্রন্থাবলী প্রকাশে পরম উৎসাহে ব্যাপৃত হন—রামমোহন, মাইকেল, বঙ্কিম, দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলীর পরিষৎ-প্রকাশিত সংস্করণ অর্থাগমের একটা মূর্তন দিক্ খুলিয়া দেয়। তাহা ছাড়া, সাহিত্য-রসিক বাঙালী এই স্ত্রে এই সব গ্রন্থকারদের গ্রন্থের নির্ভরযোগ্য শোভন সংস্করণ পাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে। সাহিত্য-পরিষৎ হইতে ব্রজেন্দ্রনাথ অজ্ঞাত যে সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন, সেগুলিও একদিকে যেমন তাঁহার সাহিত্য-কীর্তি চতুর্দিকে প্রসারিত করে, অন্য দিকে তেমনি পরিষদের ভাণ্ডার অর্থে ভরিয়া দেয়। তাই ভীষণ দুর্যোগের মধ্যেও অর্থাভাবে পরিষৎকে সে রকম বিপন্ন হইতে হয় নাই। তাঁহার গ্রন্থগুলি বাঙালী সাদরে গ্রহণ করিয়াছে—ইহাঙ্গের একাধিক সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার অবর্তমানেও যাহাতে গ্রন্থগুলি প্রকাশের কোনরূপ অন্ত্রবিধা না হয়, এ ব্যবস্থাও তিনি আংশিকভাবে করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সহধর্মিণী-প্রতিষ্ঠিত ও তাঁহার অনিষ্ট বন্ধুবর্গ কর্তৃক পরিপোষিত ‘ব্রজেন্দ্রগ্রন্থ-পুনঃপ্রকাশ তহবিল’ ইহার অস্ত্যম নিদর্শন।

ব্রজেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সাধনার মুখ্য কেন্দ্র ছিল সাহিত্য-পরিষদ। এখান হইতেই তাঁহার সাহিত্য-সাধনার শ্রেষ্ঠ ফলগুলি প্রচারিত হয়। এই সাধনার পুরস্কার বঙ্গীয় সরকার-

শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্মান 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' প্রদানের ১৯৫২ সালে লাভ করেন। তাঁহার দীর্ঘকালের সাধনা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাহিত্য ও সমাজের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করিয়াছে। তাঁহার 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা,' 'বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস,' 'বাংলা সাময়িকপত্র' এবং 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'ব অন্তর্গত গ্রন্থগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ বাঙালী সাহিত্য-রসিকের আদর ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

প্রজন্মনাথের বহুবিস্তৃত সাহিত্য-সাধনাব পূর্ব বিবরণ দেওয়ার স্থান এখানে নাই। আশা করি, তাঁহারই প্রবর্তিত সাহিত্য-সাধক-চরিতমালায় একদিন তাহা প্রকাশের ব্যবস্থা হইবে। অবশ্য তাঁহার প্রধান প্রধান গ্রন্থগুলি অল্পনিরপেক্ষ ভাবেই তাঁহার বিরাট সাধনার জলন্ত নিদর্শন হিসাবে বাঙালীর হৃদয়পটে অল্পান ঔজ্জ্বল্যে বিরাজ করিবে।

বসন্তরঞ্জনর সহিত সাহিত্য-পরিষদের সম্পর্ক সাহিত্য-পরিষৎ প্রতিষ্ঠার সূচনা হইতেই। তিনি প্রথমাবধি ইহার সদস্য। সাহিত্য-পরিষদের পূর্বরূপ 'বেঙ্গল একাডেমি অফ লিটারেচারে'রও তিনি সদস্য ছিলেন। পরিষৎ-পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষেই তাঁহার 'ছেলে-ভুলানো ছড়া' প্রকাশিত হয়। ঠিক কোন্ সময় হইতে বলিতে পারি না, তবে অনেক দিন ধরিয়া তিনি পরিষদের পুষ্টি সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। বিনা পারিশ্রমিকে তিনি পরিষদকে ক্রমান্বয়ে আট শত পুষ্টি সংগ্রহ করিয়া দেন। এই কার্যের স্বীকৃতি হিসাবে তিনি পরিষদের সপ্তদশ বার্ষিক অধিবেশনে ইহার বিশেষ সদস্য নির্বাচিত হন।

এই উপলক্ষ্যে পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক রামেন্দ্রচন্দ্রর ত্রিবেদী মহাশয় বসন্তরঞ্জনর কার্যের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

বসন্তবাবু পরিষদের পুষ্টিসংগ্রাহক। তাঁহার ঐকান্তিক যত্নে পরিষদে পুষ্টির সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে এবং অনেকগুলি নূতন নূতন পুষ্টির উদ্ধার হইয়াছে। এই পুষ্টি সংগ্রহের জন্য ইহাকে গ্রাসে গ্রাসে ঘুরিতে হয়, তৎকাল ইহার বাহনের খরচ আছে, খাই-খরচ আছে, পরিষৎ হইতে তিনি তাহার এক কর্দমকণ্ড লয়েন না বা এই কার্যের জন্য পারিশ্রমিক হিসাবেও কিছু চায়েন না। পরিষদের প্রতি তাঁহার প্রদত্ত স্নেহবশে তিনি বহু ব্যয় স্বীকার করিয়াও এই কার্য করেন। অধিকন্তু তিনি পরিষদের প্রথম বর্ষ হইতেই ইহার সদস্য আছেন, এবং চিরকাল সাহিত্য সম্পর্কে ইহার কোন না কোন কার্যে সহায়তা করিয়া থাকেন, অথচ নিরমিত ভাবে ইহার চাহা দেন। পূর্বে তিনি সমস্তপুরে রেল আপিসে কার্য করিতেন। এখন পেন্সন লইয়াও পরিষদের প্রতি পূর্বস্নেহ সমান বজায় রাখিয়াছেন। এই সকল কারণে আমি পরিষদের এই চির উপকারী সদস্যকে ইহার বিশেষ সদস্যপদে নির্বাচিত করিতে প্রস্তাব করিতেছি।—(বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কার্যবিবরণী—১৭শ বর্ষ, পৃ. ১৩০)

পরবর্তী কালে অবশ্য বসন্তরঞ্জন কিছু দিনের জন্য পরিষদের পুষ্টিশালার কর্মচারী হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন। সেখানকার কর্ম পরিত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। প্রথমে পুষ্টিরক্ষক হিসাবে এবং পরে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক হিসাবে তিনি অনেক দিন ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯৩২ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। ১৩৪০ ও ১৩৪৮-৫০ সালে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্ততম সহকারী সভাপতি-পদে নির্বাচিত হন। কেবল পুষ্টি সংগ্রহ নয়—পুষ্টির বিবরণ

সংকলন এবং মূল্যবান পুথির বর্তমান কালোপযোগী ভাবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ ছিল তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার কতকগুলি পুথির বিবরণ তিনি সংকলন করেন। উহা পরিষদের 'বাক্সালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড—প্রথম সংখ্যা এবং তৃতীয় খণ্ড—দ্বিতীয় সংখ্যায় যথাক্রমে ১৩৩০ ও ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সংকলিত বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথির বিবরণ 'ডেসক্রিপ্টিভ্ ক্যাটালগ্ অব্ বেকলি ম্যুজুম্ স্ক্রিপ্টিস্ ইন্ দি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি' গ্রন্থের প্রথম (১৯২৬ খ্রী: অ:) ও দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯২৮ খ্রী: অ:) অন্তর্ভুক্ত হয়। তাঁহার সম্পাদিত প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে ফৈয়ানন্দের মনসামলই বোধ হয় সর্বপ্রথম ১৩১৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়। তাহার পর, রঘুনাথ ভাগবতাচার্যের কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী (বঙ্গবাসী কার্যালয়, ১৩১৭), আনন্দীরাম বিশ্বাবাগীশ ব্রহ্মচারীর গীতাভাষা সারসংগ্ৰহ (গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনী-গ্রন্থাবলী—১৮), চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩২৩) প্রচারিত হয়। ইহা ছাড়া, স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সহিত মিলিত ভাবে তিনি দুই খণ্ড 'গোপীচন্দ্রের গান' (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২২, ১৯২৪) ও লালী জয়নারায়ণ সেন-প্রণীত হরিলীলা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৭) সম্পাদন করেন। অটলবিহারী ঘোষের সহযোগিতায় সম্পাদিত কমলাকান্তের 'সাধকরঞ্জন' বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ হইতে ১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয়।

প্রাচীন গ্রন্থে প্রাপ্ত প্রাচীন শব্দগুলি বসন্তরঞ্জনের বিশেষ আলোচনার বিষয় ছিল। কৃষ্ণকীর্তনের ও গোপীচন্দ্রের গানের টীকা টিপ্পনী অংশ তাহার নিদর্শন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল—প্রাচীন বাংলা শব্দের একখানি অভিধান সংকলন করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি কিছু কিছু উপকরণও সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই।

বসন্তরঞ্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম হইতেছে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্তন নামক গ্রন্থের আবিষ্কার, স্মৃতিভাবে সম্পাদন ও প্রকাশ। ১৩১৮ সালের পরিষৎ-পত্রিকায় (পৃ: ১১৩—১৩২) এই গ্রন্থের পরিচয় প্রকাশিত হয় এবং ১৩২৩ সালে ইহা টীকা টিপ্পনী সহযোগে পরিষৎকর্তৃক প্রচারিত হয়। কেহ কেহ গ্রন্থখানির অকৃত্রিমতা সন্দেহ সম্বন্ধে প্রকাশ করিলেও সাধারণভাবে পণ্ডিতমণ্ডলী ইহাকে সাদরে অভিনন্দন করেন—ইহার ভাষা চণ্ডীদাসের সমকালীন ভাষার চূর্ণত নমুনা হিসাবে পরিগৃহীত হয়। গ্রন্থখানির সম্পাদনায় সম্পাদকের কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্য বিশেষভাবে সুধীসমাজের প্রশংসা অর্জন করে।

সাহিত্যসাধনার পুরস্কার হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৪১ সালে বসন্তরঞ্জনকে 'সরোজিনী বসু পদক' প্রদান করেন এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্ ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে তাঁহাকে বিশিষ্ট-সদস্য নির্বাচিত করেন।

১। এই এসঙ্গে 'বাগল শতকের বাঙ্গালা শব্দ' শীর্ষক তাঁহার একটি প্রবন্ধ উল্লেখযোগ্য। ইহা পরিষৎ-পত্রিকায় বহুবিংশ ভাগের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আশ্চর্যের কথা এই যে, এই সংখ্যায়ই একই বিষয়ে শ্রীযোগেশচন্দ্র দায়ের 'সাঙ্কে-সাত শত বৎসর পূর্বের বাঙ্গালা শব্দ' প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়।

অনুপনারায়ণ তর্কশিরোমণি

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বঙ্গদেশে প্রাচীন কাল হইতে বেদান্তদর্শনের চর্চা প্রচলিত আছে। কন্দলীকার শ্রীধরাচার্য্য হইতে বাসুদেব সার্কভৌম পর্য্যন্ত বাঙ্গালার মহামনীষিগণ সকলেই বড়দর্শন কৃতবিশ্ব ছিলেন—তন্মধ্যে বেদান্তদর্শনে অনেকের বিশেষ অভিরুচি ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীধরাচার্য্য স্বয়ং ‘অম্বয়সিদ্ধি’ নামে বেদান্তদর্শনে এক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন (ভ্রামকন্দলী, পৃ. ৫ ত্রুটব্য)। সার্কভৌম পিতৃপরিচয়েস্থলে “বেদান্তবিজ্ঞানময়্যং” বলিয়া পিতা নরহরি বিশারদের দার্শনিক পক্ষপাত সূচনা করিয়াছেন এবং ‘পদ্মাবলী’তে উদ্ধৃত তাঁহার একটি শ্লোকে “বেদান্তাঃ পরিশীলিতাঃ সরভসং” উক্তিদ্বারা স্বকীয় পক্ষপাতও অভিব্যক্ত হইয়াছে। সার্কভৌম-রচিত বেদান্তগ্রন্থের বিবরণ আমরা অল্প লিখিয়াছি (বঙ্গ নব্যজ্ঞানচর্চা, পৃ. ৪১-৪২)। নব্যজ্ঞানের অভ্যুদয়ের পূর্বে কবিপণ্ডিত শ্রীহর্ষরচিত বেদান্তপ্রকরণ ‘খণ্ডনখণ্ডখাত’ গ্রন্থ ভারতবর্ষের সর্বত্র প্রচারিত হইয়া এক পৃথক সম্প্রদায় সৃষ্টি করে—যাহা অতাপি বিলুপ্ত হয় নাই, বলা যাইতে পারে। শ্রীহর্ষ নিঃসন্দেহ বাঙ্গালী ছিলেন। বঙ্গদেশে শত শত বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন, যাহাদের নাম বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আমরা উদাহরণস্বরূপ একটিমাত্র নাম গবেষণাধারা উদ্ধার করিয়া দিতেছি। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে ‘বঙ্গভূষণ চট্ট’ বংশ একটি সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিতবহুল গোষ্ঠী। ৪৩ সমীকরণে এই বংশীয় ‘শ্রীকৃষ্ণ’ সম্মানিত হইয়াছিলেন—তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে চতুর্থ ছিলেন “ভট্টাচার্য্যখ্য-গঙ্গাধর ইহ স্ক্রুতী জ্ঞানবেদান্তবেত্তা” (‘প্রবাসিন্দের ‘মহাবংশ’, পৃ. ৫৪)। এই গঙ্গাধর কবি কৃতিবাসের পূর্ববর্তী এবং তাঁহার অভ্যুদয়কাল প্রায় ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ।

নব্যজ্ঞানের চরম অভ্যুদয়কালে অল্পাঙ্গ দর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের চর্চা বঙ্গদেশে ব্যাপকভাবে অনাদৃত হইয়াছিল, কিন্তু চিরলুপ্ত হয় নাই। অগদীশ-গঙ্গাধরের যুগেও বাঙ্গালী পণ্ডিত বেদান্ত-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা দুইটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিতেছি। খ্রীষ্টীয় ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সর্ববিজ্ঞাবিশারদ নানাজন্যকাব মহাপণ্ডিত রামনাথ বিজ্ঞা-বাচস্পতি ‘বেদান্তরহস্ত’ রচনা করিয়াছিলেন—তদ্রচিত কাব্যপ্রকাশের টীকায় ঐ গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে (৬১ পত্র)। ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিখ্যাত স্মার্ত পণ্ডিত উলা-নিবাসী রঘুনাথ সার্কভৌম ‘সিদ্ধান্তার্থব’ নামে শঙ্করমতে এক নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন (L. 2099—পত্রসংখ্যা ৪৮)। উভয় গ্রন্থই অধুনা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমরা বর্তমান প্রবন্ধে বেদান্তগ্রন্থের একজন বাঙ্গালী বৃত্তিকারের পরিচয়াদি লিপিবদ্ধ করিতেছি। রাজেন্দ্রলাল মিত্র বর্দ্ধমান জিলার মানকরনিবাসী পরমভাগবত। হতলাল মিশ্রের নিকট ‘সমঞ্জসা’ বৃত্তির প্রতিলিপি প্রথম আবিষ্কার করেন (L. 687—পত্রসংখ্যা ১০৯)। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ইহার প্রতিলিপি রক্ষিত আছে (১৩৬৭ সং পৃথি—

পত্রসংখ্যা ৩৫, মধ্যে ৫—৯ পত্র নাই)। ২৫ বৎসর পূর্বে এই বৃত্তি সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে মুদ্রণার্থ গৃহীত হইয়াছিল—শেষ পর্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই। ইহার আরম্ভবাক্য এই,

স্বত্রার্থ-স্বত্রকৃদন্তাধ্যকৃদন্তরুশ্বংসমঞ্জসাং ।

বৃত্তিং শ্রীমাম্ বক্ত্যানুপানারায়ণশিরোমণিঃ ॥

এই গ্রন্থ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের নামে উপন্যস্ত। গ্রন্থশেষের মনোহর শ্লোক উদ্ধৃত হইল :—

কৃষ্ণপ্রেমসুখাচ্ছিন্নমগ্নমনসো রূপস্বরূপাদয়ঃ

প্যাভা যৎকৃপটৈব সম্প্রতি বয়ং সর্বং কৃতার্থা যতঃ ।

এষা বৃত্তিরনন্তবৈষ্ণবমনোমোদনায় সাধীয়াসী

শ্রীচৈতন্যহরেন্দ্রমামযতনোস্তস্তোপহারায়তাম্ ॥

বুঝা যায়, গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যকে শ্রীকৃষ্ণেব সহিত অভিন্ন ধরিতেন এবং ‘অনন্ত’ অর্থাৎ একনিষ্ঠ (গৌড়ীয়) বৈষ্ণবদের অস্ত্র এই বৃত্তি রচনা করিয়াছিলেন। ইহা সংক্ষিপ্ত এবং বাদবিচার-বঞ্চিত। বহু স্থলে শ্রীমদ্ভাগবতের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্যেব বিষয়, বলদেব বিভাভূষণ-রচিত ‘গোবিন্দভাষ্য’ কিম্বা তদুপরি বাণীশ্বর-কৃত ব্যাখ্যান এই বৃত্তিতে অমুদ্রিত হয় নাই। আমরা নিদর্শনস্বরূপ কয়েকটি স্বত্রের বৃত্তি উদ্ধৃত করিয়া গ্রন্থকারের নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। ‘ঈক্ষতের্নাশঙ্কং’ (১।১।৫) স্বত্র সকলেই সাংখ্যমতের খণ্ডন বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন—কিছু গোবিন্দভাষ্যে ইহার ব্রহ্মপর ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়। সমঞ্জসায় চিরন্তন ব্যাখ্যাই অমুদ্রিত হইয়াছে (‘অথ সদেবেত্যস্ত্র সংশ্লেন প্রধানমিতি চেৎ। ঈক্ষতেঃ...পরিশেষাৎ সাংখ্যাদিমতীয়াং প্রধানাদি ন জগৎকারণমতোহ-শঙ্কমবেদমূলকম্’)। ৩।৩।৫২ স্বত্রের (পরেণ চ শব্দস্ত ইত্যাদি) ভক্তিপূর ব্যাখ্যাটি অভিনব :—‘পরেণ পরমেশ্বরেণ চাত্ত্বভজেন চ অমুবন্ধঃ স্নেহসংবন্ধঃ তস্মিন্ তন্নিবন্ধমেবা-বিশেষস্তাবিধ্যং তদম্বু করণঞ্চ। ভক্ত্যাখ্যোপাসনা পরমমুখ্যা। ‘ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিরসঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি’। ‘ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়াসী’তি ঋতিশ্রুতিশব্দস্ত ভূয়স্বাৎ। তিন্নোপক্রম-স্বর্থস্ত ‘মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ, সুদুর্লভঃ প্রোক্তান্ত্রো’ত্যাভ্যাজ্যং কৈবল্যোপি পরমফলমিদং ন তু সাধনমাত্রমিতি। ন চাত্ত্ব ভকৌ বৃক্তঃ ‘অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবাঃ ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ’ ইত্যুক্তেঃ ॥’ (২।৩।২৭ পত্র)। গ্রন্থকার বহু স্থলে শঙ্করাচার্য্যাদির মতবিবোধী ভাগবতমতানুযায়ী নিজস্ব মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা হুই একটি পঙ্ক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। ৪।৪।৭ স্বত্রের বৃত্তিতে আছে—‘সিবেব আশ্রয়বন্ধসৌরভ ইত্যাদিবেৎ চিন্ময়স্বরূপাবস্থেষপি তজ্জপেণ ভোগো যোগমায়য়া (=অচিন্ত্যশক্ত্যা) ঘটতে ইতি ভাবঃ’ (৩।৪।১ পত্র)। ৪।৪।১০ স্বত্রের বৃত্তিতে পাওয়া যায়—‘বৈকুণ্ঠপুরবাসস্ত প্রাকৃত্যচিন্ত্যশক্তেঃ।’ (৩।৪।২ পত্র)। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বঙ্গদেশে ‘গুহ্যবৈকুণ্ঠ’বাদী এক বৈষ্ণব সম্প্রদায় ছিল, যাহার মতেও ‘নন্দনন্দন এব ব্রহ্মপদ্ব্যচ্যঃ’—হরিদাস-রচিত ‘বেদান্তসিদ্ধান্তকৌমুদী’ নামক অধুনালুপ্ত গ্রন্থ এই সম্প্রদায়ের পরিচায়ক (L, 2100, পত্রসংখ্যা ৬৭)।

এসিয়াটিক সোসাইটিতে মাত্র পাঁচ পত্রের একটি পুস্তিকা আছে—আলোচ্য গ্রন্থকার-
রচিত ভাগবতের সূচী। গ্রন্থারম্ভ যথা,

অমরালীসেব্যমানং নখমণ্যভিশোভিতং ।

আশ্চর্য্যং ত্রীপদ্বিনাভপাদপদ্রমহং ভজে ॥

গ্রন্থশেষ এই,

শাস্ত্রধ্বজপ্রকরণাধ্যায়বাক্যপদাক্ষরৈঃ ।

সমাধিতাষয়ান্তার্থান্ মুষতাং পাদয়োৰ্ত্তজে ॥

ত্ৰীমান্ সমকৃতা (নুপ) নারায়ণশিরোমণিঃ ।

বিষ্বিনোদিনীনাম-ত্ৰীভাগবতসূচনীং ॥

ত্ৰীসনাতনরূপাষ্টাঙ্গলসীদাসমুখ্যকাঃ ।

ত্ৰীপ্রবাগদা(স)মুখ্যাঃ সন্তুঃ সন্তু সদা হৃদি ॥

ইতি ত্ৰীঅনুপনারায়ণতর্কশিরোমণিবিব্রচিতা বিষ্বিনোদিনী নাম ত্ৰীভাগবতস্ত সূচিকা
সমাপ্তা ॥

এই পুস্তিকায় তুলসীদাসাদির নামোল্লেখ থাকায় বুঝা যায়, গ্রন্থকার বাঙ্গালী হইলেও
পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার অভ্যুদয়কাল খ্রীঃ ১৭শ শতাব্দীর পূর্বে নহে।

সৌভাগ্যবশতঃ আমরা কুলপঞ্জীতে আলোচ্য গ্রন্থকাবের নাম আবিষ্কার করিতে সমর্থ
হইরাছি—কুলপঞ্জীর প্রামাণিকতায় সম্বিহান শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পুনঃ আকর্ষণ করিয়া
আমরা তাঁহার কুলপরিচয় উদ্ধৃত করিতেছি। বারেন্দ্র শ্রেণী বাৎস্তগোত্র ‘সাক্তাল’ বংশের
আদি কুলীন লক্ষ্মীধরের অধস্তন নবম পুরুষ “শিখাই সাক্তাল” উদয়নাচাৰ্য্য ভাট্টদীর
সমকালীন এবং অনামধন্ত কুলুক তট্টের জামাতা ছিলেন—তাঁহার অভ্যুদয়কাল প্রায় ১৩০০
খ্রীষ্টাব্দ। শিখাইর অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ “বৈষ্ণব মিশ্র” বিখ্যাত কুলীন ছিলেন—আমরা হুপ্রোপ্য
নামমালা বাহুল্যবোধে উদ্ধৃত করিলাম না। লাহিড়ীবংশীয় ভারতবিশ্রুত মহানৈয়ামিক
প্রগল্ভাচাৰ্য্যের পিতা “নরপতি মহামিশ্র” বারেন্দ্র সমাজের একজন প্রধান কুলীন ছিলেন—
“করণ” নামক কুলপঞ্জীর বিভাগে তাঁহার কুলক্রিয়ার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার
১৭টি কুলসদস্যের মধ্যে একটি হইল সাক্তালবংশীয় বৈষ্ণব মিশ্রের সহিত (সা-প প, ৪৭, পৃ.
৭০)। সুতরাং বৈষ্ণব মিশ্রের অভ্যুদয়কাল তাঁহার বনিষ্ঠ আত্মীয় মহামিশ্রের জায় খ্রী.
১৫শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ অবধারিত হয় (বঙ্গে নব্যজাতিচর্চা, পৃ. ২৫৭ লেখ্য)। আলোচ্য
গ্রন্থকার বৈষ্ণব মিশ্রের অধস্তন দশম পুরুষ। নামমালা এই—বৈষ্ণব মিশ্র, তজ্জ্যেষ্ঠ পুত্র
মুকুন্দ, তৎপুত্র পুরুষোত্তম (দ্বিতীয়), তৎপুত্র ত্রীপতি (দ্বিতীয়), তৎপুত্র গোপাল, তৎপুত্র
ভবানীচরণ, তৎপুত্র জগন্নাথ, তৎপুত্র মুনিরাম, তৎপুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ, তৎপুত্র “অজুগুপ
সিরোমণি বসন্ত বারানসি” (অস্মিকটে রক্ষিত কুলপঞ্জীর ১৩৫-৬ পত্র)। তিন পুরুষে
এক শতাব্দী ধরিলে অনুপ শিরোমণির অভ্যুদয়কাল হয় খ্রী. ১৮শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ। বসন্তঃ
কাশীনিবাসী এই শিরোমণি ঐ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে জীবিত ছিলেন, প্রমাণ আছে। অর্থাৎ

এ স্থলেও এক পুরুষের গড়পড়তা হইতেছে ৩৫ বৎসরের উর্দ্ধে। প্রমাণটি এই—মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত খড়ারি গ্রামে “শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞাবাগীশ” নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার একটি সমৃদ্ধ পুথিসংগ্রহ ছিল। তিনি অগুরুক ছিলেন এবং তাঁহার পুথিগুলি সম্প্রতি ঐ জিলার বাসুদেবপুরনিবাসী শ্রীপঞ্চানন রায় কাব্যতীর্থে হস্তগত হইয়াছে। আমরা কাব্যতীর্থ মহাশয়ের সৌজন্তে পুথিগুলির তালিকা পরীক্ষা করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞাবাগীশ ১৮২৪ শকাব্দ হইতে ১৭৫৪ শকাব্দ পর্য্যন্ত (অর্থাৎ ৬০ বৎসর ধরিয়া) নানা শাস্ত্রগ্রন্থের প্রতিলিপি করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে বহু বেদান্তের গ্রন্থ আছে। ১৭২৭ শকাব্দে অমূল্যবান্ উক্তি করিয়াছেন—“শ্রীকাশীস্থিত অনুপনারায়ণ তর্কশিরোমণি ও শ্রীশঙ্করানন্দস্বামিশিষ্য”। স্মরণ্য শ্রীকৃষ্ণ কাশীতে ছই জনের নিকট বেদান্তাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন—তাঁহার কাশীতে অধ্যয়নকাল সম্ভবতঃ খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীর শেষ পাদ। বলা বাহুল্য, কাশীনিবাসী এই অনুপনারায়ণ তর্কশিরোমণিই যে সমগ্রসা-বৃত্তিকাব, তদ্বিষয়ে কোন সংশয়ের অবকাশ নাই। এই অতিচুর্ণিত নামবিশিষ্ট একাধিক ব্যক্তির অস্তিত্বের সম্ভাবনা নাই। ভাগবতসূচীতে ভুলসীদাসের নামোল্লেখদ্বারা তাঁহার কাশীনিবাস সমর্থিত হয়।

বচনসমস্যা, না বিভক্তি-বিভ্রাট

শ্রীননীগোপাল দাশশর্মা

বচন সংজ্ঞাটির যাবতীয় পরিচিত ব্যাকরণে ব্যবহার দৃষ্ট হয়। কতকগুলি ভাষায় একবচন ও বহুবচন এবং কতকগুলি ভাষায় একবচন, শিবচন ও বহুবচন। এই বচন-সংজ্ঞার প্রয়োজন বিষয়ে প্রায় উঠিলে, সাধারণতঃ উত্তর আসিবে, পদার্থের একত্ব বহুত্ব প্রকাশ করাই ইহার কার্য। উত্তরটি সমীচীন কি না, একটু বিচার করিয়া দেখা দরকার। একত্ব বহুত্ব প্রকাশ করা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও এই বচনাত্মক সংজ্ঞার প্রধান লক্ষ্য, সাপেক্ষ পদ-গুলির সংযম রক্ষা করা। কতকগুলি ভাষায় বিশেষ্য পদের বচন অল্পসারে বিশেষণ ও সর্বনাম এবং উদ্দেশ্য পদের বচন অল্পসারে ক্রিয়াপদের বচন নির্দিষ্ট হয়।

এ দেশের ও ভিন্ন দেশের অধিকাংশ প্রাচীন ভাষা হইতে আরম্ভ করিয়া অনেক আধুনিক ভাষায় পর্যন্ত এই রীতির অনুসরণ চলিয়া আসিতেছে। কতকগুলি ভাষায় কিছু কিছু ব্যত্যয় ঘটিয়াছে, যেমন যুরোপীয় গ্রীক, ল্যাটিন, ফ্রেন্স, ইটালিয়ান, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় এই প্রণালী সম্পূর্ণভাবে অলুপ্ত হইলেও ইংরাজী ভাষায় বিশেষণ পদে সম্পূর্ণভাবে এবং ক্রিয়াপদ রচনায় আংশিক ভাবে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ দেশের সংস্কৃত, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় এই সাপেক্ষত্ব সূচকভাবে স্থায়ী লাভ করিলেও বাঙ্গালা ভাষা এই প্রণালী হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্তি লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালায় বিশেষণ বা ক্রিয়াপদে বচনের অপেক্ষা করে না। সর্বনামপদ প্রয়োজন হইলে পদার্থের একত্ব বা বহুত্ব অনুসরণ করিয়া বাক্যে ব্যবহৃত হয়। একবচন বা বহুবচনের অনুসরণ করে না।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, সাপেক্ষত্বে বচনের লক্ষ্য, একত্ব বা বহুত্ব তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার। এক্ষণে উদাহরণের দ্বারা বক্তব্য স্পষ্ট করা যাইবে। সংস্কৃত ভাষায়, যেমন—
বুদ্ধিমান্ বালকঃ গচ্ছতি, বুদ্ধিমন্তো বালকো গচ্ছতঃ, বুদ্ধিমন্তঃ বালকাঃ গচ্ছন্তি, এই তিনটি বাক্যে লেখা যায় যে, বালক এই বিশেষ্য এবং উদ্দেশ্য পদ অল্পসারে বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদ যথাক্রমে একবচনাদি সংজ্ঞার বিষয়ীভূত হইয়াছে। এই প্রকার ইংরাজী ভাষাতেও যাত্র বর্তমান কালে (Present tense) দেখা যায়, A good boy reads, এবং The good boys read. উদ্দেশ্য পদের একবচন ও বহুবচন অল্পসারে ক্রিয়াপদ একবচন ও বহুবচনে পরিবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু বিশেষণ পদ একই অবস্থায় আছে।

শতং বুদ্ধিমন্তঃ বালকাঃ গচ্ছন্তি, কিন্তু বুদ্ধিমৎ বালকশতং গচ্ছতি, বুদ্ধিমতাং বালকানাং শতং গচ্ছতি, বুদ্ধিমৎ বালকত্রয়ং গচ্ছতি, বালকগণঃ গচ্ছতি, বালিকাসমূহঃ পঠন্তি, পঞ্চজালা (সমূহ অর্থে) রাজন্তি। এই উদাহরণগুলির সর্বত্র বহুত্বের প্রতীতি ঘটিলেও উদ্দেশ্যপদে একবচনই ব্যবহৃত হইয়াছে এবং তদল্পসারে বিশেষণ ও ক্রিয়াপদেও একবচনের বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। এই প্রকার Many men are going, এখানে men অল্পসারে

ক্রিয়াপদে বহুবচন, কিন্তু Many a man is going, A gang of robbers is passing the road, A hard of cows is grazing on the field—সর্বত্র বহু বুঝাইলেও উদ্দেশ্যপদে একবচন থাকায় ক্রিয়াপদে একবচন ব্যবহৃত হইল।

সংস্কৃত ভাষায় এমন কতকগুলি শব্দ আছে, তাহা একটিমাত্র পদার্থ বুঝাইলেও বহুবচনে ব্যবহৃত হয়। অপ (অল) শব্দে বচনের প্রয়োজন না হইলেও বহুবচনে প্রয়োগ করিতে হয়। একবচন বা দ্বিবচনে প্রযুক্ত হইবে না। এই সকল শব্দের বিশেষণ ও সর্বনামে এবং উদ্দেশ্যপদ হইলে ক্রিয়াপদে বহুবচনের বিভক্তি যুক্ত হইবে। অধুনা যে হিন্দী ভাষা ভারতের বাহ্যভাষায় পবিত্র করা হইতেছে, তাহাতেও এই প্রণালীর সুস্পষ্ট ব্যবহাব হইয়া থাকে। অধিকন্তু অধিকাংশ স্থলে মূল ধাতু ক্রিয়াবাচক বিশেষণে পরিণত হয় এবং প্রয়োজনমত লিঙ্গগত প্রত্যয়ের প্রয়োগ করিতে হয়। উদ্দেশ্যেও এই প্রণালীর ব্যবহাব আছে। সুতরাং বচনের গুরুত্ব এই সকল ভাষায় সর্বত্র সাপেক্ষ, অর্থাৎ পবম্পরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট। বাঙ্গালার এই অপেক্ষার কোন সম্বন্ধ নাই। কেবল পদার্থটি এক কিম্বা একাধিক, তাহাই কোন প্রকারে বুঝানর প্রয়োজন।

বাঙ্গালা ভাষার যে-কোন ব্যাকরণেই একবচন ও বহুবচনের অনেক প্রকার বিভক্তি দেখা যায়। বিশ্লেষ করিলে উহাতে তিন প্রকার বিভক্তিবিভ্রাট দৃষ্টিতে পড়ে। বাঙ্গালার বৈয়াকরণদের ধারণা, যে ভাবেই বহু বুঝান হউক না কেন, সবগুলিই বহুবচনের অন্তর্গত। সেই হেতু দিগ, গুলি, গণ, সমূহ প্রভৃতির সহিত কে, এর, র প্রভৃতি যুক্ত করিয়া বহুবচনাত্মক বিভক্তি বলা হয়, এবং ঐগুলি প্রাপ্তিপদিকের উত্তর সকল প্রকার বিভক্তিতে যুক্ত করা হয়। এমন কি, সকল বালক, অনেক বইয়ের, বহু লোককে, এই প্রকার পদসংস্থানকেও কেহ কেহ বহুবচন বলিয়া থাকেন। ইহা কি প্রকারে সমীচীন হইতে পারে, তাহা বিজ্ঞ জ্ঞানের চিন্তার বিষয়। গুলি, গণ প্রভৃতির যোগে যদি বহুবচনাত্মক বিভক্তি বলিতে হয়, তাহা হইলে সমূহবাচক অনেক শব্দ সংস্কৃত সাহিত্যে আছে এবং তাহাদের অনেকগুলি বাঙ্গালা ভাষায় ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ঐ সকল শব্দের সঙ্গে কে, র, এ প্রভৃতি যোগ করিয়া বহুবচনাত্মক বিভক্তি স্বীকার করা উচিত। সেই মত আর একদিকে টি, টা, থানা, থানি, টুকু প্রভৃতির সহিত কে, র, এ প্রভৃতি যোগ করিয়া একবচনাত্মক বিভক্তি বলিয়া নির্দেশ করিতে হয়। বিভক্তি নির্দেশের এই অদ্ভুত প্রণালী অপর কোনও ভাষার ব্যাকরণে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া জানা নাই।

বিভক্তির সঙ্গে বিভক্তি বলিয়া স্বীকৃত শব্দ সাধারণ শব্দ এবং অব্যয় শব্দ যোগ করিয়া পুনরায় তাহাদের বিভক্তি সংজ্ঞা নির্দেশের দ্বারা আর এক বিভক্তিবিভ্রাটের সৃষ্টি করা হইয়াছে। যেমন কে-দিয়া, এর-দ্বারা, দেরকে-দিয়া, এর-হইতে, এর-মধ্যে, র-তরে, র-লাগিয়া, এর-জন্ত ইত্যাদি। এখন দৃষ্টিতে না পড়িলেও অচিরেই উপরে, নীচে, কাছে, ভিতরে, অপেক্ষা, চেয়ে, বিনা প্রভৃতি শব্দের মিলিতরূপে নব নব বিভক্তি সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। সংস্কৃত বহুব্রীহিসমায়ানিশ্পন্ন পদের অংশাবশেষ কর্তৃক লইয়া তৃতীয়ার একটি

বিভক্তি সৃষ্টি করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ কর্তৃক এই পদাংশটি চক্ষুর সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও করণকারকের বিভক্তি বলিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এই সমাসনিপন্ন পদটি ক্রিয়ার বিশেষণ। বাঙ্গালাতেও ইহাকে ক্রিয়ার বিশেষণ বা ক্রিয়াবাচক বিশেষণের বিশেষণ বলা চলিতে পারে।

এতদ্ভিন্ন সংস্কৃত ভাষার ছায় সাতটি বিভক্তির অঙ্কুরণ করিতে যাওয়ার অকারণ একপ্রকার বিভক্তির কোন স্থলে তিন বার, কোন স্থলে দুই বার পুনরাবলম্বিত ঘটিয়াছে। যেমন প্রথমা, তৃতীয়া ও সপ্তমীর কতক অংশ এবং দ্বিতীয়া চতুর্থী সম্পূর্ণ।

বচনের সাপেক্ষে না থাকায় এক দিকে যেমন ভাষায় সরলতার পথ প্রশস্ত হইয়াছে, অপর দিকে তেমনই এই অঙ্কুরিত সামঞ্জস্যহীন সংখ্যারহিত নিত্য নব নব বিভক্তির রচনার শিক্ষার্থীর সম্মুখে বিকট বিভীষিকার সৃষ্টি হইতেছে। কোনও একখানি ব্যাকরণ দেখিয়া আজ কেহ বাঙ্গালার বিভক্তির সংখ্যা ঠিক করিয়া বলিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যায় না। অথচ ব্যাকরণ-বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া বিভক্তির অঙ্কুরাঙ্কন করিলে দেখা যাইবে, চারিটি বিভাগে মাত্র সাতটি বিভক্তি ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। ইহাঙ্গের মধ্যে বর্ণবিশেষের উত্তর দুই একটি বিভক্তি সামান্য রূপান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। লিঙ্গানুসারে বাঙ্গালা বিভক্তির কোনও রূপান্তর হয় না।

লক্ষপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসংরক্ষী ভাষাগুলির মধ্যে এই একটিমাত্র ভাষা, যাহাতে বচনের সাপেক্ষতা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। ভাষাতত্ত্ববিদগণ অবশ্যই বুঝিতে পারেন, এই নিরপেক্ষতা অপর ভাষাতাত্ত্বিক বোধের পক্ষে পথ সহজ করিয়া দেয়। এই প্রকার আরও একটি সংজ্ঞা বাঙ্গালা ভাষায় ক্রমশঃ কমিতে কমিতে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে, যাহার ফলে তাহার ক্ষীণ রেখা বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য সামান্য গোচরে পড়িলেও অচিরেই তাহা লুপ্ত হইয়া যাইবে। এই সংজ্ঞার নাম লিঙ্গ। প্রবক্তান্তরে ইহার আলোচনার ইচ্ছা থাকিল।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৬০ ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়



২৫৩১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৩

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির

হইতে শ্রীসনৎকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬০ বর্ষের কৰ্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীস্বনীকান্ত দাস

সহকারী সভাপতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীরমলচন্দ্র সিংহ

শ্রীগণপতি সরকার

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ শুধু

শ্রীতারাক্ষর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীমূলকুমার দে

সম্পাদক

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সহকারী সম্পাদক

শ্রীহরজিৎ রায়

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র তপাদার

শ্রীমুদলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ শুধু রায়

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মূখোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীনির্মলকুমার বসু

কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

- ১। শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ মজুমদার, ২। শ্রীভাসুতোষ ভট্টাচার্য, ৩। শ্রীকুমারেশ ঘোষ,
- ৪। রেভাঃ ফাদার এ. দৌতেন, ৫। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৬। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য,
- ৭। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ১০। শ্রীপ্রভাকরী দেবী, ১১। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১২। শ্রীমনোরঞ্জন শুধু,
- ১৩। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বাগল, ১৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ১৫। শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ,
- ১৬। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১৭। শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ১৮। শ্রীবিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য, ১৯। শ্রীমুরেশচন্দ্র দাস, ২০। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ দাশ, ২১। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়, ২২। শ্রীললিতমোহন মূখোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীচিন্তরঞ্জন রায়, ২৪। শ্রীমানিকলাল সিংহ।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৬০ বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা

মুদ্রিত

১। চণ্ডীদাস সমগ্র	—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ	...	৩৩
২। কবীর ও পূর্বভারতীয় সাধনা	—শ্রীকৃষ্ণকব চট্টোপাধ্যায়	...	৫২
৩। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসন্মত কাব্য	—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়	...	৬১
৪। মুহম্মদ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত	সকল শ্রীশুভেন্দু সিংহ রায় ও শ্রীশিবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৭৭
৫। গোড়ীয় সমাজ (প্রতিবাদ)	—শ্রীপ্রবোধকুমার দাস	...	৮২
৬। " (উত্তর)	—শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র বাগল	...	৯১
৭। সত্যাপতির ভাষণ		...	৯৫
৮। উনষষ্ঠিতম বার্ষিক কার্যবিবরণ		...	৯৭



পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রদত্ত বহুসম্মানিত ১৯৫১-৫২

ব্রজীন্দ্র-স্মারক-পুরস্কারপ্রাপ্ত

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী :

সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম-২য় খণ্ড : মূল্য ১০/- + ১২/-

সেকালের বাংলা সংবাদপত্রে (১৮১৮-৪০) বাঙ্গালী-জীবন

সম্বন্ধে যে-সকল অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়, তাহারই সংকলন।

বঙ্গীয় নাট্যাঙ্গণালার ইতিহাস : (৩য় সংস্করণ) ৪/-

১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশের

সংখ্যক ও সাধারণ মঙ্গলয়ের প্রামাণ্য ইতিহাস।

বাংলা সাময়িক-পত্র : ১ম-২য় ভাগ ৫/- + ২/-

১৮১৮ সালে বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্মাবধি বর্তমান

শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সকল সাময়িক-পত্রের পরিচয়।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ১ম-৮ম খণ্ড (৯০খানি পুস্তক) ৪৫/-

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সাধক ইহার

উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের

১৯৫২-৫৩ ব্রজীন্দ্র-স্মারক-পুরস্কারপ্রাপ্ত

বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান (বঙ্গ নব্যজ্ঞান চর্চা) ১০/-

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

বিশ্বভারতী গবেষণা-গ্রন্থমালা

সম্প্রতি প্রকাশিত

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

চিঠিপত্রে সমাজচিত্র

দ্বিতীয় খণ্ড। মূল্য পনের টাকা

বিশ্বভারতী সংগ্রহ হইতে ৪৫০ এবং বিভিন্ন সংগ্রহের ১৮২ মোট ৬৩২ খানি পুরাতন (খ্রী ১৬০২-১৮৯২) চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজের সংকলন-গ্রন্থ। জন্ম, বিবাহ, প্রণয়পত্র, ঘরোয়া খুঁটিনাটি, ব্যাধি ও উৎপাত, শ্রাদ্ধ, শিক্ষা, ধর্ম, ব্যবসায়-বাণিজ্য, কৃষি, খাজনা, কর্ত্ত, দান, বিবাদ-বিসম্বাদ ইত্যাদি বিষয়ে আটটি প্রকরণে এই গ্রন্থ বিভক্ত হইয়াছে। পুরাতন বাঙালী-সমাজের নানা স্তরের মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার নিখুঁত আলোক্য এবং বাঙালীর সামাজিক ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপকরণ হিসাবে ইহা অকর-গ্রন্থ রূপে চিহ্নিত।

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

পুঁথি-পরিচয়

প্রথম খণ্ড। মূল্য দশ টাকা

বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথিশালার সংগৃহীত মোট ছয় হাজার পুঁথির মধ্যে পাঁচ শত পুঁথির আলোচনা। "বহুপ্রচলিত সাধারণ বইয়ের সাধারণ পুঁথির অনাবশ্যক বিবরণ লইয়া পৃষ্ঠা ভরতি করা হয় নাই। এই বই বিশেষজ্ঞ সমাজে ও সাধারণ সাহিত্যমোদী জনগণের কাছে যোগ্য সমাদর লাভ করিবে।"

—শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। 'যুগান্তর'

তত্ত্ব-পরিচয়

মূল্য দুই টাকা

বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথিশালার সংগৃহীত মোট ছয় হাজার পুঁথির মধ্যে পাঁচ শত পুঁথির আলোচনা। "বহুপ্রচলিত সাধারণ বইয়ের সাধারণ পুঁথির অনাবশ্যক বিবরণ লইয়া পৃষ্ঠা ভরতি করা হয় নাই। এই বই বিশেষজ্ঞ সমাজে ও সাধারণ সাহিত্যমোদী জনগণের কাছে যোগ্য সমাদর লাভ করিবে।"

শ্রীমুখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ

জৈমিনীয় ন্যায়মাল্যাবস্তরঃ

মূল্য সাড়ে পাঁচ টাকা

বিশ্বভারতীর বাংলা পুঁথিশালার সংগৃহীত মোট ছয় হাজার পুঁথির মধ্যে পাঁচ শত পুঁথির আলোচনা। "বহুপ্রচলিত সাধারণ বইয়ের সাধারণ পুঁথির অনাবশ্যক বিবরণ লইয়া পৃষ্ঠা ভরতি করা হয় নাই। এই বই বিশেষজ্ঞ সমাজে ও সাধারণ সাহিত্যমোদী জনগণের কাছে যোগ্য সমাদর লাভ করিবে।"

পূর্বপ্রকাশিত

শ্রীক্ষিতমোহন সেনশাস্ত্রী

প্রাচীন ভারতে নারী

জাতিভেদ

শ্রীমুক্তিকুমার মুখোপাধ্যায়

শাস্ত্রদেবের বোধিচর্যাবতার

মৈত্রাসাধনা

শ্রীমুখময় শাস্ত্রী সপ্ততীর্থ

মহাভারতের সমাজ

মামাংস-দর্শন

মিতাক্ষরা : দায়ভাগ

শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল

গোর্থ-বিজয়

শ্রীঅমিয়কুমার সেন

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ

১০.

১.

৩.

৫.

২১০.

১০.

বিশ্বভারতী গবেষণা-গ্রন্থমালার ইংরেজি পুস্তকের তালিকা পত্র লিখিলে পাঠানো হইবে।

বিশ্বভারতী

৬৩ স্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৬০ বর্ষ, ২য় সংখ্যা

১৩৬০

চণ্ডীদাস সমস্রা

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

চণ্ডীদাসের নাম মধ্যযুগের বাংলা কবিদের মধ্যে অতি প্রসিদ্ধ। এক দিকে তাঁহার পদাবলীর অল্পম রসৈবর্ষ্য, অল্প দিকে শ্রীচৈতন্যদেব কর্তৃক তাঁহার পদমাধুর্য্য আবাদন তাঁহাকে অনগ্রসর করিয়াছিল।) ‘সই, কে বা স্তনাইল জ্ঞাননাম,’ ‘এ ঘোর রজনী মেঘের ঘটা,’ ‘ঘরের বাহিরে দণ্ডে শত বার’ প্রভৃতি পদগুলি কাহার না হৃদয়তন্ত্রীতে ভাবের রনরনি স্রষ্টি করে? পরলোকগত বসন্তরঞ্জন রায় বিধবল্লভ বীরভূমের এক গৃহস্থের গোয়াল-ঘর হইতে রাধাকৃষ্ণের পদাবলীর এক প্রাচীন পুথি আবিষ্কার করিয়া চণ্ডীদাসের রসজ পাঠক-সমাজে এক গগুনগোলের স্রষ্টি করেন। পুথির সঙ্গে রক্ষিত একটি আলগা কাগজের লেখা-বোধ হয়, পুথিখানি বিষ্ণুপুরের রাজাদের গ্রন্থাগারে ছিল এবং তাহার নাম ছিল শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ। কিন্তু বসন্তবাবু পুথি সম্পাদনকালে তাহার নামকরণ করিলেন শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন (১৩২৩ সালে)। তাহাতে বড় চণ্ডীদাসের কথা শুধু চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। কিন্তু চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত কোনও পদ তাহাতে নাই। প্রশ্ন উঠিল, তবে কি চণ্ডীদাস ছই জন?

বোধ হয়, ১৩৩২ সালে বীরভূম-সাহিত্য-সম্মেলনে চণ্ডীদাসের পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের আলোচনার অল্প নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে লইয়া একটি কমিটি গঠিত হয়। ১। মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী—সভাপতি। ২। রায় শ্রীব্রজ বোগেশচন্দ্র রায় বাহাদুর বিভানিধি, ৩। পণ্ডিত শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, ৪। ডাঃ শ্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ৫। পণ্ডিত শ্রীবসন্তরঞ্জন রায় বিধবল্লভ, ৬। পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৭। এই প্রবন্ধলেখক।—(প্রবাসী ১৩৩৩, পৃঃ ৫১২)। কিন্তু ইহার কোনও অধিবেশন হইয়াছিল কি না, তাহা আমার জানা নাই। কেন না, ইহার পর ছই বৎসর আমি প্যারিসে ছিলাম। তাহার পর শ্রীমণীন্দ্রমোহন বসু নীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত করিলেন (১৩৪১ সাল)। তখন চণ্ডীদাস যে একাধিক, ইহা অনেকের বিশ্বাস হইল। বাংলা ১৩৪৫ সালে কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মেলনের এক অধিবেশন হয়। শ্রীমতী অপর্ণা দেবী তাহার পদাবলী-শাখার সভানেত্রী ছিলেন। সেখানে ডক্টর শ্রীহনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রায় শ্রীধরেন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর, পণ্ডিত শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ৮। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ৯। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিশেষজ্ঞগণ চণ্ডীদাস সমস্রা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। আমার আলোচনাটি কলিকাতার একখানি দৈনিক পত্রিকায় বিস্তৃতভাবে প্রকাশিত (reported) হইয়াছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনও কোনও প্রাচীনপন্থী লোকের মনে চণ্ডীদাসের একত্ব একরূপ অল্প সংস্কারের দ্বারা বহুমূল হইয়া আছে।

১৩৪৩
১৩৪৩

চণ্ডীদাস সমাজ সমাধানের জন্য বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আমাদের একমাত্র ভিত্তি। আমি ১৩৪৩ সালের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লেখাইয়াছি যে, (১) বড় চণ্ডীদাসের ভণিতার কয়েকটি বিশেষত্ব আছে; তাহার মধ্যে (ক) কোনও স্থানে “বিজ্ঞ” চণ্ডীদাস বা “দীন” চণ্ডীদাস নাই। (খ) সর্বত্র “গাঞ” বা গাইল আছে; কোথাও “ভণে,” “কহে” প্রভৃতি ক্রিয়াপদ নাই। (গ) ভণিতা কখনও উপাস্ত চরণে হয় না। (২) বড় চণ্ডীদাস শ্রীমতী রাধিকার পিতামাতার নাম সাগর ও পদ্ম বা বলিয়াছেন। (৩) বড় চণ্ডীদাস রাধার কোনও সখী বা শান্তী ননদের নাম উল্লেখ করেন নাই। তিনি “কড়ারি” ভিন্ন কোনও সখীকে সম্বোধনও করেন নাই। (৪) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধার নামান্তর চণ্ডাবলী, প্রতিমায়িকা নহেন। (৫) বড় চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণের কোনও সখার নাম উল্লেখ করেন নাই। (৬) বড় চণ্ডীদাস সর্বত্র প্রেম অর্থে “নেহ” বা “নেহা” ব্যবহার করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কেবল চারি স্থলে “পিরিতী” শব্দের প্রয়োগ আছে, কিন্তু তাহার অর্থ প্রীতি বা সন্তোষ। (৭) বড় চণ্ডীদাস কুজাপি শ্রীমতী রাধিকার বিশেষণে “বিনোদিনী” এবং শ্রীকৃষ্ণ অর্থে “শ্রাম” ব্যবহার করেন নাই। (৮) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধিকা গোয়ালিনী মাত্র, রাজকন্যা নহেন। (৯) অধিকতর বড় চণ্ডীদাসের নিকট ব্রজবুলি অপরিচিত। এইগুলির কষ্টি-পরীক্ষায় চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত অনেক পদ যে বড় চণ্ডীদাস ভিন্ন অন্য চণ্ডীদাসের, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি। প্রথমে পদকল্পতরু (৮ম শতাব্দীর রায়-সম্পাদিত) ধরিতেছি।

৮৫১ নং পদের আরম্ভ :—বিধির বিধানে হামি আনল ভেজাই।

যদি সে পরাণ বন্ধুর তার লাগি পাই ॥

ইহার ভণিতার পদ— বাঙলী আদেশে বিজ চণ্ডীদাস ভণে।

ভোমার বন্ধু ভোমার আছে গালি পাড়িছ কেনে ॥

এই ভণিতা বড় চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। তাহার কারণ, (১) বিজ শব্দের প্রয়োগ, (২) বড় চণ্ডীদাস কখনও ভণিতায় “বাঙলী আদেশে” বা “ভণে” ব্যবহার করেন নাই। (৩) এই ভণিতা উপাস্ত চরণে, যাহা বড় চণ্ডীদাসের প্রয়োগবিরুদ্ধ। বিজ চণ্ডীদাস বহু ভণিতায় উপাস্ত বা অন্ত্য চরণে “বাঙলী আদেশে” ব্যবহার করিয়াছেন। আমি শ্রীশ্রীপদ-কল্পতরু হইতে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

৮০৫ নং পদ : আরম্ভ—কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান।

ভণিতা— বাঙলী আদেশে বিজ চণ্ডীদাসে কর।

পরের লাগিয়া কি আপনা পর হয় ॥

৮৬২ নং পদ : আরম্ভ—ছার দেশে বসতি হইল নাহিক দোসর জন।

ভণিতা— বাঙলী আদেশে বিজ চণ্ডীদাসের দ্বিত।

আপনা আপনি চিত করহ সম্বিত ॥

৯১৮ নং পদ : আরম্ভ—এ দেশে বসতি নাই বাব কোন দেশে।

ভণিতা— বিষ খাইলে দেহ যাবে রব রবে দেশে ।

বাঙলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ॥

৯২৫ নং পদের ভণিতাও— বাঙলী আদেশে কহে দ্বিজ চণ্ডীদাসে ।

ভণিতার কেবল চণ্ডীদাস থাকিলেও “বাঙলী আদেশে” এই বাক্যাংশ দ্বারা আমরা বুঝিব, পদটি দ্বিজ চণ্ডীদাসের, বড়ু চণ্ডীদাসের নহে। এইরূপ কয়েকটি পদ নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

২০৪ নং পদ, আরম্ভ— কনক বরণ কিয়ে মরণ

নিছনি দিয়ে সে তার ।

ভণিতা—

কহে চণ্ডীদাসে বাঙলী আদেশে

হেরিয়া নখের কোণে ।

জনম সফলে যমুনার কূলে

মিলাইল কোন জনে ॥

২১০ নং পদ : আরম্ভ— সজনি—ও বনি কে কহ বটে ।

ভণিতা— কহে চণ্ডীদাসে বাঙলী আদেশে

তনু ছে নাগর চান্দা ।

সে যে বুঝাছু রাজার নন্দিনী

নাম বিনোদিনী রাধা ॥

এই পদে “সুবল সাক্ষাতি, বুঝাছু রাজার নন্দিনী” এবং “বিনোদিনী রাধা” আছে। এই প্রয়োগগুলি দ্বারা স্পষ্টচিত্ত ভাবে বলা যাইতে পারে যে, এই পদ কিছুতেই বড়ু চণ্ডীদাসের হইতে পারে না।

৫৫৩ নং পদ ; আরম্ভ— একদিন বর- নাগর-শেখর

কদম্বতরুর তলে ।

বুঝাছুসুতে সখীগণ সাথে

যাইতে যমুনাজলে ।

ভণিতা—

কহে চণ্ডীদাসে বাঙলী আদেশে

তনু ল রাজার যিয়ে ।

তোমা অম্লগত বজুর সঙ্কেত

না ছাড়্য আপন হিরে ॥

৭৭৩ নং পদ ; আরম্ভ— তনু সহচরি না কর চাকুরী

সহজে দেহ উত্তর ।

কি আতি মুরতি কাছুর পিরিতি
 কোথাই তাহার ঘর ॥
 ভণিতা— কহে চণ্ডীদাসে বাঙালী আদেশে
 ছাড়িবে কি কর আশ ।
 পিরিতি নগরে বসতি কর্যাছ
 পর্যাছ পিরিতি বাস ॥

এই পদে ভণিতার অতিরিক্ত “পিরিতি” শব্দের প্রথম অর্থে প্রয়োগ এবং “কর্যাছ,” “পর্যাছ” আধুনিক ক্রিয়ারূপ আমাদের কাছে নিঃসন্দেহভাবে আনাইয়া দেয় যে, পদটি বড় চণ্ডীদাসের নহে। আমাদের পূর্বোক্ত কষ্টি-পরীক্ষক দ্বারা বৃষ্টিতে পারি; কোন পদ বড় চণ্ডীদাসের, কোন পদ অন্তের। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি :—

১৪৩ নং পদ, আরম্ভ— হাম সে অবলা হৃদয়ে অখলা
 ভাল মন্দ নাহি জানি ।
 ভণিতা— কহে চণ্ডীদাসে শ্রাম-নব-রসে
 ঠেকিলা রাজার বি ॥

এই পদে বিশাখা সখীর উল্লেখ আছে এবং রাধিকাকে রাজার বি বলা হইয়াছে। ইহা বড় চণ্ডীদাসের হইতে পারে না।

১৪১ নং পদ, আরম্ভ— দেয়াসিনী বেশে মহলে প্রবেশে
 রাধিকা লখিবার ভরে ।
 ভণিতা, অন্ত্য চরণে— চণ্ডীদাসে কয় সুবুদ্ধি সে হয়
 বেকত না করে কাজে ।

এই পদে রাধার নন্দ কুটিলা, শান্তড়ী জটিলা এবং রাধাকে ভাহুত্বতা বলা হইয়াছে। সুতরাং পদটি বড় চণ্ডীদাসের নয়।

১৩৫ নং পদ, আরম্ভ— কালিয়া বরণ হিরণ পিঙ্কন
 বধন পড়য়ে মনে ।

উপাস্ত চরণে ভণিতা— কহে চণ্ডীদাসে আন উপদেশে
 কুলের বৈরী সে কালা ।

এই পদে ‘বৃষভানুত্বতা’ আছে। ইহার ভণিতাও বড় চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। ✓

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বাহিরে কোনও পদে বড় চণ্ডীদাস ভণিতা থাকিলেও, তাহাকেও কষ্টি-পরীক্ষা করিতে হইবে। আমি শ্রীশ্রীপদকল্পতরু হইতে কয়েকটি জাল বড় চণ্ডীদাসের পদ দেখাইতেছি ।

২৮২ নং পদ, আরম্ভ— বজুর লাগিয়া শেখ বিহারলু
 দাঁখিলু কুলের মালা ।

ভণিতা, অস্ত্য চরণে—

রস-শিরোমণি আসিব আপনি

বড় চণ্ডীদাসে ভণে ॥

“ভণে” শব্দ দ্বারা বুঝাইবে যে, ইহা জ্ঞান পদ। “গাএ” শব্দ বসাইলে পূর্বের চরণের সহিত মিল রক্ষা হয় না।

৩০১ নং পদ, আরম্ভ—

সে যে বৃষভাছত্বতা।

ভণিতা—

শ্রাম বজুর পাশ।

চম্বু বড় চণ্ডীদাস ॥

এই পদের ভণিতা এবং “বৃষভাছত্বতা,” “শ্রাম” শব্দের প্রয়োগ জ্ঞান পদ বলিয়া ধরাইয়া দেয়।

৩৭৫ নং পদ, আরম্ভ—

স্তনহ রাজার কী।

লোকে না বলিবে কী ॥

ভণিতা—

উলট করাস মান।

বড় চণ্ডীদাসে গান ॥

এখানে রাধাকে রাজার কী বলা হইয়াছে। ভণিতায় “গান” শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষায় “গান্ধি” হইবে, তাহাতে ছন্দ থাকে না। স্ততরাং ইহা জ্ঞান।

আমি এক্ষণে ৬নীলরতন মুখোপাধ্যায়ের “চণ্ডীদাসের পদাবলী” হইতে কয়েকটি পদ দেখাইব, বাহা আমাদের পূর্বোক্ত কষ্টি-পরীক্ষায় অল্প চণ্ডীদাসের পদ বলিয়া প্রমাণিত হয়।

২৫ নং পদ, আরম্ভ—

রাই কহে তবে কৃন্তিকার আগে

এ কি এ দেখিতে দেখি।

কহেন জননী, স্তন বিনোদিনী

বাজিকর উহ পেখি ॥

ভণিতা—

অবধান কর বৃকভাছ রাজা

খেলাতে করহ মন।

চণ্ডীদাস কহে রাজার গোচরে

খেলায় সে পঞ্চজন।

এই পদে রাধিকার মাতাপিতার নাম কৃন্তিকা ও বৃকভাছ রাজা (পুরাণের কীর্তিনা ও বৃষভাছ), এবং “বিনোদিনী” শব্দের প্রয়োগ প্রমাণ করিতেছে যে, ইহা বড় চণ্ডীদাসের নহে। “বাজিকর” (পারশী বাজীগর) শব্দ ইহাকে চৈতন্য-পরবর্তী যুগের রচনা বলিয়া নির্দিষ্ট করিতেছে। এইরূপ ৩২ নং পদের আরম্ভ—

ঝরকা উপরে কৃন্তিকা স্তম্বরী

তা সনে স্তম্বরী রাধা।

ভণিতা, অস্ত্য চরণ—

এ বোল বলিয়া পড়িল চলিয়া

বিজ্ঞ চণ্ডীদাস ভণে।

এই পদ বড় চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। এইরূপ ৩০, ৩৪ প্রভৃতি যে সমস্ত পদে রাধা-জননী কৃত্তিকার উল্লেখ আছে, তাহা অল্প চণ্ডীদাসের।

২১৮ নং পদ, আরম্ভ—

চন্দ্রাবলি, আজি ছাড়ি দেহ মোরে।

শ্রীদাম ডাকিছে যাব তার কাছে

এই নিবেদন তোরে ॥

এই পদে “চন্দ্রাবলী” (রাধিকার প্রতিনারিকা) এবং “শ্রীদাম” প্রয়োগ বড় চণ্ডীদাসের বিরুদ্ধে। এইরূপ ২২০, ২৪১ক প্রভৃতি যে সমস্ত পদে রাধিকার প্রতিনারিকা চন্দ্রাবলী কিংবা কোনও সখীর নাম অথবা কৃত্তিকের কোন সখার নাম আছে, সেগুলি বড় চণ্ডীদাসের হইতে পারে না।

ব্রজবুলি পদ সম্বন্ধে ৮সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন,—“চণ্ডীদাসের পদাবলীর স্থানে স্থানে আরবি, ফারসী ও মৈথিলি শব্দ থাকিলেও তিনি কোনও স্থলে মৈথিলি কারক-বিশজ্ঞ কিংবা ক্রিয়া-বিশজ্ঞের ব্যবহার করেন নাই; সুতরাং তাঁহার পদ যে খাঁটি বাঙ্গলার পদ, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না।”—(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩২০, ৯৬ পৃঃ)। ইহাতে তিনি নিম্নলিখিত পদটিকে কৃত্রিম পদ বলিয়াছেন।

১০১ পদ, আরম্ভ,—

মন শ্রাম—শরীর কেলি রস

বমুনাক তীর বিহার বনি।

শ্রীদাম স্নান্য ভায়া বলরাম

সঙ্গে বহুরাম রলে কিছিনি ॥

• ভণিতা, শেষ চরণে—

চণ্ডীদাস মনে অভিলাস

স্বরূপ অন্তরে আগি রহে ॥

কৃত্তিকের সখাদের নামোল্লেখ এবং ভণিতার কষ্ট-পরীক্ষায় আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি, ইহা বড় চণ্ডীদাসের পদ নহে।

✓ যেমন আমরা বড় চণ্ডীদাস এবং দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা পাইয়াছি, সেইরূপ দীন চণ্ডীদাসেরও ভণিতা আমরা পাই। মণীন্দ্রবাবু দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী সম্পাদন করিয়াছেন। শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে দীন চণ্ডীদাসের কোনও ভণিতা দেখা যায় না। কিন্তু দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতাযুক্ত ১২২২ পদটি দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীতে আছে। নীলরতন-বাবুর সংগ্রহে অবশ্য দ্বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতা আছে। এই ১২২২ নং পদে একটি শব্দ আছে বেশালি, তাহা পর্তুগীজ vasilha হইতে উৎপন্ন। দীন চণ্ডীদাসের কোনও পদে বাসলীর নাম গন্ধ নাই। এখানে প্রশ্ন উঠে, চণ্ডীদাস কত জন? আমরা দেখাইব, চণ্ডীদাস ৩ জন,—বড় চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস এবং দীন চণ্ডীদাস।

অবশ্য বড়ু চণ্ডীদাস এবং বিজ্ঞ চণ্ডীদাস নামে কিংবা শুধু চণ্ডীদাস নামে অনেকগুলি জাল পদও আছে। আমরা এই সমস্ত জালিয়াত কবির কোন সম্মান-জানি না।

প্রথমে আমরা বড়ু চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করিব। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার ব্যাকরণে এমন কতকগুলি প্রাচীনব্দের লক্ষণ আছে, যাহা মধ্যযুগের কোনও কাব্যে পাওয়া যায় না। এই বিশেষব্দের মধ্যে উত্তম পুরুষের একবচন ও বহুবচনের ছই পৃথক্ রূপ, যেমন একবচনে মোঞ (মোঞ, মোঞে, মোঞে) চলোঁ, চলিলোঁ, চলিবোঁ, চলিতোঁ; বহুবচনে আশ্বে (আশ্বি) চলি (চলিএ), চলিল, চলিব, চলিত। উত্তম পুরুষের অল্পজ্ঞায় চলিউ (চলিউ)। চলিলাহোঁ, চলিরাহোঁ, চলিতাহোঁ উত্তম পুরুষের রূপগুলি। জীলদ কর্তার অকর্মক জিম্মার অতীত কালে জী প্রত্যয়, যথা; রাহী গেলী, বড়ারি চলিলী। ইহাতে -দেব, -দিগের, -দিগকে বিভক্তি এবং করণ কারকে “ঞে” বিভক্তির প্রয়োগ নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সাত স্থানে আমরা বড়ু চণ্ডীদাসের এক বিশেষ ভণিতা দেখি—

আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাঞ (৮৮ সং, পৃ: ২২২)

অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল (ঐ, ২৪১২)

গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে (ঐ, ২৪১১)

অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গারিল (ঐ, ৮৪১১)

আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে (ঐ, ১২৭১২)

গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে (ঐ, ১৩৩১১)

অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে (ঐ, ১৩৪১২)

এই সকল ভণিতা হইতে বুঝিতে পারি, কবির প্রকৃত নাম অনন্ত, তাঁহার কৌলিক উপাধি বড়ু এবং চণ্ডীদাস তাঁহার দীক্ষাগ্রহণান্তর গুরুদত্ত নাম।

তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে গীতগোবিন্দের কয়েকটি পদের অম্বুবাদ করিয়াছেন এবং অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই শ্লোকগুলি যে তাঁহার রচনা, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহাতে মনে করিতে পারি যে, তিনি সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আমরা পাই (৮৮ সং, পৃ: ১৪১, ১৪২) —

আহোনিশি যোগ ধৈর্য। মন পবন গগনে রহাই ॥

মূল কমলে করিলে মধুপান। এবে পাইঞা আশ্বে ব্রজগেআন ॥

দূর আত্মসর অঙ্গরি রাহী। মিছা লোভ কর পারিতোঁ কাহ্নাকি ॥

ইড়া পিজলা অসমনা সঙ্কী। মন পবন তাঁত কৈল বন্দী ॥

দশমী ছম্বারে দিলোঁ কপাট। এবে চড়িলোঁ মো সে যোগবাট ॥✓

ইহাতে মন পবন, মূল কমল, ইড়া পিজলা অঙ্গুরী, দশমী ছম্বার—পারিতোঁ কপাট হঠাৎযোগে এবং সহজভাবে প্রচলিত। ইহাতে মনে হয় যে, বড়ু চণ্ডীদাস সহজিয়া ছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতম লিপির কাল ৮রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে “১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে লিখিত হইরাছিল।”—

(শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকা)। কিন্তু এখানে “মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ” ঘটয়াছে। তিনি শূদ্র-পদ্ধতির অক্ষরের তুলনায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অক্ষর প্রাচীনতম বলিয়া উহার লিপিকাল স্ফুটতঃ ১৪৪২ শকাব্দকে বিক্রমাব্দ মনে করিয়া ১৩৮৫।৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল স্থির করিয়াছেন। বস্তুতঃ শূদ্রপদ্ধতির লিপিকাল ১৪৪২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দ। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এই ভুল ধরিয়া দিয়াছেন। (সা-প-প, ১৩২৬, পৃ ৮২)। রাখালবাবুর তুলনায় অল্প পুস্তক বোধিচর্যাবতার; ইহার লিপিকাল ১৪৯২ বিক্রমাব্দ অর্থাৎ ১৪৩৬।৩৭ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং তাঁহার বলা উচিত ছিল যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বা মোটামুটি ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। মেদিনীপুর হইতে প্রাপ্ত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত বিষ্ণুপূর্ণাঙ্গের অক্ষরের সহিত তুলনা করিয়া ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য্যী অস্বীকার করেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথি ১৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে লিখিত হইয়াছিল এবং ডক্টর শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক মনে করেন যে, ইহা ১৪৫০—১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল।—(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—১৩৪২, ২২ পৃঃ)। শ্রীকৃষ্ণ যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে ইহা “১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। বরং পরে, পূর্বে নয়।”—(ঐ, ২৪ পৃঃ)। ডক্টর শ্রীকুমার সেন ১৬২২ খ্রীঃ অব্দে লিখিত সীত-গোবিন্দের পুঁথির সহিত তুলনা করিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্তী বলেন (বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৬৫ পৃঃ)। এই সমস্ত বিভিন্ন তারিখ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, ১৪৩৬ হইতে ১৬২২ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত বাঙ্গলা অক্ষর প্রায় একরূপ ছিল এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রাচীনতম লিপি ইহার পূর্ববর্তী।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল বাহা হউক না কেন, ইহার পুঁথি বড় চণ্ডীদাসের সমসাময়িক হইতে পারে না। লিপিকর-প্রমাদ ও পাঠবিকৃতি প্রমাণিত করে যে, ইহা কবির রচনার বহু পরবর্তী। আমি চতুর্থ সংস্করণ হইতে উদ্ধারণ দিতেছি।

লিপিকর বহু স্থলে মূল্যের ন স্থানে ল পড়িয়াছে ও লিখিয়াছে। নহে (২৯), কাজনে (৩৭), নাগুন (ঐ), নীলাঞ (৪০), নবনীল দল (লবলীদল ৪৬), আশ্বখিনী (৫৩, ১৫৭), আশ্বাসিনী (ঐ ৯০), লাগিল (৫৭) তিনাঙ্গলী, (৭৩, ৮৯, ১৩৩, ১৫৫), তিন (৮৯), নেহানিলেঁ (১৩১), মৈনাক (১৪৬), দগধিনী (১৪৯), তরাসিনী (১৫০)।

কতিপয় স্থলে লিপিকর ভ্রমবশতঃ দোকর লিখিয়াছে।

কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুগায়িবো মো ॥

কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মোর ছুই তন। (৩৫ পৃঃ)

দ্বিতীয় লাইনে “শ্রীকল যোড়” এইরূপ কোন শব্দ ছিল।

হার নিল মোর ভাগিল বলয়া।

কুণ্ডল নিলেক আগর বলয়া। (৫৬ পৃঃ)

দধিতার লম্বা আদে জাইব বাটে বাটে।

মোর পানে চাহে যত লোক জাএ বাটে (—হাটে) ॥ (৭৩ পৃঃ)

লিপিকর কতিপয় স্থলে কয়েকটি চরণ ছাড়িয়া দিয়াছে।

“দধির পসার নাএ চড়াহ আসিয়া” (৬২ পৃ:), ইহার পর লিপিকর “না জানিখাঁ তব চটিতে বৃহলোঁ নাএ”—এই চরণটি লিখিয়া কাটিয়া দিয়াছে। ভাষা হুটে আমরা ইহাকে মূলের অংশ মনে করিতে পারি। লিপিকর কতিপয় চরণ বাদ দিয়াছে, জানিবার উপায় নাই। তাল শিকার পুথির পদ (শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিশিষ্ট) হইতে আমরা কতিপয় স্থলে লিপিকরের বাদ দেওয়া অংশের পুনরুদ্ধার করিতে পারি।

“নহলী যৌবন রাখিবি কত কাল” (২৬ পৃ:), ইহার পর অবশ্য এই চরণগুলি ছিল—

চামরী জিনিঞা তোর চিকন কবরী ।
মালতীর মালা তাহে বেঢ়া সারি সারি ॥
অলকা তিলক কিবা তালের উপরে ।
সুরজ সিন্দুর বিন্দু তাহার মাঝারে ॥
বদন শরত চান্দ স্রবা হাসি ধরে ।
দশন কিরণে কত বিজুরি সঞ্চারে ॥
হৃদয়ে মুকুতা-হার অমূল্য রতন ।
তুল (কুল) কনয়া গিরি তোর দুই তন ॥

এই শেষের দুই চরণের পাঠান্তর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এইরূপ—

কোন বিশ্বকর্মে নির্মিল দুই তন ।
আছ যুবজনের বৃদ্ধের আশ্রয় মন ॥ (২৬ পৃ:)

“সব কলা সংপুনী তৌ রাহী ॥ জ ॥” (২৮ পৃ:), ইহার পর যে চরণগুলি ছিল, তাহা তালশিকার পুথি হইতে পুনরুদ্ধার করা যায় (জটব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পরিশিষ্ট, ১৬০, ১৬১ পৃ:)। আমরা আরও বুঝিতে পারি যে, পূর্বোক্ত পংক্তির পরে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে “তোর নাম চন্দ্রাবলী.....গাইল বড় চণ্ডীদাসে।” যে চরণগুলি আছে, তাহা একটি পুথক পদ। লিপিকর দুইটি পদে জোড়াতালি দিয়া একটি পদ করিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুথির পাঠবিকৃতির উদাহরণ আর একটি পদ হইতে দিব। “দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন হুন তৌ বসী” (১৩১ পৃ:), ইহার পাঠান্তর—(জটব্য চণ্ডীদাস-পদাবলী, সাহিত্য-পরিষৎপ্রদত্ত)।

প্রথম প্রহর নিশি সপন দেখি বসি
(নীলরতনবাবুর চণ্ডীদাসের পদাবলী, পদসংখ্যা ১১৬)
প্রথম প্রহর নিশি সপন বসী
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি)
প্রথম প্রহর নিশি সপন রাশি
(রমণীমোহন মল্লিকের চণ্ডীদাস)

এই কয়েকটি পাঠ তুলনা করিয়া আমরা বলিতে পারি যে, মূল পাঠ এইরূপ ছিল—

প্রথম পদ্যে নিম্নে সুসপন দেখি বসি।

এই পদ্যে— “লেপিখী তছু চন্দনে বুলিখী তবে বচনে
আড়বাশী বাএ মধুরে”

ইহার পাঠান্তর— অঙ্গে দেই চন্দন বলে নধর বনচ

আর বায় বাসি সুমধুর। (নীলরতন মুখোপাধ্যায়) •

অঙ্গে দেই চন্দন বোলে মধুর বচন

আরে বায় বাশী সুমধুর। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি)

অঙ্গে দেই চন্দন বোলে মধুর বচন

আর বাশী বায় সুমধুর। (রমণীমোহন মল্লিক)

এই পাঠগুলি তুলনা করিয়া মূল পাঠ আমরা এইরূপে পুনর্গঠিত করিতে পারি—

লেপিখী তছু চন্দনে বুলি মধুর বচনে

আড়বাশী বাএ মধুরে।

(“অঙ্গে দেই চন্দন” পাঠে ছন্দপতন হয়)।

এই পদ্যে— “ইসৎ বদন করী মন মোর নিল হরী”

ইহার পাঠান্তর— ইসত হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি

(নীলরতন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

সুতরাং মূল পাঠ এইরূপ ছিল—

ইসৎ হাসন করি মন মোর নিল হরি

এই পদ্যের ভণিতায়—গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে। দীর্ঘত্রিাদী তৃতীয় চরণে দশ অক্ষর থাকিবে। এই অক্ষ এই পাঠে ছন্দপতন হয়।

ইহার পাঠান্তর— রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।

(নীলরতন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)

রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে (রমণীমোহন)

ইহাতে মূল পাঠ দাঁড়াইবে—রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে।

এই পদ্যের পাঠান্তর আলোচনা করিয়া চণ্ডীদাস-পদাবলীর প্রণেয় মুখ্য-সম্পাদক ডক্টর শ্রীমুনিভিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে মন্তব্য করিয়াছেন, আমি তাহা সর্বভোক্তাবে স্বীকার করি।—“হুই এক হুলে কু-কী-বৃত পাঠ অপেক্ষা অন্ত পাঠগুলি অধিকতর সূত্র বলিয়া মনে হয়; ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে, কু-কী-র পুঁথি চণ্ডীদাসের সমসাময়িক নহে; ইহা অপেক্ষা প্রামাণিক অন্ত পুঁথি ছিল।” (চণ্ডীদাস-পদাবলী, ৪ পৃঃ)।

অতএব আমরা বলিতে চাই যে, অধিকাংশ লিপিতত্ত্ববিদের মতামুসারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপিকাল ১৫০০ খ্রীঃ দরিলে, বড়ু চণ্ডীদাস যে অন্ততঃ ইহার শত বৎসর পূর্বে বিজ্ঞান ছিলেন, এইরূপ অনুমান অসঙ্গত হইবে না। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ও বলেন,

“কু-কী-র পুরাতন শব্দ ও বিভক্তি প্রত্যয় লক্ষ্য করিলে কবিকে (১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দ অপেক্ষা) আরও পুরাতন মনে হয়। কিন্তু কবির দেশ স্বরণ করিলে উক্ত কাল (১৩৫০ খ্রীঃ অবঃ) অসম্ভব হয় না।”—(সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩৪২, ৩১ পৃঃ)।)

এই চণ্ডীদাস যে চৈতন্যদেবের পূর্বে ছিলেন, বৈষ্ণব সাহিত্য হইতে তাহা প্রমাণ করা যায়।) জয়ানন্দ নিশ (জন্ম ১৫০৫ খ্রীঃ অবঃ) তাঁহার শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে বলিয়াছেন—

“জয়দেব বিভাপতি আর চণ্ডীদাস।

শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ ॥”

সনাতন গোস্বামী (চৈতন্যদেবের শিষ্য) তাঁহার বৃহদবৈষ্ণবতোষিণী টীকায় (১০৩৩২৬) বলেন,—“কাব্যশব্দেন পরমবৈচিত্রী ভাসাং সূচিতাস্ত গীতগোবিন্দাদিপ্রসিদ্ধাঃ স্তবাঃ চণ্ডীদাসাদিশিত-দানখণ্ড-নৌকাখণ্ডাদিপ্রকারাস্ত জেয়াঃ”। ইহাতে গোস্বামী ঠাকুর কাব্য পর্যায়ে গীতগোবিন্দের সহিত চণ্ডীদাসের দানখণ্ড নৌকাখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন।—(শ্রীশ্রীপদকরত্নর ভূমিকা। ৮মভীশচন্দ্র রায়-সম্পাদিত, ২৫ পৃঃ)। বিজ বা দীন চণ্ডীদাসের ভূমিতায় নৌকাখণ্ড বা দানখণ্ডের কোনও পদ নাই।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (রচনা ১৫৮১ খ্রীঃ অবঃ) আমরা দেখিতে পাই—

বিভাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।

আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপ সহিত ॥ (আদি, পরিচ্ছেদ ১৩)

চণ্ডীদাস বিভাপতি রায়ের নাটক গীতি

কণীমুত শ্রীগীতগোবিন্দ।

স্বরূপ রামানন্দ মনে মহাপ্রভু রাজি দিনে

গায় স্তনে পরম আনন্দ। (মধ্য, পরিচ্ছেদ ২)

বিভাপতি চণ্ডীদাস শ্রীগীতগোবিন্দ।

এই তিন গীতে করে প্রভুর আনন্দ ॥ (ঐ, পরিচ্ছেদ ১০)

শ্রীকৃষ্ণ ষোড়শচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রসাদে আমরা এই বড়ু চণ্ডীদাসের কাল সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞানের পোষকতায় একটি প্রমাণ পাই। ছাতনার রাজবংশপরিচ্ছেদে আমরা পাই—

মাসাকি বিশিখ শকে হামির উত্তর লোকে

সামন্তের কস্তা দিয়া রাজ্য দিল দান।

তাহারি সৌভাগ্যক্রমে বাসলী সামন্তভূমে

শিলামুর্তি ধরিয়া হলেন অধিষ্ঠান ॥

পাণ্ডুল দলন হেতু ভবাক্ষি তরণে সেতু

রচে যবে চণ্ডীদাস রাধাকৃষ্ণলীলা।

বিভাপতি তদন্তরে গাইল মিথিলাপুরে

• হরিপ্রেম রসগীতি নাহি যার তুলা ॥

ব্রহ্ম কাল কর্ণ (কর্ম) অরি শকে সিংহাসনোপরি
বসে বীর হামির সে হামিরনন্দন ।

সংগ্রামে যবনে তাড়ি বজরাজ্য নিল কাড়ি
অভিষেক দিল তার জনৈক ব্রাহ্মণ ॥

(প্রবাসী ১৩৪৩, আষাঢ়, ৩৪১ পৃঃ)

মাসাকি বিশিষ্ট অর্থাৎ ১২৭৫ শকে বা ১৩৫৩ খ্রীষ্টাব্দে হামির উত্তর ছাতনার রাজা হন । তিনি ব্রহ্ম কাল কর্ণ (কর্ম) অরি অর্থাৎ ১৩২৬ শক বা ১৪০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । এই হামির উত্তরের রাজত্বকালে ছাতনার বড়ু চণ্ডীদাস বিজয়মান ছিলেন । বড়ু চণ্ডীদাস যে ছাতনার বাসলী দেবীর পূজক ছিলেন, তাহার অল্প প্রমাণ আছে । আমরা “চণ্ডীদাস” এই নাম এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়াইয়ের প্রতি রাধিকার উক্তি হইতে বুঝিতে পারি যে, তিনি চণ্ডীমূর্ত্তি বাসলীর ভক্ত ছিলেন ।

“বড় যতন করিআ চণ্ডীরে পূজা মানিআ

তবে তার পাইবে দরশনে ।” (শ্রীকৃষ্ণকীর্তন)

ছাতনার বাসলী চণ্ডীমূর্ত্তি । কিন্তু নাম্নুরের বাসলী সরস্বতীমূর্ত্তি ।

শ্রীবৃদ্ধ ষোগেশচন্দ্র রায় বিজ্ঞানিধি মহাশয়ের আবিষ্কৃত চণ্ডীদাসচরিতের বর্ণনায় যথেষ্ট ঐতিহাসিক কিংবদন্তী রহিয়াছে (সা. প. প. ১৩৪৪, পৃঃ ৩৩) । সুতরাং তাহার উপর নির্ভর করিয়া চণ্ডীদাস সম্পর্কে কিছু বলা যায় না । কিন্তু তাহাতে চণ্ডীদাসকে যে সেকন্দর শাহের (১৩৫৭—৯৩ খ্রীঃ) সমসাময়িক ও প্রিয়পাত্র বলা হইয়াছে, তাহা আমাদের প্রত্যাভিত চণ্ডীদাসের সময়ের সহিত খাপ খায়, সুতরাং আমরা তাহা গ্রহণ করিতে পারি । চণ্ডীদাস সম্বন্ধে একটি সুপ্রচলিত কবিতা আছে, তাহাও চণ্ডীদাসের কালের সহিত বেশ মিলে ।

“বিধুর নিকটে বসি নেত্র পঞ্চ বাণ ।

নবহঁ নবহঁ রস গীত পরিমাণ ॥

পরিচয় সঙ্কেত অঙ্কে লিখ্যা ।

আদি বিধের রস চণ্ডীদাস কিখ্যা ॥”)

(শ্রীগৌরপদভরঙ্গিণী, মুদ্রালকাস্তি ষোড়-সম্পাদিত, ভূমিকা ১৫৭ পৃঃ) ।

ইহা হইতে ১৩৫৫ শক বা ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায় । ইহা সম্ভবত তাঁহার মৃত্যুকাল । “নবহঁ নবহঁ রস” হইতে ১৯৬ পাওয়া যায় । ইহা তাঁহার রচিত পদসংখ্যা হইবে ।

ষোগেশবাবু চণ্ডীদাসচরিতের প্রমাণে বড়ু চণ্ডীদাসের জন্ম ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ ধরিয়াছেন (সা. প. প. ১৩৪২, পৃঃ ৩০) । কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, এই পুঁথি নির্ভরযোগ্য নহে । আমরা ১৩৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম এবং ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু অনুমান করিতে পারি ।

রায়ী ও চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে কিংবদন্তী আছে, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত বড়ু চণ্ডীদাসের পদ হইতে সত্য বলিয়া মনে হয় ।

সুন রজকিনী রামী ।
 ও ছুটি চরণ শীতল আনিয়া-
 শরণ লইছ আমি ॥
 তুমি বেদ-বাদিনী হরের পরণী
 তুমি সে নরনের তারা ।
 তোমার তখনে ত্রিসঙ্খা বাজনে
 তুমি সে গলার হারা ॥
 রজকিনী রূপ কিশোরী বলাপ
 কামগন্ধ নাহি তার ।
 রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম
 বড় চণ্ডীদাস পাএ ॥

(চণ্ডীদাসের পদাবলী, নীলরতন-সং, ৭৩২ পদ) ।

এই পদের ভিত্তি নিঃসন্দেহে বড় চণ্ডীদাসের । ইহার পরবর্তী পদ ইহার অল্পকরণে বিজ চণ্ডীদাসের রচিত । ✓

পরমশ্রদ্ধালাভ চন্দ্রীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে রামীর রচিত পাঁচটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন । তাহাতে চণ্ডীদাসের মৃত্যুবিবরণ আছে । চণ্ডীদাস রাজা গৌড়েশ্বরের দরবারে রামীর সহিত গান করিতে গিয়াছিলেন । গান শুনিয়া বাদশাহের বেগম তাঁহার প্রতি অমুরাগিনী হন এবং রাজাকে মনের কথা বলিয়া ফেলেন । ইহাতে রাজা রাগী ও চণ্ডীদাসকে বধনশূল দান করেন । দণ্ডটি ছিল অল্পত রকমের । হাতীর লিঠে অধোমুখে বাঁধিয়া শিকারী বাজপাখী (বৈরি-সকান) ছাড়িয়া দেওয়া হয় । রামী বলিতেছে—

স্তম্ভ কলেবর হইল অর্জব
 দারুণ সকান ঘাতে ।
 এ দুখ দেখিয়া বিদরএ হিরা
 অভাগিরে লেহ সাধে ॥
 কহেন রামিনী সুন গুণমণি
 আনিলাও তোমার রীতি ।
 বাঁধলি বচন করিলে লজ্বন
 সুনহ রসিক পতি ॥

আত্মজ্ঞাপক প্রমাণে এই পদগুলি সত্যই রামীর রচিত বলিয়া মনে হয় । ✓ একটি পদে বলা হইয়াছে—“রাজা হে অবনজাতি ।” ১৪৩৩ খ্রীঃ অঙ্গে গৌড়ের সিংহাসনে রাজা গণেশের পৌত্র শমসুন্দীন আহমদ আসীন ছিলেন (১৪৩১—৪২ খ্রীঃ অঃ) । চণ্ডীদাসের অনুগ্রাহক ছিলেন সিকন্দর শাহ, বাহার রাজধানী পাণ্ডুরা ছিল বলিয়া চণ্ডীদাসচরিতে উল্লিখিত

হইয়াছে। আর তাঁহার দণ্ডদাতা এই শমসুদ্দীন আহমদের রাজধানী ছিল গোড়। রাবীর পক্ষে তাঁহাকে রাজা গোড়েশ্বর বলা হইয়াছে।)

এই বড় চণ্ডীদাসের সহিত মিথিলার কবি বিজ্ঞাপতির সম্মিলন হইয়াছিল। আমরা পূর্বে যে ছাতনা রাজপরিচয় হইতে কবিতাংশ উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতে বিজ্ঞাপতিকে চণ্ডীদাসের সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। আমরা অন্তর্য দেখাইয়াছি যে, বিজ্ঞাপতি ১৩২০ হইতে ১৪২০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে বিজ্ঞমান ছিলেন। আমার প্রবন্ধ *The Date of Vidyapati, Indian Historical Quarterly, 1944, p. 211ff*। ইহাতে তিনি চণ্ডীদাস অপেক্ষা বয়সে আনুমানিক ২০ বৎসরের ছোট ছিলেন। ৮সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে বিজ্ঞাপতি ১৩৮০ হইতে ১৪৮০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে নর্ডমান ছিলেন এবং চণ্ডীদাসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল (শ্রীশ্রীপদকল্পতরুর ভূমিকা, পৃ: ১৬৬-১৬৭, ১৬৪, সা: প: পত্রিকা ১৩৩৭, পৃ: ৫৫)। শ্রীশ্রীপদকল্পতরুতে (২০৮৮-২১ পদ) বিজ্ঞাপতির সহিত চণ্ডীদাসের সাক্ষাতের রর্ণনা আছে। এই পদগুলি সম্বন্ধে তাবাতত্ববিদ জিয়াসর্দন সাহেব বলেন যে, প্রথম দুইটি সম্ভবতঃ বিজ্ঞাপতির রচিত এবং তাহাদের ভাষা সামান্য বিকৃত হইলেও মৈথিলী। শেষ দুইটি সম্ভবতঃ বিজ্ঞাপতির নকলকারী কোনও বাঙ্গালী লেখকের রচিত, তাহা কিছুতেই বিজ্ঞাপতির রচিত হইতে পারে না।* আমরা ২৩৮৮ নং পদে দেখি—

রূপ নরায়ন বিজয় নরায়ন

বৈষ্ণনাথ শিবসিংহ।

মীলন ভাবি চুহঁক কর বর্ণন

তলু পদ কমলক ভূম।

এই রূপনারায়ণ শিবসিংহ হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। শিবসিংহের পিতৃব্যপুত্র নরসিংহের পুত্র চন্দ্রসিংহের রূপনারায়ণ বিরুদ্ধ ছিল। বিজয়নারায়ণ নরসিংহের ভ্রাতা। বৈষ্ণনাথের উল্লেখ বিজ্ঞাপতির পদাবলীতে (সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ) তিন স্থানে (পৃ: ৫০৪, ৫০৯, ৫২০) পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ তিনি মিথিলার রাজবংশীয় কেহ হইবেন। ইহারা সকলেই সমসাময়িক এবং বিজ্ঞাপতির অন্তরঙ্গ হইতে পারেন (Vide *The Date of Vidyapati, I. H. Q., 1944, p. 216*)

এক্ষেপে আমরা বিজ্ঞ চণ্ডীদাস সম্বন্ধে আলোচনা করিব। বিজ্ঞ চণ্ডীদাসের আবিষ্কার উক্ত শ্রীকুমার সেনের কৃতিত্ব।) তিনি মনে করেন যে, “চণ্ডীদাসের জীবৎকাল ১৫২৫ খ্রীঃ

* “The first two may possibly be by Vidyapati, at least these are written in Maithili and only has been slightly altered in Bengali.....the last two are probably by some Bengali imitator of Vidyapati and could never have been written by our poet,” (Indian Antiquary, 1885, p. 198.)

অঙ্গের এ-দিকে হইবে না।”—(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৬৮ পৃঃ) সিস্কবতঃ চৈতন্তদেব বড় চণ্ডীদাসের স্তায় বিজ্ঞ চণ্ডীদাসেরও পদ আশ্বাদন করিতেন। এই বিজ্ঞ চণ্ডীদাসের দুইটি পদে চৈতন্তদেবের উল্লেখ দেখা যায়। ভগ্নাংশে একটি পদ প্রসিদ্ধ, যাহার আবৃত্ত—“আজু কে গো মুরলী বাজায়।” দ্বিতীয় পদটি সুরকুমার বাবু কৃষ্ণদাসের অবৈত কড়চাস্ত্রের একখানি পুথিতে পাইয়াছেন। এই পদের শেষ কয়েকটি চরণ এই—

“অনিলেও আপনি হরি শ্রীচৈতন্ত নাম ধরি

সঙ্গে লইয়া পারিষদগণ।

পরম দুর্লভ ভাবে—

এই মন্ত্র সন্তে পাবে

কহ দেখি কিসেরি কারণ ॥

কৈলে পূর্ণ অবতার

বীজ সিদ্ধ নহে কার,

এই হেতু নাম মন্ত্র সার।

আর না করিব ভেদ

ভক্তগণে অবিচ্ছেদ

কলিয়ুগে নামের প্রচার ॥

আসিবেন আপনি নাথ

(ভক্তগণ লইয়া সাথ)

নাম প্রেম করিবে স্থাপনে।

কহে বিজ্ঞ চণ্ডীদাস

সে চরণে মোর আশ

সর্ব ছাড়ি পশিল চরণে ॥” (ঐ, ২০২ পৃঃ)

✓সুরকুমার বাবু এই বিজ্ঞ চণ্ডীদাসকেই বড় চণ্ডীদাস বলিয়া মনে করিয়াছেন; কিন্তু আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি, ভাব ও ভাবা সর্বপ্রকারে বড় চণ্ডীদাস বিজ্ঞ চণ্ডীদাস হইতে পৃথক। তিনি এই বিজ্ঞ চণ্ডীদাসের সহিত এক বাঙ্গালী বিদ্বাপতির মিলন সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া স্থির করিয়াছেন) তিনি এই সম্বন্ধে যে পদগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার একটিতে আছে—

“বিদ্বাপতি কহে ভাবিছ কি,

চণ্ডীদাসে বলে রজক বি।

বিদ্বাপতি কহে হল্যে সে হর,

চণ্ডীদাসে তারে সাধকে কয়।

শিবসিংহ রূপনারায়ণ যে,

বিদ্বাপতি কবি লহিমা সে।

চণ্ডীদাস বাণী স্বরূপ সার,

সাধক সাধিতে নাহিক আর।

চণ্ডীদাসে কবিশেষণে বলে,

সুরধুনীতীরে বটের তলে।” (কোচবিহারদর্পণ, ১৩৫২, ৩১২ পৃঃ)

✓এই পদ হইতে বোঝা যাইতেছে, মিথিলারাজ শিবসিংহ রূপনারায়ণ, তাহার রাণী

লখিমা (লছিমা) এবং মৈথিল কবি বিভাপতির ঐতিহ্য লইয়া এই পদটি কোন মকল চণ্ডীদাসের রচনা করিয়া চালাইয়া দিয়াছে। সুতরাং এই পদ হইতে বিজ চণ্ডীদাসের সহিত বাঙ্গালী বিভাপতির সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না।

বড়ু চণ্ডীদাসের ঝার বিজ চণ্ডীদাসও বাসলী দেবীর সেবক ছিলেন। তাঁহার বহু তপিতার—“বাসলী আশ্রয়ে” এইরূপ বচন দেখা যায়। আমরা পূর্বে এইরূপ কয়েকটি পদের উল্লেখ করিয়াছি। আমরা কিংবদন্তীতে পাই যে, চণ্ডীদাস নাম্বরের বাসলী দেবীর পূজারী ছিলেন। তাহাতে মনে হয়, এই বিজ চণ্ডীদাসই নাম্বরের বাসলীর পূজক ছিলেন। সপ্তদশ শতকের এই সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বিজ চণ্ডীদাসের ভারানারী এক রজকী সঙ্গিনী ছিল।

তারাত্যরজকীসঙ্গী চণ্ডীদাসো বিজোদয়ঃ।

লখিমা নৃপতে: কভা সজ্জো বিভাপতিভূতঃ ॥

(সা. প. প. ১৩৪০, পৃ: ২৭)

সম্ভবতঃ এই তারাকে বড়ু চণ্ডীদাসের রামীর সহিত গোলযোগ করিয়া রামী বলা হইয়াছে কিংবা তারার নামান্তর রামী ছিল কিংবা তাঁহার পুরা নামটি ছিল রামতারা। কিন্তু ইহা অসম্ভব মাত্র, ইহার কোনও প্রমাণ নাই। ইহাও সম্ভব যে, বিজ চণ্ডীদাসের কোনও সাধন-সঙ্গিনীই ছিল না, কেবল বড়ু চণ্ডীদাসের সহিত গোলযোগে রামীকে তাঁহার সাধন-সঙ্গিনী করিয়া কেহ কয়েকটি পদ বিজ চণ্ডীদাসের নামে রচনা করিয়াছে। আমরা এইরূপ একটি পদের উল্লেখ ইতিপূর্বে করিয়াছি। চৈতন্য-ধর্মাপ্রিত একজন বৈষ্ণবের পক্ষে এই সাধন-সঙ্গিনী রাখা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়, কিন্তু সহজিয়ারা যেমন চৈতন্যদেব, রামানন্দ রায় প্রভৃতি মহাজনগণেরও সাধন-সঙ্গিনী সৃষ্টি করিয়াছে (সা. প. প. ১৩২৬ পৃ. ১৪৫), সেইরূপ এই বিজ চণ্ডীদাসেরও সাধনসঙ্গিনী গড়িয়াছে।

বিজ চণ্ডীদাসের একটি পদের তপিতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় যে, তিনি চৈতন্যশিষ্য রূপ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন।

চণ্ডীদাস বলে লাখে এক মিলে

জীবের লাগয়ে ধান্দা।

শ্রীকৃষ্ণ কল্পণা বাহায়ে হইরাছে

সেই সে সহজ বাহ্য ॥

(নীলরতন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীদাস, ৭৮২ নং পদ)

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আমরা মাত্র কয়েকটি আরবী পারসী শব্দ পাই—কামান (বহুক), ধরমুজা, গুলাল, বাকী, মজুর, মজুরিয়া, (লেখ)। কিন্তু বিজ চণ্ডীদাসের পদে আমরা অনেক আরবী-পারসীজাত শব্দের প্রয়োগ দেখি। আমি শ্রীশ্রীপদকল্পভর হইতে পদ-সংখ্যা সহ উদাহরণ দিতেছি—কারিগর (১৫৩, ৮২২), বণাল্যে, খুসি (১৯৮), দাগ (৩৯৪), দোকান (৬৪০), মহল (৬৩৭, ৬৪১, ৬৪৩), খুসি (৬৪২), তকল্লি (৬৪৪), বানাইয়া

দয়িরা (৮৮১); বিদায় (১৩০), বালিস, বদল (১৫১২)। ইহাতে বিজ চণ্ডীদাস যে বড় চণ্ডীদাস অপেক্ষা পরবর্তী সময়ের, তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।)

এখন দীন চণ্ডীদাসের কথা। মণীন্দ্রমোহন বসু মনে করেন, দীন চণ্ডীদাসের পদগুলিই বিজ চণ্ডীদাসের ভণিতায় চলিয়াছে। কিন্তু স্বয়ং মণীন্দ্রবাবু স্বীকার করেন যে, দীন চণ্ডীদাসের প্রামাণিক ভণিতাতে বাঙালীর কোনও উল্লেখ নাই। অধিকন্তু আমি বলিব; তাহাতে রজুকিনী, রামী বা নাহুরেরও উল্লেখ নাই। দীন চণ্ডীদাসের পদাবলীর ৩০২ নং পদের ভণিতা—

বাঙালী নিকটে

চণ্ডীদাস বটে

এমন কাহার কাজ।—(পদকল্পতরু, ৬৪৪ নং)

৩০৪ নং পদের ভণিতা—ধোবিনী সঙ্গতি চণ্ডীদাস সীতি রচিল আনন্দ বটে। (ত্রিপ্রপদ-কল্পতরু, ৬৪০ নং)। এই দুইটি পদ দীন চণ্ডীদাসের হইতে পারে না। মণীন্দ্রবাবুও এই দুইটি পদকে সন্দেহজনক মনে করিয়াছেন। আমরা এইরূপ অনেকগুলি পদ পাইয়াছি, যাহাতে বাঙালী, রজুকিনী (ধুবিনী), রামী বা নাহুরের উল্লেখ আছে; অথচ এই পদগুলি বড় চণ্ডীদাসেরও নয়। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, বড় চণ্ডীদাস ও দীন চণ্ডীদাসের অতিরিক্ত আর একজন পদকর্তা ছিলেন, যিনি চণ্ডীদাস বা বিজ চণ্ডীদাস, এই নামে পদ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা এইমাত্র দেখাইলাম যে, বিজ চণ্ডীদাস নামে বাঙালিক এক পদকর্তা ছিলেন। তবে ইহা সত্য যে, দীন ও বিজ চণ্ডীদাসের অনেক পদে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। দীন চণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণধাত্রী রচনা করিয়াছেন, যেমন বড় চণ্ডীদাস একটি ধারাবাহিক কৃষ্ণধামালী রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বিজ চণ্ডীদাস বিক্ষিপ্ত রচনা ভিন্ন কোন ধারাবাহিক কৃষ্ণসীলার বই রচনা করেন নাই। দীন ও বিজ চণ্ডীদাসের মধ্যে এই পার্থক্যও তাঁহাদের রচিত পদগুলির সম্বন্ধে একটি দিগ্‌দর্শনীর কার্য করিবে। আমরা শ্রীবৃক্স হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রসাদে এই দীন চণ্ডীদাসের পরিচয় পাইয়াছি (সা. প. প. ১৩৩৭, পৃ. ৪৮)। নরোত্তমবিলাসে নরোত্তম ঠাকুরের চণ্ডীদাস নামে এক শিষ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

জয় চণ্ডীদাস যে মণ্ডিত সর্বগুণে।

পাষাণী খণ্ডনে দক্ষ, দয়া অতি দীনে ॥

নরোত্তম ঠাকুরের প্রশংসায় দীন চণ্ডীদাসের একটি পদ আছে। তাহার ভণিতা—

নরোত্তম রে বাপ রে ডাকি ভাসিমণি পুন প্রভু আবির্ভাব।

দীন চণ্ডীদাস কহ কত দিনে পদবুগ হবে লাভ ॥

বড় চণ্ডীদাস ও বিজ চণ্ডীদাস, কেহই ব্রজবুলিতে পদ রচনা করেন নাই। কিন্তু দীন চণ্ডীদাস কতিপয় পদ ব্রজবুলিতে রচনা করেন। হরেকৃষ্ণবাবু প্রমাণ করিতে চাহেন যে, এই দীন চণ্ডীদাসের সহিত এক কবিরঞ্জন উপাধিধারী ছোট বিভাপতির সঙ্গিলন হইয়াছিল। এই কবিরঞ্জন শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি যে,

বড় চণ্ডীদাসের সহিত মৈথিল কবি বিজ্ঞাপতির সম্মিলন হইয়াছিল। হরেকৃষ্ণবাবুর মত প্রমাণে টিকিতে পারে না, আমরা তাহা দেখাইতেছি।

নরোত্তমচাঁকুরের কাল সম্বন্ধে ৬মুণালকান্তি ঘোষের মত এই যে, তিনি অল্পমান ১৫৬২ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন (শ্রীগৌরপদতরঙ্গিণী, ভূমিকা; ১২১, ১২২ পৃঃ)। ইহাতে তাঁহার শিষ্য দীন চণ্ডীদাসকে আমরা ১৭শ শতকের পূর্বে মনে করিতে পারি না। যশীন্দ্রবাবুও মনে করেন যে, “১৭০০ হইতে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।—(দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী, ২য় খণ্ড, ভূমিকা, পৃঃ ৩০৮)। আমরা দীন চণ্ডীদাসকে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের লোক মনে করিতে পারি। তাঁহার পদে পদ্যবৃত্ত শব্দজাত ‘বেসালি’ শব্দের ব্যবহারে তাঁহাকে সপ্তদশ শতকের পূর্বে ফেলা যায় না।

একপে আমরা কবিরঞ্জন বিজ্ঞাপতির সময় স্থর করিতে চেষ্টা করিব। জগদ্বন্ধু ভট্টের মতে তাঁহার ঊরু রঘুনন্দনচাঁকুরের জন্ম ১৪০২ শকে বা ১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৪৫৫ শকাব্দে বা ১৫০৩ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং কবিরঞ্জন ১৬শ শতকের মধ্যভাগের লোক। উক্তর শ্রীমুখ্যর সেন দৈবকীনন্দন সিংহ কবিশেখরকে এই কবিরঞ্জনের সহিত এক মনে করিয়াছেন (বাদলী সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড—২১২-২২১ পৃঃ)। বাজতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত কবিশেখরের একটি পদে নসরৎ সাহেব উল্লেখ পাওয়া যায়।

কবি শেখর ভনে অপকব রূপ দেখি।

রাএ নসরৎ সাহ ভজলি কমলমুখি ॥

(বাগতরঙ্গিণী, দরভাঙ্গা-রাজ প্রেস, পৃ. ৪৫)।

৬মুখীরচন্দ্র রায় ও শ্রীমতী অপর্ণা দেবী-সম্পাদিত কীৰ্ত্তনপদাবলীতে (১৫২ পৃঃ) এই পদের ভণিতায় কবিরঞ্জন আছে—

কবি রঞ্জন ভনে অশেষ অল্পমানি।

বায়ে নসরৎ সাহ ভুলল কমলা বাণী ॥

এই নসরৎ বা নসরত শাহ গোড়েশ্বর নাসীরুদ্দীন মুসরত শাহ (১৪১২-১৫০০ খ্রীঃ)।

• এই পদের আরও একটি ভণিতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৫তম সং পদে নিম্নলিখিতরূপে পাওয়া যায়—

বিজ্ঞাপতি ভানি

অশেষ অল্পমানি।

মুলতাম শাহ নসির মধুপ ভুলে কমল বাণী ॥

পদকল্পতরুর পদে (১০৭ নং) বিজ্ঞাপতির ভণিতা আছে। এই বিজ্ঞাপতি খাভালী। কবি শেখর ভণিতায় পাঠান্তরে কবি রঞ্জন আরও একটি পদে (শ্রীশ্রীপদকল্পতরু ৬১৮৯) পাওয়া যায়।

ইহাতেও এই কবিশেখর বা কবিরঞ্জন ভণিতার বাঙালী বিভাগপতিকে ১৬শ শতকের মধ্য-ভাগের পরে কেলিতে পারা যায় না। সুতরাং দীন চণ্ডীদাসের সহিত বাঙালী বিভাগপতির মিলন সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না।

(বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২০)। বাঙালী কবিশেখরের ভণিতা যে বিভাগপতি ছিল, তাহা সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণের বিভাগপতির পরাবলীর ৫৩৩ ও ৫৩৪ নং পদ দুইটি হইতে বুঝা যায়। উক্ত পদ স্পষ্টতঃ একই কবির রচিত, অথচ ৫৩৩ নং পদের ভণিতা কবিশেখর এবং ৫৩৪ নং পদে বিভাগপতি।

আমরা আর একটি পদ হইতে কবিরঞ্জন বিভাগপতি যে নসরৎ সাহেব সময়ে ছিলেন, তাহা জানিতে পারি। সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণের বিভাগপতির পরাবলীর ৪৪ নং পদের ভণিতা কীর্ত্তমানন্দে আছে—

নসীর শাহ জানে
মুকে হানল ময়ন বানে
চীরে জীব রহ পক্ষ গৌড়েসর
কবি বিভাগপতি জানে।

ইহার পাঠান্তর ৮মুদ্রীয়চন্দ্র দ্বারা এবং ক্রীমতী অপর্ণা দেবী-সম্পাদিত কীর্ত্তন-পরাবলীতে এইরূপ—

ইসক হাসনি মনে—
মুকে হানল ময়ন বানে।
চীর জীব রহ পক্ষ গৌড়েসর
কবি কবিরঞ্জন জানে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৬৪৮ নং পুথিতে ইহার পাঠান্তর—

সাহা হসেন জানে
জাকে হানল ময়ন বানে
চিরঞ্জীবী রহ পক্ষ গৌড়েসর
কবি বিভাগপতি জানে।

মূল পাঠ এইরূপ ছিল বলিয়া মনে হয়—

সাহা নসীর জানে
জাকে হানল ময়ন বানে
চীরে জীব রহ পক্ষ গৌড়েসর
কবিরঞ্জন জানে।

কবীর ও পূর্বভারতীয় সাধনা

শ্রীসুধাকর চট্টোপাধ্যায়

(১)

মধ্যযুগের সাধনার ইতিহাসে কবীরের নাম সোণার অক্ষরে লেখা। সারাজীবনব্যাপী অতিষ্ঠতাকে, উপলব্ধিকে, সত্যানুসন্ধিৎসাকে রূপ দিয়ে গেছেন কবীর তাঁর বচনে। বিজ্ঞাচর্চা যদি কাগজ কলমের জিনিষ হয়, তা হ'লে তিনি বিদ্বান্ ছিলেন না। 'কেন না, তিনি নিজেই জানিয়েছেন, 'মসী ও কাগজ তিনি ছোননি'। অথচ তাঁর বাণীর মাঝখানে স্থান পেয়েছে নাথ-সহজিয়া-বাউল-আউল-বৈষ্ণব-সুফী সম্প্রদায়ের অনেক কিছু। স্থান পেয়েছে সিদ্ধাচার্য্যদের সহজসাধনা, স্থান পেয়েছে উপনিষদের 'তৎ সন্মসি'। অনেক কিছুকে তিনি মনের মাঝখানে এনেছেন, কিন্তু গ্রহণ করেননি কোনওটি সম্পূর্ণতঃ। তাঁর বিজ্ঞোহের সুরে তরা বাণী জানিয়ে দিয়েছে যে, 'চৌরাশী সিদ্ধ,' 'নাথ মহিদ্ধর,' 'গোরখনাথ,' 'মহাদেব,' সবাই সেই মরণপথে চলেছে। মিথ্যা তাদের সাধনা। মিথ্যাই হিন্দু করছে হিন্দুরানী, আর মুসলমান করছে 'কোরবানী'। মনের মধ্যে রয়েছে 'প্রভু,' রয়েছে 'শ্রিয়তম'; তারই সন্ধানে মক্কা, মদিনা, কাশী, বারাণসী ছুটোছুটি কেন? মনের মানুষকে চিনে নাও, তবে মরার বাধন টুটবে। জীব ও পরমের মিলনসাধনাই কবীরের সাধনা। অল্প দিক হ'তে আবার কবীরের সাধনা মিলনের সাধনা। সে মিলন মানুষের সঙ্গে মানুষের, সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের, ভাষার সঙ্গে ভাষার। সকল সম্প্রদায়কে তিনি গ্রহণ করেছেন, আবার সব সাম্প্রদায়িকতাকে করেছেন বর্জন। বিশেষ ক'রে সুফী বা বৈষ্ণব ধর্ম জীব ও ঈশ্বরের মিলন-গান গেয়েছে, সিদ্ধাচার্য্যরা বলেছেন 'সহজ'-সাধনার কথা, আর নাথবোঙ্গীরা বোগসাধনার বিচিত্রতার দ্বারা সেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন। এ সকল কথাই কবীরের মধ্যে আছে। সকল সম্প্রদায়ের সত্যকে স্বীকার করেছেন, অসত্যকে করেছেন বর্জন।

কবীরের সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়নি। গত শতাব্দীর করাসী দেশের গাস-গা শুভ তাসী হ'তে এ যুগের বাংলা দেশের ক্ষিতিমোহন পর্যন্ত অনেকেই তাঁকে নিয়ে আলোচনা করেছেন। এ যুগের হিন্দুস্থানী পণ্ডিতদের মধ্যে পণ্ডিত রামচন্দ্র গুপ্ত, অযোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়, হজারীপ্রসাদ দিবেদী, ডাঃ গীতাধর দত্ত বরধুলা এবং ডাঃ রামকুমার বর্মী বিশেষ উল্লেখযোগ্য আলোচনা করেছেন সাহিত্যের দিক থেকে। সাহিত্য ও ভাষার দিক থেকে শ্রীমশুমদর দাস-এর আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর অতি উচ্চাঙ্গের ভাষাগত আলোচনা করেছেন ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ উদয়নারায়ণ তিহারী। নাথ-বৌদ্ধ-সিদ্ধাচার্য্যদের সঙ্গে সাধনার ও বাণীর দিক থেকে অপূর্ণ আলোচনা করেছেন ডাঃ প্রবোধ বাগচী ইংরাজীতে, এবং ডাঃ সুকুমার সেন বাংলাতে। এঁরা

সকলেই কবীরের অঙ্ককারাঙ্কর জীবন ও জীবনদর্শনের উপর, ভাব ও ভাবার উপর, চমৎকার আলোচনা করেছেন। তবু মনে হয়, এখনও বোধ হয় কবীর সম্বন্ধে আরও অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কারের অপেক্ষা রাখে। মনে হয়, কবীরের সঙ্গে বাংলা-বিহার অঞ্চলের নিবিড় যোগ ছিল, এই অঞ্চলের সাধনার ধারাটিই বাণীরূপ পেয়েছে কবীরে। শব্দের ভিতর সমুদ্রের কোলাহল শোনিবার মতই চেষ্টাটি করেছি। কবীরের ভিতর বাংলা-বিহারের সাধনার প্রাণস্পন্দনটুকু উপলব্ধি করার চেষ্টা এই প্রবন্ধে।

কবীরের সময়

কবীরের জন্মসময় নিয়ে পণ্ডিতে পণ্ডিতে মতানৈক্য আছে। ডাঃ হার্টার বলেন, ১৩৮০ খ্রিঃ অঃ, বেসকট ১৪৪০ খ্রিঃ অঃ, শ্রামসুন্দর দাস বলেন ১৩৯৯ খ্রিঃ অঃ, ডাঃ রামকুমার বর্মা বলেন ১৩৯৮ খ্রিঃ অঃ। মৃত্যুসময় নিয়ে মতানৈক্য বিশেষ নেই। অনেকেই নির্ভর করেছেন সেই শ্লোকের উপর, যেখানে বলা হয়েছে কবীরের মৃত্যুতিথি “সম্বৎ পঞ্চম্ব শো পছতরা” বা ১৫৭৫ বিক্রমসংবৎ অর্থাৎ ১৫১৮ খ্রিঃ অঃ।

কবীরের ধর্মমত

প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে কবীর নাথধর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা পেয়েছিলেন ‘গোরখনাথ’-এর কাছে, হুফীধর্মের দীক্ষাগুরু ‘শেখ তকী,’ আর বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান হয়েছিল রামানন্দের কাছ থেকে। এই প্রথম দুই জনের সঙ্গে কবীর যে মিলিত (বা অনুপ্রাণিত) হননি, তা নিয়ে অনেক পণ্ডিতই একমত। রামানন্দের নিকট দীক্ষা ও জ্ঞানলাভের বিবরণ অনেকেই বিশ্বাসযোগ্য মনে করেন না (যেমন শ্রামসুন্দর দাস : কবীর গ্রন্থাবলী : ভূমিকা)। অনেকে করেন। কিন্তু কবীরের কাব্য ধারা আলোচনা করেছেন, তাঁরা জানেন, নাথ-সম্প্রদায়ের গুরুদের কথা তিনি শ্রবণ করেছেন; কোথাও গ্রহণ করেছেন যোগসাধনার কথা। বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবও তাঁর উপর প্রচুর। তাই শ্রামসুন্দর দাস ‘কবীরগ্রন্থাবলী’ সম্পাদনা করে বলেছেন, “কবীর সারভঃ বৈষ্ণব ধর্ম।”—(ক-গ্রন্থাবলী : ভূমিকা : পৃষ্ঠা ১৭)। বৌদ্ধ-নাথ-সিদ্ধাচারেরা অনেকেই নালন্দায় ছিলেন, তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের মধ্যে সহজিয়া সাধনরীতি চলে চলে এসে কি কবীরে এসে ঠেকেছে? ‘চর্যাপদ’ বা ‘বৌদ্ধ-গান ও দোহা’র সঙ্গে কবীরের কি বিচিত্র মিল। এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে বিস্তর। ধারা দেখতে চান, তাঁরা দেখুন :—

(১) হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস : রামচন্দ্র গুপ্ত, (২) গোরখবানী : বরদ্বাল : ভূমিকা, (৩) হিন্দী সাহিত্য কা আলোচনাত্মক ইতিহাস : ডাঃ রামকুমার বর্মা, (৪) কবীর : পণ্ডিত হজারীপ্রসাদ দিবেদী, (৫) আর্লি মিডিয়াল মিডিসিজম এ্যাণ্ড কবীর : বিশ্বভারতী কোয়াটার্লি (ইং) মে-জুন, ১৯৪৫, (৬) চৌরাসী সিদ্ধ : সরস্বতী (হিন্দী), জুন, ১৯০৯ : রাহুল সাংকৃত্যায়ন, (৭) হিন্দী ভাষা ওর উসকা সাহিত্য

কা বিকাশ : হরি ঔধ, (৮) বালালা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড : ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন।) মোটামুটি অনেকেই বলেছেন যে, কবীরের মধ্যে সিদ্ধাচার্য্যদের সাধনা নাথসম্প্রদায়ের মধ্য দিয়ে এসে হাজির হয়েছে। তাঁদের ভাষা, তাঁদের উপমা, রূপক ইত্যাদি নিয়ে পণ্ডিত হাজারীপ্রসাদ আলোচনা করে বলেছেন, “যেরা অনুমান হৈ কি কবীর পর হৈন সিদ্ধোঁ। কা প্রভাব নাথপন্থিরোঁ কী মধ্যস্থতামে হী আ পচা”। এ মত অনেকেরই (গুরু : ভূমিকা : পৃষ্ঠা ১; বরখাল : গোরখবানী : ভূমিকা; বর্মা : পৃষ্ঠা ৭৭)। কিন্তু নাথপন্থীদের দ্বারা কি সিদ্ধাচার্য্যদের বাণী ও সাধনার দ্বারা কবীরের মাঝখানে আশ্রয় নিয়েছে? সিদ্ধাচার্য্য, বাদে রচনা আমরা বাংলা চর্যাগীতিকার মধ্যে পাই, তাঁরা খুব সম্ভব ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যেই দেহত্যাগ করেছিলেন, আর কবীর ত পঞ্চদশ শতাব্দীর সাধক। এঁদের মধ্যে মিলন ঘটালো কে? সাংস্কৃত্যায়নজীর কথা স্বরূপযোগ্য। তিনি বলেন, “ভাবনা ঔর শব্দ সাধীমে” কবীর সে লোকের দ্বারা স্বামী তক কে সতী সন্ত চোরাসী সিদ্ধোঁ। কে হী বংশজ কহে আঁ সকতে হৈ।...পরন্তু কবরী কা সম্বন্ধ সিদ্ধোঁ সে মিলানা উত্তনা আসান নহী, হৈ।”

নাথপন্থীরা হয়তো বহন করে এনেছিল সিদ্ধাচার্য্যদের সহজসাধনা, কিন্তু কবীর কি কেবল নাথপন্থীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত? কহি, কবীরের মধ্যে নাথ গুরুদের প্রতি তো গভীর ভক্তি নেই। বরঞ্চ বিক্রপের সুরই ত স্নানিত। দেখুন—

(১) “নাথ মহিন্দর বাচে নহী, গোরখদত্ত ও ব্যাস।

কহি কবীর পুকারিকে, পরে কালকী কাঁস ॥”

নাথধর্মে যোগ, আসন, পবনরোধই ত আসল। কিন্তু কবীর বলেন—

(২) “আসন পবন যোগ শ্রুতি স্মৃতি। জ্যোতিষ পঢ়ি বৈলানা।” অথবা

(৩) “আসন উড়িয়ে কোন বড়াই”...

বিন্দুরক্ষণ নাথধর্মের একটি বড় কথা। কিন্তু কবীর বলেন—

(৪) “বিন্দু নাথ জো তরয়োঁ ভাই। ধূসরৈ কেঁয়া ন পরম গতি পাই।”

সম্পূর্ণ শিব-উমার প্রতি গভীর ভক্তি নাথধর্মে আছে। কিন্তু কবীর বলেন—

(৫) “মহাদেব মুনি অন্ত ন পায়। উমা সহিত উন জন্ম নবায়।” অথবা

(৬) “শিব সহিত মূরে অবিনাশী।”

মনে রাখতে হবে, সিদ্ধাচার্য্যেরা ছিলেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সমাজের নিম্নস্তরের হাড়ি-ভোম-কেঙের প্রভৃতি। কবীরের জন্মও নীচ জোলাবংশে। পরবর্তী সম্ভব প্রায় সকলেই এই নীচবংশের।

কবীরের ভোজপুরী ভাষা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, কবীর ছিলেন সেই বিহারের নিকটস্থ অঞ্চলে, যেখানে সিদ্ধাচার্য্যেরা বহুদিন পূর্বে সহজসাধনার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মনে হয়, এই নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে পরম্পরাগত সহজ-সাধনা ও নাথসাধনার পটভূমিকাতে কবীরের জন্ম হয়েছে। সিদ্ধাচার্য্যদের সঙ্গে সহজসাধন শেষ হয়নি, তা

শিষ্যপরম্পরায় অব্যাহত অবস্থায় এসেছে আউল বাউলদের মধ্য দিয়ে, বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্য দিয়ে। নিত্যানন্দ সেই আউল-বাউল-অবস্থূত মার্গের মধ্যে জীবনের সার্থকতার সন্ধান করেছেন। সেই 'সাহজিক প্রেমধর্মের' অরূপলক্ষণ নিয়ে প্রেম তুলেছেন রায় রামানন্দ, রূপ গোস্বামী। সেই 'সহজ-সাধনা' বৈষ্ণবদের রাগানুগাভক্তির মধ্যে নিজেকে প্রসারিত করে চৈতন্তোত্তর সহজিয়া-সাধন ধর্ম প্রোতকে টেনে নিয়ে এসেছে। (দেখুন 'পোস্ট চৈতন্ত সহজিয়া কার্ট': মণীন্দ্রমোহন বসু।) পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন 'বাংলার সাধন' গ্রন্থকের (booklet) ৪০৪১ পৃষ্ঠায় বলেছেন, বৈদিক যজ্ঞীয় ধর্মের বিরুদ্ধে মহাবান বৌদ্ধধর্ম এবং নাথধর্ম বিদ্রোহ করেছিল খুব সম্ভব বাংলা-হ'তেই। বাংলার সাধনার ধারা রক্ষিত আছে মহাবান বৌদ্ধধর্মে, নাথধর্মে, তান্ত্রিকাচারে ও বাউল-সাধনায়। আর কবীরের মধ্যে মহাবানীদের কথারই গুনরাবুত্তি। কবীর ছিলেন জাতিতে ছুলাহা অর্থাৎ ঘোঙ্গী-নাথ-বংশের।

বাংলা-বিহার : ধর্মের ধারা

কবীরের সময়কার বা তাঁর কিছু পূর্বস্রকার বাংলা-বিহারের ধর্মের ক্ষেত্রে দেখা যায় নিম্নলিখিত ধারা—

(ক) সিদ্ধাচার্য্যদের সহজসাধনার ধারা। বাণীরূপ পেয়েছে 'বৌদ্ধ গান ও দোহা'তে, 'চর্যাপদে' আর অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে।

(খ) আউল-বাউলের সাধনার ধারা। এঁরা স্নকীধর্ম ও সহজধর্মের ভিতর মিলন সাধন করেছিলেন। কবীরও স্মরণ করেছেন আউলদের—“স্মর নর মুনি জতি গীর ঔলিয়া।”

(গ) বাংলা-বিহার অঞ্চলে বয়ে আসছিল বৈষ্ণব সাধনার ধারা। বাংলা দেশে 'পাহাড়পুর'-চিরাবলী সেই বৈষ্ণবসাধনাকে মুনায়ী মূর্তি দিয়েছে। বাংলা দেশে সংগৃহীত সংস্কৃত কবিতার প্রাচীনতম (?) সংগ্রহগ্রন্থ 'কবীন্দ্রবচনসমুচ্চয়' এবং “সঙ্কল্পিকর্ণায়ুত”তে রাধাকৃষ্ণপ্রণেমের পদ ভারই প্রমাণ। জয়দেবের “গীতগোবিন্দ” সেই বৈষ্ণব ভাবধারার কাব্যরূপ। বাংলার চণ্ডীলাস, মালাধর বসু এবং মিথিলার বিজ্ঞাপতি ভারই “ভাবা”-রূপ দিয়েছেন।

(ঘ) বাংলার পাল-রাজারা তাঁদের বিজুত রাজ্যের ভিতর দীর্ঘদিন ধরে বৌদ্ধধর্ম বা সহজযান প্রভৃতির উপর রাজস্ব ধারণ করেছিলেন। এ বিষয়ে ঐতিহাসিক নজীর আছে।

(ঙ) বাংলা-বিহারের সেন-রাজাদের স্বেচ্ছায় বর্জিত হয়েছিল বাংলার ভিতরে ও আশে পাশে বৈষ্ণবধর্ম একরূপে। এ বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই।

(চ) নাথধর্মের আদি-সিদ্ধ বলে স্বীকৃত মীননাথ বা মৎস্যেশ্বরনাথ বা 'মহাননাথ' বাংলার লোক ছিলেন। কবীরের সমসময়ে বাংলাতে বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে নাথধর্ম কি অপূর্ণ ভাবে মিলিত হয়েছে, তা 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' পাঠ করলে আমরা জানতে পারি। 'শ্রীকৃষ্ণ-

কীর্তনের একটি পদে (“আহোনিশি যোগ ধোয়াই”) শ্রীকৃষ্ণ নাথযোশীর জায় গ্ৰহণ করছেন, নারী রাধিকার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করছেন এবং এই ভাবে সাধনমার্গে অগ্রসর হবার কথা বলেছেন। গোবিন্দদাসের একটি পরবর্তী কালের পদে শ্রীকৃষ্ণ নাথপন্থী যোশীর জায় “গোবিন্দ জাগাধি” শিঙাধ্বনি করতে করতে রাধিকার চারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন।

কবীরের মধ্যে বাংলা-বিহারের সাধনরীতির সমন্বয়

(ক) চর্যাপদের সিদ্ধাচার্য্যদের কথা অজানা ছিল না কবীরের। তিনি স্বয়ং করেছেন “অল্প চৌরাসী সিদ্ধ” কে। কবীরে সিদ্ধাচার্য্যদের ব্যবহৃত উপমা রূপক অজ্ঞ (দেখুন কবীর : বিবেদী)। প্রকাশের দিক্ থেকে আমার যে সমস্ত মিল মনে এসেছে, তা নিয়ে দেখাচ্ছি।

চর্যা

- ১। স্নেহে স্নেহ মিলিয়া জবে
- ২। তিঅ ধাউ খাট পাড়িলা শবরো
মহাস্থে সেজী ছাইলী।
- ৩। বাম দ্বাহিণ দো বাটাছাড়ী
- ৪। মারিঅ শাস্ত্র ননন্দ ঘরে শালী।
- ৫। চন্দ্র স্নেহে হুই চকা।
- ৬। টালত মোর ঘর।
- ৭। কায়্য তরবার পঞ্চবি ডাল।
- ৮। (এই পদটি হুবহু মিল প্রদর্শন করে।
ডাঃ স্কুমার সেন ৭নং ৮নং পদ নিয়ে
স্বন্দর আলোচনা করেছেন।)

বলদ বিআঅল গবিআ বাঁকে।
পিটা হুইএ এ তিনা সাঁকে ॥

• • •

নিতি নিতি সিআলা সিহে সম জুআ।
চেণপাএর স্তিত বিরলে বুআ ॥

কবীর

- ১। স্নেহ সহজ মন স্নেহিতে।
- ২। সহজে বপুরে সেজ বিহাবল স্নেহিলিউ
মই পাঁব পসারী।
- ৩। বায়ে দ্বাহিনে তজো বিকারা।
- ৪। সাস্ত্র ননদ পটিয়া মিলি বধ লৌ।
- ৫। চাঁদ সূর্য্য হুই গোড়া কীনা।
- ৬। কবির কা ঘর শিবরপর।
- ৭। কায়্য মেরা ইক অজব বৃক্ষ-হৈ।
- ৮। (ডাঃ সেন, খুব সম্ভব জামসুন্দর দাস-
সম্পাদিত ‘কবীর’ হ’তে পাঠ দিয়েছেন।
ডাঃ সেনের পাঠ স্মরণীয়। আমি
রাধবদাস-সম্পাদিত কবীরের পাঠ
দিলাম। সামান্য পাঠভেদ লক্ষণীয়।)
বৈল বিয়ায় গায় ভই বন্বা।
বহু হুইএ তিনি তিনি সন্বা ॥

নিত উঠি সিংহ জার সৌ জুই।
কবির কা পদ জন বিরলা বুই ॥

‘হিন্দী সাহিত্য কী ভূমিকা’ গ্রন্থে পণ্ডিত বিবেদী-জী (৩৬ পৃষ্ঠায়) সরহপাদের একটি পদাংশের সঙ্গে কবীরের পদাংশের ভাষা-সাম্য প্রদর্শন করেছেন। এরকম অজ্ঞ পদ সিদ্ধাচার্য্যদের রচনার মধ্য হতে কবীরের মধ্যে প্রায় দুই শতাব্দী পরে বাণীকপে পেয়েছে। সিদ্ধাচার্য্যদের গান চলে এসেছে সাধকপরাশরায়, কবীরের গানে আবার তাকে নতুন

ক'রে পাওয়া গেল। এমনি গানের ধারা বাংলার বাউল-আউলদের রচনার মধ্যে পাওয়া যায়, পাওয়া যায় নাথসাহিত্যে, পাওয়া যায় সহজিয়া সাহিত্যে। সিদ্ধাচার্য্যরা অনেকেই বাঙালী ছিলেন। সেই বাঙালীর পুরোনো গানকে আবার আশ্রয় লক্ষ্য করি কবীরে। কে নিয়ে গেল এই কাব্যের ধারাকে কবীরের মধ্যে? নাথ-পন্থীরা? নাথ-ধর্মের উৎস ত বাংলা বলেই মনে হয়। 'গোরখনাথ'-সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচিতির ফলে কবীরের মধ্যে ঐ সকল পদের পুনরাবৃত্তি? না কোনও 'সহজিয়া' সাধকগোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে বাহিত হয়েছে এই সম্মীত কবীরে। শেষের এই ধারণাটি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বাংলা-বিহারের প্রাণ-কেন্দ্রে সে দিন বৈষ্ণবধর্ম-মিশ্রিত সহজিয়াসাধনার ধারা বয়ে চলেছে। তার যুগ্ম রূপ দেখেছি "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে," সেনদের বৈষ্ণবধর্মে। কবীরের মধ্যে বাউল-আউলদের মতই ঘটের (দেহের) মধ্যে পরমের সন্ধানের কথা আছে, নাথ যোগাসনকে অস্বীকার করা হয়েছে। কবীরের মধ্যে বৈষ্ণব ভাবধারা গভীর। নাথ-পন্থীদের মধ্যে তা নেই। তবে কি কবীর বাংলা-বিহারের বৈষ্ণব ও সহজিয়া সাধনার মধ্য থেকে আপন জীবনদর্শন তৈরী করেছিলেন? কবীর বৈষ্ণব 'কীরতনিয়া'দের পছন্দ হয়-ত করেননি, কারণ—কবীরের পদে—

“করতা দৌসে কীরতন উঁচা করি করি তুণ।

জানৈ বুঝে কিছু নহী, জেঁয়া হি আধা কুণ ॥”

(কবীর : শ্রামসুন্দর : পৃষ্ঠা ৩৮)।

এবং কীরতনিয়াও কবীরের পদে দেখিয়েছেন—

“কীরতনিয়া সে কোসবিস”

দূরে থাকার কথা কবীর বলেছেন (হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা : পণ্ডিত সেন)। কিন্তু বৈষ্ণব-অমুরাগের উজ্জল আলোয়ও কবীর দিয়েছেন। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, বাংলা-বিহারের বিদ্যাপতি-চণ্ডীদাসের পদের সঙ্গে তাঁর অপূর্ণ মিল আছে। তবে এ কীর্তনিয়ার দলকে তিনি পেলেন কোথায়? ১৫০৯—১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কবীরের প্রকটকালে চৈতন্যদেব বারাণসীর মধ্য দিয়ে গতায়ত করেছিলেন। কাল্পিতে কবীর ছিলেন ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত (সিকন্দর লোদীর শক্তিপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত)। এ কি সেই কীরতনিয়াদের কথা? কিন্তু শ্রামসুন্দর দাস যে 'কবীর' গ্রন্থ 'নাগরীপ্রচারিণী সভা' থেকে সম্পাদনা করেছেন, তাতে পুঁথির রচনাকাল বলে ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দ ধরেছেন। একটি ফটো তুলে তিনি দেখিয়েছেন যে, পুঁথির অন্তে রচনাকাল ১৫৬১ সংবৎ দেওয়া আছে। ফটোটা ভাল ক'রে দেখে আমার মনে হয়, সমগ্র পুঁথির লেখা আর তারিখের হাতের লেখা বিভিন্ন, কালি বিভিন্ন, অক্ষর একেবারে আলাদা। আমার কথায় ঝাঁঝ কোঁকুহলী হবেন, তাঁরা দয়া ক'রে শ্রামসুন্দর দাস-সম্পাদিত 'কবীরগ্রন্থাবলী'র কালজ্ঞাপক অংশটির আলোকচিত্র পরীক্ষা করবেন। যদি ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে পুঁথিটি বিরচিত না হয়, তা হ'লে চৈতন্যসম্প্রদায়ের কীর্তনিয়াদের কথা মনে করা অসঙ্গত হবে না। অথবা যদি কালজ্ঞাপক অংশটি সন্দেহজনক

না হয়, তা হ'লে বাংলা-বিহারের কোনও কীর্তিনিয়া-গোষ্ঠীদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচিতির ইঙ্গিত করে কবীরের কথাগুলি। কিন্তু বিহারে কি তখন কীর্তন, ঐ ধরনের উদ্ভব কীর্তন, উদ্ভব কীর্তন (‘উঁচা করি করি তুণ্ড’) প্রচলিত ছিল? অনেকের মতে চৈতন্য ও নিত্যানন্দ ‘সংকীৰ্ত্তনৈকপিতরৌ’। ‘চৈতন্যভাগবত’ ত চৈতন্যকে কীর্তনের স্রষ্টা বলে প্রচার করেছেন। (অবশ্য ভিতরে ‘চৈতন্যভাগবত’ বলেছেন যে, একদিন যখন চন্দ্রহরণের অস্ত্র কীর্তন হচ্ছিল, এমন সময় চৈতন্যের জন্ম হয়। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র-রচিত গ্রন্থক ‘কীর্তন’ দ্রষ্টব্য)।

যাই হোক, বৈষ্ণব-প্রভাবাধিত কবীরের পদের সঙ্গে বিজ্ঞাপতি ও চণ্ডীদাসের অপূর্ণ সাদৃশ্য নিম্নে প্রদর্শিত হ'ল। মনে রাখতে হবে, এই সময় হিন্দীতে (ব্রজভাষাতে) বৈষ্ণব কবিতার ধারা স্রব্ধ হয়নি। রাজস্থানীতে ‘বীরগাথা’র রেশ শোনা যাচ্ছিল। সংস্কৃতে প্রাকৃত্তে বৈষ্ণব কবিতা কবীরের বোধগম্য হবার কোনও কারণ ছিল না। কারণ, তিনি শ্রবণ বলেছেন যে, তিনি মসী ও কাগজ হোন নি (‘মসী কাগদ ন ছুবৌ’)। একমাত্র ‘ভাবা’তে বৈষ্ণব কবিতাই তাঁর সহজবোধ্য ছিল। বিজ্ঞাপতির মৈথিলি বা অবহট্ট কবিতা তাঁর পক্ষে সহজবোধ্য নিশ্চয়ই ছিল। কারণ, কবীরের রচনা ত ভোজপুরীতে ছিল বলে প্রমাণ করেছেন ডাঃ তিওয়ারী। আর বাংলার সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ছিল। তিনি ঘুরেছিলেন বহু দেশ, কাস্মীতে বাঙালী ছিল বহু তখনও (উল্লেখযোগ্য পূর্ববর্তী বাদালী কুল্লুক ভট্ট ও পরবর্তী মধুসূদন সরস্বতী); আর তাঁর বাদালী শিষ্য বা গুরুর অভাব ছিল না। তাঁর রচনাতে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে, তার মধ্যে বাংলা অন্ততম (শ্রামসুন্দর দাস-সম্পাদিত কবীর-ভূমিকা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এ ছাড়া আর কোনও কারণে কি বিজ্ঞাপতি-চণ্ডীদাসের রচনার সঙ্গে তাঁর রচনার অদ্ভুত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় না? বিজ্ঞাপতি-চণ্ডীদাসের স্রীতি পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীতে বিশেষ প্রচলিত হয়েছিল। আর কবীর ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। প্রশ্ন হ'তে পারে, কবীরের বৈষ্ণব সঙ্গীতের দ্বারা কি বিজ্ঞাপতি চণ্ডীদাস প্রভাবাধিত হ'তে পারেন না। আমি বলি না। কারণ, বিজ্ঞাপতি বা চণ্ডীদাস (যে চণ্ডীদাসই হোন) সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তাঁদের রচনায় তার প্রমাণ আছে। সংস্কৃতে বৈষ্ণব পদাবলীর ধারা বা ভাগবত সংস্কৃতে অনতিজ্ঞ কবীরের কাছে দূর্বোধ ছিল, এঁদের কাছে ছিল না। তাই এঁদের পক্ষে বৈষ্ণব কাব্যের আদর্শ স্থির করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। আর বাংলাতে ও মিথিলাতে সে সময় বৈষ্ণব ভাবের হাওয়া বইছিল, তাই বিজ্ঞাপতি বা চণ্ডীদাস অত সহজে বৈষ্ণবতাকে জীবনে বা কাব্যে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। আমরা বিজ্ঞাপতির সঙ্গে এবং চণ্ডীদাসের সঙ্গে কবীরের পদে অপূর্ণ সাদৃশ্য নীচে দেখাচ্ছি।

বিজ্ঞাপতি। চণ্ডীদাস

কবীর

(১) পিয়া জব আরব এ মরু গেছে।
মংগল যতহঁ করব নিজ দেহে ॥

(২) হুলহনী গাবছ মল্লচার,
হম বরি আয়ে হৌ রাজা রাম ভরভার ॥

বিজ্ঞাপতি। চণ্ডীদাস

বেদী করব হম আপন অংগ যে।
 কাড় করব তাহে চিকুর বিছানে ॥
 আলিপনা দেয়ব মোতিম হার।
 মঙ্গল কলস করব কুচ তার ॥—বিজ্ঞাপতি

কবীর

তন রত করি মৈ মন রত করিহ
 পঞ্চতত বরাতী ॥
 রামদেব যোঁরৈ পাহনৈ আয়ে, মৈ
 জোবন যৈমাতী।
 সরীর সরোবর বেদী করিহ, ব্রহ্ম
 বেদ উচার।
 রামদেব সদি ভাবরি লৈছ, বনি বনি
 তাগ হমার ॥
 —কবীর-গ্রন্থাবলী, পৃষ্ঠা ৮৭।

(২) শব্দ কর চুর বসন কর দুর
 তোড়হ গজমতি হার রে।
 পিয়া যদি তেজল কি কাজ শিকারে
 বমুনা সলিলে সব ডার রে ॥
 সীধার সিন্দুর পৌছি কর দুর
 পিয়া বিছ সবহি নৈরাশ রে।
 —বিজ্ঞাপতি।

(ঐক্যকীর্তনে ঠিক এই ধরণের পদ
 আছে। পৃষ্ঠা ১৫৬, দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রষ্টব্য।)

(২) ক্যা চুরা পাইল যমকারৈ
 কথা ভয়ো বিছুবা ঠমকারৈ ॥
 কা কাজল স্তম্বুর কৈ দীটৈ
 সোলহ জ্ঞানর কথা ভয়ো কীটৈ ॥
 অজন মজন করৈ ঠগোরী
 কা পচি মটৈ নিগোড়ী বোরী ॥
 জোঁ পৈ পতিব্রতা হৈ নারী
 কৈ সৈ হী রটো সো পিরহি পিয়ারী।
 তন মন জোবন দৌপি সরীরা
 তাহি লুহাগনি কটৈ কবীরা ॥
 —কবীর-গ্রন্থাবলী : পৃষ্ঠা ১৩২।

(৩) ছায়া দেখি বসি যাই তরু লতা বনে।
 জলিয়া উঠয়ে তরু লতা পাতা সনে ॥
 বমুনার জলে যদি দিয়ে হাম কাঁপ।
 পরাণ ছুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ ॥
 —চণ্ডীদাস : পদকল্পতরু।

(৩) ধূপ দাহতে ছাহ তকাই, মতি তরবর
 সচ পাউঁ।
 তরবর মাহৈ জালা নিকটৈ, তো ক্যা
 লেই বুঝাউ।
 জে বন জলৈ ত জল কু ধাবে, মতি
 জল সীতল হোই।
 জলহী মাহি অগনি জে নিকটৈ, ঔর
 ন দুজা কোই।
 —কবীর-গ্রন্থাবলী : পৃষ্ঠা ১২৩।

বিজ্ঞাপতি। চণ্ডীদাস

কবীর

- (৪) দিনের সুরক্ষ পোড়ায়। যারে
রাতি হো এ ছুখ চান্দে।
কেমনে সহিব পরাণে বেড়ায়ি
চখুত নাইসে নিশে ॥
শীতল চন্দন আঙ্গে বুলান্ত
ভতো বিরহ না টুটে।

—চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। পৃষ্ঠা ১৬২।

- (৫) চাইলে সোয়াস্ত নাই নিল গেল দূরে।
কাছ কাছ করি প্রাণ নিরবধি ঝুরে ॥
নবীন পাউসের মীন মরণ ন জানে।
নব অমরাগে চিত বৈরুজ না মানে ॥

—চণ্ডীদাস : পদকল্পতরু।

- (৬) জল বিহ্ন মীন যেন কবছ না জিয়ে।
মাল্লবে এমন প্রেম কোথা না গুনিয়ে ॥

—চণ্ডীদাস : পদকল্পতরু।

- (৭) তোমহার বোবন কাল ভুজঙ্গম
আঙ্গে হো ভাল গারুড়ী।

—চণ্ডীদাস : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন : পৃষ্ঠা ৪৫।

- (৪) জরৈ সরীর যহ তন কোই ন বুকাটৈ
অনল দট্টৈ নিস নীদ ন আট্টৈ ॥
চন্দন ঘসি ঘসি অঙ্গ লগাউ
বাম বিনা দারণ ছুখ পাউ ॥
—(ক. গ্রন্থাবলী : পৃষ্ঠা ১৭৪)

- (৫) জৈসে জল বিন মীন তলপৈ
জৈসে হরি বিন মেরা জিয়রা কলপৈ ॥
নিস দিন হরি বিন নীদ ন আট্টৈ
দরস পিয়াসী রাম কঁয়া সচুপাটৈ ॥
—(ক. গ্র. : পৃষ্ঠা ১৬৪)।

- (৬) তুমহ জলনিধি মৈ জলকর মীনা
জল মৈ রহৌ জলহি বিন ধীনা।
—(ক. গ্র. : পৃষ্ঠা ১২৬)।

- (৭) তুমহ গারড়ু মৈ বিষ কা মাতা
কাহে ন জিবাবৌ মেরে অমৃতদাতা ॥
সংসার ভবংগম ভসিলে কায়,
অঙ্গ ছুখ দারন ব্যাটৈ ভেরী মায় ॥
—(ক. গ্র. পৃষ্ঠা ১১৪)।

আলোচনা ক্রমেই দীর্ঘ হয়ে পড়ছে। আরও অনেক বিষয় আলোচনা করার আছে। কবীরের মধ্যে বাংলা ভাষা, বাঙ্গালীজনোচিত মনোবৃত্তি ও কবীরের ‘ঘর’ এবং ‘বোলী’ (বা কিনা “পূবব”-এর বলে কবি নিজেই স্বীকার করেছেন), আগামী বারে তার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করব।

বাংলা ভাষায় বিদ্যাসুন্দর কাব্য

অধ্যাপক—শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

প্রাচীন ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া বাংলার বহু কবি তাঁহাদের কাব্য রচনা করিয়াছেন—কাব্যের মূল আখ্যানভাগ তাঁহাদের কাহাবও নিজস্ব নহে। সম্ভবতঃ সংস্কৃত-বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে আশ্রয় করিয়া বাংলা ভাষায় ‘বিদ্যাসুন্দর কাব্য’ রচনার সূত্রপাত হয়। কে যে বাংলার ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যের আদিকবি, তাহা স্থানিচিত ভাবে বলা কঠিন। বহুবর শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁহার ‘কালিকামঙ্গল’এর ভূমিকায চৌদ্দ জন বাঙ্গালী কবির ‘বিদ্যাসুন্দর কাব্য’র উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—(১) কঙ্ক, (২) শ্রীধর কবিরাজ, (৩) গোবিন্দদাস, (৪) কৃষ্ণরাম দাস, (৫) শ্রীমধুসূদন কবীন্দ্র, (৬) ক্ষেমানন্দ, (৭) বলরাম কবিশেখর, (৮) বামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন, (৯) ভাবতচন্দ্র রায় কবিশঙ্কর, (১০) নিধিরাম আচার্য কবিরত্ন, (১১) প্রাণরাম চক্রবর্তী, (১২) বিশ্বেশ্বর দাস, (১৩) কবিচন্দ্র, (১৪) গোপাল উড়ে। ইহার মধ্যে শেষোক্তটি গীতাভিনয় কাব্য অর্থাৎ নাটক। বসুমতী-সাহিত্যমন্দির হইতে যে বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দ্বিজ রাধাকান্ত নামক আরও একজন কবির সমস্ত বিদ্যাসুন্দর কাব্যটি মুদ্রিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত পত্রিকার আলোচনা হইতে সারিবিদ খাঁ নামক একজন মুসলমান প্রাচীন কবির ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্যের সহিত আমরা পরিচিত। প্রাচীন বাঙ্গালী কবি কামীনাথ ‘বিদ্যাবিলাপ’ নামক এক নাটক রচনা করিয়াছিলেন। কঙ্ক, শ্রীধর কবিরাজ বা সারিবিদ খাঁর বিদ্যাসুন্দর কাব্য আমরা চান্ধু্য করি নাই, পত্রিকার আলোচনা হইতে সেগুলির সামান্য পরিচয় পাইয়াছি মাত্র।^১ আমরা বর্তমানে যে কয়টি বিদ্যাসুন্দর কাব্যের সাহিত্য প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত, তাহার মধ্যে গোবিন্দদাসই প্রাচীনতম। তাহাব পরেই বোধ হয় কৃষ্ণরাম দাসের ‘কালিকামঙ্গল’। গোবিন্দদাসের ‘বিদ্যাসুন্দর’ কাব্য তাঁহার কালিকামঙ্গলের অন্তর্গত একটি উপাখ্যান। উপাখ্যানটি বড় না হইলেও নিতান্ত ক্ষুদ্র নহে। গ্রন্থের রচনাকাল ১৫১৭ শক বা ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। কৃষ্ণরাম দাস ইহার প্রায় পৌণে এক শতাব্দী পরে (১৬৭৬ খ্রীঃ)^২ তাঁহার কাব্য

(১) কবি কঙ্কের করুণ কাহিনী—শ্রীচন্দ্রকুমার দে, সৌরভ, ১৩২৪ কার্তিক, পৃ. ১৫-১৬। সৌরভ, ১৩২৫-২৬, পৃ. ১২, ৫২, ১০৫, ১২৯, ১৪৭। ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’ ৪৪ বৎ—পৃ. ২২-২৪।

(২) “সারদাসনের নেত্র ভীমাক্ষীবার্জিতমিত্র তেজিয়া ধর্ম্ম পক্ষ তবে। বিধুর মধুর বাম রচনাতে কহিলাম যুগ সকল বিচারিয়া সতে ॥” ইহা হইতে পণ্ডিত শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, আমার মনে হয়, তাহাই সমীচীন। আমার অনুমান (১৫৫১ শক) ঠিক নহে।

রচনা করেন। ইহার মধ্যে অল্প কোন কাব্য রচিত হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না। কৃষ্ণরাম তাঁহার কাব্যকে ‘কালিকামঙ্গল’ বলিয়া উল্লেখ করিলেও আমরা তাঁহার সহিত অঙ্কাজ মঙ্গলকাব্যের ভ্রাতৃ দেবীর জীবনী লইয়া কোন পৌরাণিক কাহিনীর সম্বন্ধ পাই নাই—কেবল ‘বিজ্ঞানস্বন্দর’ কাব্যখানিই আমাদের হাতে আসিয়া পড়িয়াছে। কৃষ্ণরাম তাঁহার কাব্যের কাহিনী সম্ভবতঃ গোবিন্দদাস বা পূর্ববর্তী অল্প কোন বাংলা কাব্য বা সংস্কৃত বিজ্ঞানস্বন্দর অথবা প্রচলিত আখ্যান হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মুকুন্দরামের চণ্ডিকামঙ্গল তাঁহাকে তাঁহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। কৃষ্ণরামের কাব্যই ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বলরাম কবিশেখর প্রভৃতি পরবর্তী কবিগণের আদর্শ ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে রামপ্রসাদ ভিন্ন প্রত্যেক কবিই কাব্যের আখ্যানভাগের কিছু পরিবর্তন করিয়া আপন বৈশিষ্ট্য দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

আমরা প্রধানতঃ কৃষ্ণরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও বলরাম, এই কয়জন কবির কাব্যের তুলনামূলক সমালোচনা করিতে চেষ্টা করিব এবং প্রসঙ্গক্রমে অপরাপর কবির কাব্যের বিষয়ও আলোচনা করিব। এই কাব্য কয়টির রচনাকাল সম্বন্ধে আমরা প্রথমে আলোচনা করিয়া, পরে ইহার বিষয়বস্তু ইত্যাদির বিষয় আলোচনা করিতেছি। গোবিন্দদাসের কাব্যেই তাঁহার রচনাকাল লিখিত হইয়াছে—“মুনি অক্ষর বাণ শশী সকল পরিমিত। এই কালে রচিত কালিকাচণ্ডীর গীত ॥” ইহা হইতে সহজেই বুঝা যায় যে, কাব্যের রচনাকাল ১৫১৭ শক অর্থাৎ ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দ; কৃষ্ণরামের কাব্যের তারিখ আমরা পূর্বেই দিয়াছি— ১৫৯৫ শক বা ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। ভারতচন্দ্রের কাব্যের তারিখ সর্বজনবিদিত চৈত্র মাস ১৬০৪ শক বা ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ। রাধাকান্ত তাঁহার কাব্যের রচনাকাল দিয়াছেন—“শকে গ্রহ বহু গুণে বিধুর গগনে। এই হেতু হইল গীত প্রকাশ ভুবনে ॥” অতরাং তাহা হইতে বুঝা যায়, ১৬৮৯ শক বা ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দ। এখন অপর তিন জন কবির কাব্যরচনাকাল সম্বন্ধে কি জানা যায় তাহা দেখা যাউক:

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ১১৬৫ সনে অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে রামপ্রসাদকে যে ৫১ বিঘা ‘মহোত্তরাণ’ দান করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার কবিরঞ্জন উপাধি ব্যবহার করেন নাই, অথচ কৃষ্ণচন্দ্রই এই উপাধি দান করিয়াছিলেন। এদিকে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রকে যে জমি দান করিয়াছিলেন, তাহার সনদে স্পষ্ট ‘রায়গুণাকর’ উপাধির উল্লেখ আছে। রামপ্রসাদ তাঁহার বিজ্ঞানস্বন্দর কাব্যের ভণিতায় সর্বত্র ‘কবিরঞ্জন’ উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক রামপ্রসাদকে মহোত্তরাণ দান করার পরবর্ত্তসর অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতচন্দ্র ইহা লীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া আমরা কাব্যের আলোচনাকালে প্রমাণ করিব যে, রামপ্রসাদের কাব্য ভারতচন্দ্রের পরবর্তী।

বলরামের ‘কালিকামঙ্গল’ের ভূমিকায় বঙ্গবর ঐতিহ্যাহরণ চক্রবর্তী ভারতচন্দ্র অপেক্ষা বলরামের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যে যুক্তি দেখাইয়াছেন, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। বলরামের কাব্য যে তারতের পূর্বে, তাহা মনে করিবার কোন হেতু নাই, তাহার এমন কিছু নাই, যাহা

হইতে তাহা অনেক পূর্বের ভাষা বলিয়া মনে হয়। ভারতচন্দ্রের ভাষা সংস্কৃতবহুল এবং বলরামের ভাষা প্রাদেশিকতাসম্পন্ন, এইমাত্র। কৃষ্ণরাম রামপ্রসাদের প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এবং রামপ্রসাদ হুবহু কৃষ্ণরামকে অনুসরণ করিয়াছেন অথচ তাঁহাদের কাব্যের ভাষা তুলনা করিলে আকাশ পাতাল কিছু প্রভেদ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণরামেরও পূর্বে যে বলরাম তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহাও মনে করিবার কোন হেতু নাই। তাহার উপর কাব্যের মধ্যে অনেক কিছু আছে, যাহা হইতে আমরা দেখাইতে পারিব যে, বলরাম ভারতচন্দ্রের নিকট কিঞ্চিপ ধনী।

বহুমতী-সাহিত্যমন্দির হইতে যে ‘বিভাসন্দর গ্রন্থাবলী’ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার সম্পাদক শ্রীপ্রহলাদকুমার পাল মনে করেন যে, মধুসূদন চক্রবর্তী-রচিত ‘বিভাসন্দর’ রামপ্রসাদ-ভারতচন্দ্রের বিভাসন্দরের পূর্ববর্তী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের রচনা।” কিন্তু নিজসম্পাদিত গ্রন্থের পাঠটি যদি একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহার ধারণা কত ভ্রান্ত। মধুসূদন চক্রবর্তী তাঁহার কাব্যের ‘বিভাসন্দরের বিচার’ গ্রন্থের ভণিতায় লিখিতেছেন—

“ঘটক চক্রবর্তীসুত কৃষ্ণচন্দ্র পাছে রত

ক্রীষুক্ত ঘটক চূড়ামণি।

তাহার অহঙ্ক কহে কালীপদ সরোবরে

রক্ষ রক্ষ নগেজ নন্দিনী ॥”

ঘটকচূড়ামণি কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ ছিলেন এবং মধুসূদন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এক্ষেত্রে তিনি কিরূপে ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিলাম না।

আমরা বত হুর জানিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে অনুমান হয়, গোবিন্দদাস, ভারতচন্দ্র ও বিজ্ঞ রাধাকান্ত* ব্যতীত অপর চারি জন কবিই তাঁহাদের কাব্যটিকে একটি স্বতন্ত্র কাব্য হিসাবে রচনা করিয়াছিলেন। কারণ, কাব্যের আদিতে যে দেবদেবীর বন্দনা থাকে, তাহা কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও বলরামের কাব্যে বর্তমান। মধুসূদনের যে কাব্যখানি মুদ্রিত অবস্থায় আমরা পাইয়াছি, তাহার পূর্বাংশ খণ্ডিত এবং তাহা যে কোন বৃহত্তর মূলকাব্যের অংশবিশেষ ছিল, তাহাও মনে করিবার কোন কারণ এখনও পাই নাই*। কৃষ্ণরাম গ্রন্থের আদিতে এবং

(৩) বহুমতী-সাহিত্যমন্দির হইতে প্রকাশিত বিভাসন্দর গ্রন্থাবলীতে বিজ্ঞ রাধাকান্তের যে বিভাসন্দর মুদ্রিত হইয়াছে, তাহারও পূর্বাংশ খণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। কারণ, এই আরম্ভ হইতেছে “ভাটখুণ্ডে বিভাসর স্নেহের বর্ণনা শুনিয়া সন্দেহের বর্জন হইবার ইচ্ছা” প্রসঙ্গ হইতে। গ্রন্থের সূচনার নায়ক নায়িকার অথবা পরিচয়ের কথা নাই বা ভাটখুণ্ডে প্রেরণ করার কথা নাই।

(৪) ক্রীষুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্তী তাঁহার কালিকামঙ্গলের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, “মধুসূদনের কালিকামঙ্গলে পৌরাণিক উপাখ্যানই মুখ্য স্থান অধিকার করে। বিভাসন্দরের কাহিনী ইহাতে

বলরাম গ্রন্থের মধ্যেই নিজ পরিচয় দিয়াছেন। বলরামের পুঁথিখানির শেবাংশ খণ্ডিত হওয়ায় তাঁহার সম্বন্ধে বা গ্রন্থের রচনাকাল সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না।

এইবার আমরা এক একটি প্রসঙ্গ ধরিয়া কাব্যগুলির বিষয়বস্তু ও তাহার রচনাচাতুর্যের আলোচনা করিব। আলোচনার সুবিধার জন্ত আমরা কাব্যের বিষয়বস্তুকে ১২টি অংশে ভাগ করিতেছি—(১) মঙ্গলাচরণ ও গ্রন্থারম্ভ, (২) স্তবের বর্ধমান যাত্রা হইতে মালিনীর সহিত সাক্ষাৎ, (৩) মালিনীর দৌত্য, (৪) বিভাঙ্গন্বরের দর্শন ও সমাগম সম্বন্ধে পরামর্শ, (৫) সন্ধিধনন হইতে বিভাঙ্গন্বরের বিচার, (৬) বিভাঙ্গন্বরের কেলিকৌতুক, (৭) বিজ্ঞার গর্ভ ও গোপন প্রেম প্রকাশ, (৮) চোর অমুসন্ধান, (৯) চোর ধরা, (১০) চোরের বিচার, (১১) স্তবের মুক্তি ও (১২) বিভাঙ্গন্বরের বিবাহ হইতে স্বর্ণলাভ।

১। মঙ্গলাচরণ ও গ্রন্থারম্ভ

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, গোবিন্দ দাস, ভারতচন্দ্র ও বিজ্ঞ রাধাকান্তের কাব্য বৃহত্তর কাব্যের অংশবিশেষ। স্তবরাজ মঙ্গলাচরণ অংশ তাহাতে নাই। কৃষ্ণরাম তাঁহার দেবদেবী বন্দনায় গণেশ, সরস্বতী, কালিকা, কৃষ্ণ আদি অস্ত্রান্ত দেবতা বন্দনা করিয়া আত্মপরিচয় দিয়া ধর্মীর নিকট হইতে মঙ্গলাকাব্য লিখিবার আদেশ প্রাপ্তির কথা লিখিয়াছেন। রামপ্রসাদ গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালীবন্দনা করিয়া জাগরণারম্ভ করিয়াছেন। বলরাম গণেশ, রাম, সরস্বতী, চৈতন্য, দশাবতার, অস্ত্রান্ত দেবদেবী ও দিগবন্দনা করিয়া গীত আরম্ভ করিয়াছেন। মধুসূদন চক্রবর্তীর কাব্যের পূর্বাংশ খণ্ডিত, স্তবরাজ এই দেবদেবীবন্দনা অংশ তাহাতে নাই।

কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলের যে দুইটি পুঁথি বর্তমানে পাওয়া যায়, তাহাতে কাহিনীটি যেন হঠাৎ আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। নায়ক নায়িকার পরিচয়, বিভার প্রতিজ্ঞা, বিভার পিতা কতৃক পাত্র অন্বেষণে ভাটপ্রেরণ, স্তবের ভাটমুখে বিভারস্তম্ভ শ্রবণ করিয়া বীরসিংহের দেশে আসিবার বাসনা, কিছুই উল্লেখ নাই। দেবীর আজ্ঞায় স্তবের বীরসিংহের পুরে গমন, এই প্রসঙ্গ লইয়া গীত আরম্ভ হইয়াছে। সম্ভবতঃ পুঁথি দুইটিরই এই অংশ খণ্ডিত। কবি পরেই মাধব ভাটকে স্তবের বধ্যভূমিতে উপস্থিত করাইয়াছেন, কাব্যের আদিতে তাহার নামোল্লেখও নাই—ইহা বড়ই আশ্চর্যের বিষয়। রামপ্রসাদ মূলতঃ কৃষ্ণরামের বিষয়সূচী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার কাব্যের প্রথমে যে বিভার অন্বেষণে মাধব ভাটের কাঞ্চীপুর গমনের প্রসঙ্গ আছে, এই অংশটি পুঁথি দুইটি হইতে স্রষ্ট হইয়াছে।

গৌণ।” আমরা জানি না, কোন প্রমাণবলে তিনি ইহা লিখিয়াছেন এবং এই মধুসূদন আমাদের আলোচ্য কাব্যের গ্রন্থকার কি না, তাহাও জানিবার উপায় নাই।

(৫) পরিশিষ্টে বিস্তৃত ভুলমামুলক সূচীপত্র দ্রষ্টব্য।

বলরামের কাব্যেরও গীতারঙে কিছু অংশ ছাড় পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, প্রথমেই লিখিত আছে—

“পাইয়া উপাঙ্গ

নৃপতি-নন্দন

পূজরে দেবী ভক্তকালী।”

এখানে এই ‘নৃপতিনন্দন’ কে, কেনই বা সে ভক্তকালীর পূজা করিতেছে, তাহার কিছুই লেখা নাই। পরে অবশ্য ভগবতীর সহচরী বিমলা স্তম্বরের দেবী আরাধনার কারণ দেবীকে বলিতেছেন এবং মালিনী স্তম্বরকে বিজ্ঞার বিবাহ না হইবার প্রসঙ্গে এই উপক্রমণিকার একটি সংশোধন করিয়াছে। কিন্তু স্তম্বর বিজ্ঞার উপাখ্যান কাহার নিকট শুনিলেন, তাহার কোন নির্দেশ কাব্যে নাই, অথচ ‘ভক্তকালীকর্তৃক স্তম্বরকে বরদান’ প্রসঙ্গের শেষে লিখিত আছে—“গুণসাগর রাজা ইহা নাহি জানে। না কহিল স্তম্বর মাধব ভাটস্থানে॥”

গোবিন্দদাসের কাব্যে এই ভাবে প্রস্তারস্ত করা হইয়াছে—গৌড়দেশে কাঞ্চন নগরের রাজা গণিশা ও তাঁহার পাটরাণী কলাবতী পুত্র বিনা মনঃকষ্টে কালযাপন করিতেছিলেন। স্বর্গে পুস্পক নামে এক গন্ধর্ব নর্তক নৃত্যরতা এক অঙ্গরাকে দেখিয়া কামার্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহাতে ইন্দ্র তাহাদ্বিগকে মর্ত্যে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া অভিশাপ দেন। রাজা গণিশার প্রতি দেবীর স্বপ্নাদেশ হইলে তিনি মহাসমারোহে দেবীর পূজা করেন। ফলে দেবীর বরে কলাবতীর গর্ভে সেই অঙ্গর পুস্পক স্তম্বররূপে জন্মগ্রহণ করে। এদিকে রত্নপুরের রাজা বীরসিংহের মহিবীর গর্ভে সেই শাপপ্রস্তা অঙ্গরা বিজ্ঞারূপে জন্ম লইল।

রাজা বীরসিংহ কন্তাকে পণ্ডিত আনিয়া সুশিক্ষিতা করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, বিজ্ঞাকে বিজ্ঞায় পরাস্ত যে করিতে পারিবে, সেইরূপ যোগ্য বরের সহিত বিজ্ঞার বিবাহ দিবেন। বিজ্ঞার বিবাহের বয়স হইলে পাত্র অন্বেষণে রাজা মাধব ভাটকে প্রেরণ করিলেন। মাধব বহু দেশ ঘুরিয়া গণিশার রাজ্যে গিয়া বৃহস্পতির তুল্য কুমার স্তম্বরের সাক্ষাৎ পাইলেন। স্তম্বরকে বিজ্ঞার পরিচয় ও বীরসিংহের প্রতিজ্ঞার কথা বলিয়া তাঁহাকে গৌড়দেশে যাইতে উপদেশ দিয়া ভাট দেশান্তরে গমন করিল। স্তম্বর ভগবতীকে পূজা করিয়া পিতামাতাকে না জানাইয়া গৌড়দেশে যাত্রা করিলেন।

পরবর্তী কবিগণ সকলেই মূলতঃ এই ভাবেই প্রস্তারস্ত করিয়াছেন। বলরামের কাব্যের প্রথমংশ খণ্ডিত হইলেও বুঝা যায় যে, মাধব ভাটের নিকট বিজ্ঞার সংবাদ পাইয়া স্তম্বর কালিকার পূজা করিলেন এবং কালী তাঁহাকে অমৃত্যু সঙ্গ দাখিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন ও বলিলেন,—

“লহ মোর নিদর্শন স্মৃতি করি হাথে। কথার দোসর পুত্র হব তোর সাথে॥”

ইহাতে বুঝা যায়, ভগবতী ওকদেহে ভর করিয়া স্তম্বরের সাথী হইয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে লিখিত আছে, বর্ধমানের রাজা বীরসিংহের কন্তা বিজ্ঞা স্বয়ং পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে যে বিজ্ঞায় পরাস্ত করিবে, সেই তাঁহার পতি হইবে। কিন্তু কোন

রাজপুত্রই বিত্তাকে পরাস্ত করিতে পারিল না। ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন—বর্ধমানের রাজা বীরসিংহ কত্কা বিত্তার বিবাহের অল্প চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। শেষে লোবমুখে তুলিলেন, কাঞ্চীদেশের রাজা গুণসিদ্ধ রায়ের পুত্র স্তম্ভর ‘বড় রূপগুণযুক্ত,’ সে বিত্তাকে বিত্তায় পরাস্ত করিতে পারিবে। রাজা তৎক্ষণাৎ ভাটকে পত্র দিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ভাট পিয়া স্তম্ভরকে পত্র দিল। পত্র পড়িয়া স্তম্ভরের বর্ধমানে আসিতে বাসনা হইল এবং ভাটকে বিরলে লইয়া গিয়া বিত্তার রূপগুণের পরিচয় লইলেন। ভাটের বর্ণনা শুনিয়া স্তম্ভরের কৌতুহল বর্ধিত হইল। সেই অবধি

‘বিত্তার আকার ধ্যান বিত্তা নাম জপ।

বিত্তালাপ বিত্তালাপ বিত্তালাভ তপ ॥

হায় বিত্তা কোথা বিত্তা কবে বিত্তা পাব।

কি বিত্তাপ্রভাবে বিত্তা বিত্তমানে বাব ॥’

এই অবস্থা হইল এবং শেষে ঠিক করিলেন—

‘একা যাব বর্দ্ধমান করিয়া যতন।

যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন ॥’

স্তম্ভর কালীর আরাধনা করিলেন। দেবী আকাশবাণীতে বলিলেন—

‘চল বাছা বর্দ্ধমান বিত্তালাভ হবে।’

স্তম্ভর বর্ধমান যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

রামপ্রসাদের কাব্যেও বিত্তার প্রতিজ্ঞার কথা আছে; তবে একটু ভিন্ন ভাবে ইহা আরম্ভ হইয়াছে—বীরসিংহ কত্তার প্রতিজ্ঞা অনুসারে পাত্র না পাইয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলে নিকটে মাধব ভাট ছিল; সে বলিল, কিছু দিন অপেক্ষা করিলে সে উপযুক্ত পাত্র খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারে। রাজা তাহাকে শিরোপা করিলেন, উপহার দিলেন ও একটি ঘোড়া দিলেন এবং এইবার উপযুক্ত বর মিলিবে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রাজকাৰ্যে মন দিলেন। পৌক্ষে পাক দিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া মাধব ভাট রাজকত্তার পতি অঘেষণে বাহির হইল। বহু স্থান অঘেষণ করিয়া শেষে কাঞ্চী দেশে উপস্থিত হইয়া—

পাঠশালে পড়িয়া সঙ্গে স্তম্ভর স্তম্ভর সঙ্গে

রূপ দেখি ভট্ট হরষিত ॥

কোন শাজে নাহি জুটি যে যে কহে দৃঢ় কোটি

কণমাত্রে তাহার সিদ্ধান্ত।

মাধব জানিল দড় ভবানীর ভক্ত বড়

নিভাস্ত বিত্তার এই কান্ত ॥

তাহার পর রায়বার পড়িয়া গুব করিয়া নমস্কারান্তে হিন্দী ভাষায় বলিল—

‘বীরসিংহ নাম রাজা জাতমে ছেয়, বড়া তাজা

শোন্‌হৌগে গুনকা জেকেবু।

ওন্কা ঘরমে লেড়কী এক তারিফ করে। কেসেক
রাতদেন সাদিকা ফেকের ॥

কওল এস্তা কি হেয়ও হজিমংহি দেগাযেও
শাজ্জ যে ওহি ওস্কা নাথ।

তোমরা হো এসা আন যো কহৌ সো কহা মান
তোম সকোগে আও হামারে সাথ ॥

সুন্দর তাকে বিরলে লইয়া গিয়া বিশেষ করিয়া সকল শুনিলেন। তখন—
“বিবাহ হইল বাই পক্ষী হৈয়া উড়ে যাই
নিবসি রমণীমণি যথা ॥

পিয়া বিজা নামসুধা সুন্দরের গেল সুধা
রত্নাগারে করিলা শয়ন।”

রাজিশেষে কালী আসিয়া স্বপ্নাদেশ দিলেন এবং ভবিষ্যতে কি হইবে, মোটামুটি তাহাও জানাইয়া দিলেন। কালী তাঁহাকে একা বাইতে উপদেশ দিয়া চলিয়া গেলেন। প্রভাতে উঠিয়া সুন্দর বর্ধমান যাত্রা করিলেন। দ্বিজ রাধাকান্ত একটু নূতনত্ব করিয়াছেন—সুন্দরের এক সহচর আসিয়া সংবাদ দিল যে, রাজার নিকট বর্ধমানরাজ বীরসিংহের নিকট হইতে এক ভাট আসিয়াছে। রাজকন্ডা পরম পণ্ডিত। সে পণ করিয়াছে, যে তাহাকে বিচারে পরাস্ত করিবে, সেই তাহার ভর্তা হইবে। রাজার ইচ্ছা, ভাটের নিকট সকল শুনিয়া সুন্দর গিয়া চেষ্টা করুন। ভাটের সহিত সরোবরতীরে কুমারের সাক্ষাৎ হইল; ভাট কুমারের নিকট বিজ্ঞার রূপবর্ণনা করিল। সুন্দর বিজ্ঞাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। দৈববাণী হইল—“সাবিলে সিদ্ধি হইবে।” রাজপুত্র বিজ্ঞার উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইলেন।

(২.)

সুন্দরের বর্ধমানযাত্রা

(ক)

গোবিন্দলাসের বিজ্ঞার জন্মভূমি ‘রত্নপুর’, ককরাইয়ের বিজ্ঞার জন্মভূমির সঠিক নাম কিছু নাই, তাহা বীরসিংহের রাজধানী হিসাবে ‘বীরসিংহপুর’ বলিয়া কাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, বলরাম ও রাধাকান্ত ইহা ‘বর্ধমান’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সংস্কৃত বিভাসুন্দরের উচ্ছিন্নিনী কি ভাবে, কেন এবং কাহার দ্বারা বর্ধমানে পরিণত হইল, তাহা দেখা যাউক।

সংস্কৃত বিভাসুন্দরের যে অংশ মুদ্রিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে, তাহা অসম্পূর্ণ—নায়ক নায়িকার পরিচয় তাহাতে নাই। শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ দ্বিজ মহাশয়ের নিকট যে পুথিটি

আছে, তাহাতে বিজ্ঞান পিজালয় ‘উজ্জয়িনী বলিয়া উল্লিখিত আছে’।^{১০} ভারতচন্দ্রের প্রায় সমসাময়িক কবি নিধিরাম আচার্যের কাব্যে^{১১} ও অপেক্ষাকৃত অর্বাচীন কবি কান্দীনাথের ‘বিশ্বাবিলাপ’ নাটকে উজ্জয়িনীর উল্লেখ আছে। কৃষ্ণরামের কাব্য হইতে জানা যায়, তাহা গোড় দেশের কোন নগর। কবি অধিকাংশ স্থলে ‘বীরসিংহ পুরী’ বা ‘বীরসিংহ দেশ’ বলিয়া এড়াইয়া গিয়াছেন। সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের কোন নগরের অধিপতির কন্ডার নামে এই কুৎসা রটনা করিতে তিনি ইচ্ছুক ছিলেন না। যে কয়জন কবির কাব্যে বর্ধমানের উল্লেখ আছে, তাহার মধ্যে রামপ্রসাদ ও স্বিজ রাধাকান্ত যে ভারতচন্দ্রের পরবর্তী, তাহা এখন আর সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। বলরাম যে ভারতের পূর্ববর্তী, তাহা মনে করিবার কোন হেতু এবং বলরাম কেন যে হঠাৎ উজ্জয়িনীর নাম পরিবর্তন করিয়া তাহা বর্ধমান করিবেন, তাহার কোন যুক্তিই পাওয়া যায় না।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত-লিখিত ভারতচন্দ্রের জীবনী হইতে জানা যায়, বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচন্দ্রের মাতা মহারানী বিষ্ণুকুমারী ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট হইতে ভারতচন্দ্রের পৈতৃক ভিটা ভবানীপুরের গড় ও পেড়োর গড় বলপূর্বক দখল করিয়া বহু অর্থ ও অস্বাবর সম্পত্তি লুণ্ঠন করিয়া লন। ইহার জন্ত ভারতচন্দ্রের বর্ধমানরাজবংশের প্রতি আক্রোশ ছিল এবং প্রবাদ যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত বর্ধমানপতির মনান্তর ছিল। সুতরাং তিনি “বর্ধমানরাজকুলের কলঙ্কহচক এই ইতিহাসের সহিত আপনার সংশ্লব রাখিবার নিমিত্ত নিজ সভাসদ ভারতচন্দ্রকে এই বিষয়ের নুতন ইতিহাস রচনা করিতে অনুরোধ করেন”।^{১২} এই ভাবেই উজ্জয়িনীর পরিবর্তে বর্ধমানের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

(খ) গোবিন্দদাসের স্তম্ভর মাতাপিতাকে না জানাইয়া বিজ্ঞান উদ্দেশ্যে পদব্রজে গোড়দেশে যাত্রা করিলেন—দুর্গম পথ, বন, নদী, গিরি প্রভৃতি কালীমন্ত্র জপিতে জপিতে অতিক্রম করিয়া ছয় মাসে ‘বীরসিংহদেশে’ উপস্থিত হইলেন।

কৃষ্ণরামের কাব্য বর্তমান অবস্থায় এই প্রসঙ্গ হইতে আরম্ভ হইয়াছে—

“স্তম্ভর স্তম্ভর নাম রাজার নন্দন।

পুঞ্জিয়া পরমদেবী করিল গমন ॥

স্বপনে শিবার কথা সভ্যমনে লয়ে।

পাইবে রমণীমণি আনন্দ হৃদয়ে ॥

জনকেরে না বলিল না জানে জননী।

একাকী করিল গতি কবিশিরোমণি ॥

(৬) *The Long lost Sanskrit Vidyasundar*—Proceedings of the Second Oriental Conference, pp. 215-220.

(৭) পরিশিষ্টে তুলনামূলক তালিকা দ্রষ্টব্য।

(৮) ‘কবিরঞ্জনর কাব্যসংগ্রহে’ ত্রীনন্দলাল দত্ত, পৃ. ১৬০।

রামপ্রসাদও তাঁহার কাব্যের এই প্রসঙ্গ অম্লরূপ ভাবেই আরম্ভ করিয়াছেন—

“অপ্পে শৈলভূতা আক্সা সত্য মনে বাসি ।

জায়া হেতু যোগে যাত্রা করে গুণরাশি ॥

বিহগপত্র আত্মাণ লইয়া গুণধাম ।

মনোবাছা পূর্ণহেতু অপ্পে হুর্গানাম ॥”

কিন্তু সুন্দর পিতামাতাকে জুকাইয়া বিজ্ঞা অশ্বেষণে যাত্রা করিয়াছিলেন কি না, রামপ্রসাদ তাহা বলেন নাই ।

ভারতচন্দ্র সংক্ষেপে ‘বিজ্ঞাসুন্দর কথারম্ভ’ প্রসঙ্গে নায়ক নায়িকার পরিচয় ও ভাটের বিজ্ঞার পাত্র অশ্বেষণে বীরসিংহের সভায় আগমনের কথা বলিয়া দ্বিতীয় প্রসঙ্গে সুন্দরের বর্ধমানযাত্রা বর্ণনা করিয়াছেন । তিনি দেবীর স্বপ্নাদেশের পরিবর্তে আকাশবাণীর উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিতেছেন—“জনক জননী ভয়ে ভাটে না জানায় ।” ভারতচন্দ্রের সুন্দর নিভাস্ত একাকী যাত্রা করেন নাই—পিত্তর সহ পড়াশুককে সঙ্গে লইয়াছিলেন । এই শুককে সুন্দর pet হিসাবে লইয়াছিলেন, আর কোন উদ্দেশ্য ছিল না ।

বলরামের সুন্দর কালীকে পূজা করিলে দেবী যখন বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন, তখন সুন্দর ‘নিভূতে বিজ্ঞার দর্শন’ পাইবার জন্য বর প্রার্থনা করেন । এবং বলেন—‘একেসা যাইব আমি দেশ দেশান্তর’ । উত্তরে—

“হাসিয়া বলেন কালী তনহু হুয়ার ।

স্বরূপ করিলে দেখা পাইবে আমার ॥

লহ যোর নিদর্শন জুয়া করি হাথে ।

কথার দোসর পুত্র হব তোর সাথে ॥

সর্ব শাস্ত্র জানে জুয়া বিচারে পণ্ডিত ।

প্রেমালাপে জুয়া সনে পাবে বড় প্রীত ॥”

এইখানে বলরাম শুককে সঙ্গে লইবার একটা যুক্তি খাড়া করিয়াছিলেন । এই শুক তাঁহার পোষা শুক নহে । কারণ, শুক বিজ্ঞাকে বলিতেছে—“সমস্ত সংসার ভ্রমণ করিয়া অবশেষে মানিলা নগরে গুণসাগরের পুত্র সুন্দরকে দেখিলাম তাহার মত রূপবান ও সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত আর কাহাকেও দেখিলাম না ।” এই শুককে দিয়া কবি বিজ্ঞাসুন্দরের মধ্যে দৌত্য করাইয়াছেন । কিন্তু বিজ্ঞার এই ব্যবহারের সহিত পরবর্তী ব্যবহারের মোটেই মিল নাই, শুককে যে উদ্দেশ্যে দেবী সঙ্গে দিয়াছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ নাই এবং বর্ধমান প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যে শুকের অস্তিত্ব বিলোপ হইয়াছে । এই শুককে যে বলরাম ভারতচন্দ্রের নিকট ধার লইয়াছেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।

কুকরাম ও রামপ্রসাদ সুন্দরকে দেবীর মায়ার স্ট্রট গভীর অরণ্য ও বেগবতী নদী পার করাইয়াছেন । ভারতচন্দ্র এই সকল মধ্যযুগস্থলত দৈবী মায়ার অবতারণা করেন নাই সরাসর বেগবানু অর্থে নায়ক সুন্দরকে “কাঞ্চীপুর বর্দ্ধমান হুঁমাসের পথ” ছয় দিনে পৌছাইয়া

দিয়াছেন। কৃষ্ণরাম দশ দিনে পাঁচ মাসের পথ এবং রামপ্রসাদ ঐ সময়ে ছয় মাসের পথ অতিক্রম করাইয়াছেন। অশ্বের বা অশ্বরোহীর কৃতিত্বের কথা কিছুই বলেন নাই। কিন্তু অপেক্ষাকৃত বাস্তববাদী ভারতচন্দ্র বলিতেছেন—“সোয়ারির অশ্ব আনে গমনে বাতাস” এবং

“অশ্বের শিক্ষায় নল বিপক্ষে অনল।

চলিল কুমার খেন কুমার অটল ॥

তীর তারা উদ্ভা বায়ু শীত্ৰগামী যেন।

বেগ শিথিবারে বেগে সঙ্গে যাবে কেবা ॥”

এইখানে লক্ষ্য করিবার বিষয়, গোবিন্দদাস জ্ঞানরকে পদব্রজে ছয় মাসে বীরসিংহের নগরে লইয়া গিয়াছেন, কোনরূপ দৈবী মায়া বা অশ্বের কৌশলের অবতারণা করেন নাই। এই দীর্ঘ পথ সংক্ষেপ করিয়াছেন সম্ভবতঃ প্রথমে কৃষ্ণরাম। তাহার কারণ, মাধব ভাটের ফিরিবার পূর্বেই জ্ঞানরের বিজ্ঞানসমাগম সমাপ্ত করা আবশ্যক। গোবিন্দদাসের ভাট তো জ্ঞানরকে সংবাদ দিয়াই অজ্ঞাত দেশে গমন করিয়াছিল, সুতরাং তাহার জ্ঞানরের পক্ষে এই অহেতুকী শীত্ৰতার আবশ্যক ছিল না।

বলরামের জ্ঞানরের পিত্রালয় উৎকলদেশে অথচ তিনি জ্ঞানরকে বুঝদা হইয়া পুরী দর্শন করাইলেন, যুধিষ্ঠিরের মায়া সরোবরে লইয়া গেলেন, পরে বিষ্ণুপুর হইয়া বর্ষমানে প্রবেশ করাইলেন, এই প্রসঙ্গে খানিকটা অগম্য মাহাত্ম্য ও মহাত্ম্য হইতে পাণ্ডবদের কাহিনী শুনাইয়াছেন। কত দিনে যে জ্ঞানর স্বদেশ হইতে বর্ষমানে পৌঁছিলেন, তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই।* বিজ্ঞ রাধাকান্ত লিখিতেছেন—

“মজায়া মানস মন্ত চরণ মায়ের ॥

খিধা তৃষ্ণা শ্রম নাহি জানয়ে পথের ॥

আপন নগর হৈতে ক্রমে পঞ্চ মাসে।

উত্তরিল বীরসিংহ নৃপতির দেশে ॥”

সুতরাং রাধাকান্তও গোবিন্দদাসের মত পদব্রজে সাধারণ ভাবে জ্ঞানরকে পাঁচ মাসে লইয়া গিয়াছেন, কোন দৈবী মায়ার অবতারণা করেন নাই।

(গ) কৃষ্ণরাম বীরসিংহ দেশের ভ্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার চোখের সম্মুখে মোগলযুগের কোন শহরকে আদর্শ রাখিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুরাজার রাজধানীর কোন চিহ্নই ইহাতে নাই। বীরসিংহের রাজধানী—

(৯) বল্লভ চিন্তাধর চক্রবর্তী বলরামকে পূর্ববঙ্গবাসী ও তাত্ত্বিক সাধক বলিয়াছেন। আমরা মনে করি, এই দুই বিষয়েই তিনি ভ্রান্ত। বিজ্ঞানর কাব্য রচনাই বলরামের উদ্দেশ্য, কালীমাহাত্ম্য প্রচার মতে। কাব্যে দেবদেবীর বন্দনার অগম্যমাহাত্ম্য প্রচারে, গীতগোবিন্দে ম্লোকোচ্চায়ে এবং নিজেস্ব ও পিতার নামে তাঁহাকে তাত্ত্বিক সাধক বলিয়া প্রমাণ করে না। বলরামের বিশেষ কোম দেবতায় প্রতি আকর্ষণ ছিল না বলিয়া মনে হয় এবং তিনি যে পূর্ববঙ্গবাসী নহেন, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট হেতু আছে।

“রাজ্য জুড়ি গড়খাই বাশেও না পাই ঠাঞ্জি
বাইচে ফিরান যায় কোশা।”

কৃষ্ণরাম একটি মাত্র গড়ের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র সেখানে ছয়টি গড়ের বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহা যে যোগলযুগের শেষ ও কোম্পানীর রাজত্বের পূর্বের কোন শহর, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়—

“প্রথম গড়েতে কোলাপোষের নিবাস।

ইন্দ্রেরাজ ওলন্দাজ ফিরিদি ফরাস ॥

দিনামার এলেমান করে গোলন্দাজী।

সফরিয়া নানা জব্য আনয়ে জাহাজী ॥”

রামপ্রসাদের বর্ণনায় কৃষ্ণরাম ও ভারতচন্দ্র উভয়েরই স্পষ্ট ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। রামপ্রসাদ সাতটি গড়ের উল্লেখ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের ছয় পৃথক বর্ণনা করেন নাই। তবে দ্বৈষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলে যে বিষ ভারত চীন প্রভৃতি প্রাচ্য দেশে ইংরেজগণ পরিবেষণ করিতে আরম্ভ করেন, তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

“আফিঙ্গে হামেশামস্ত হ’সিয়ার দরবস্ত
খুরে আঁখি কুমারের চাকী”

এবং বাঙালী রাজার পশ্চিমা প্রহরীকে দিয়া বাঙালীকে গালি দেওয়াইয়া নবাবী আমলের চিত্র বর্ণনা করিয়াছেন—

“ওরে বহিনা ভুরজারি এসসা রে খন্তরা গারি
বাঙালিরে দেখে যেন ভেড়া।”

দ্বিজ রাধাকান্ত পূর্ববর্তী কবিগণের পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিয়া একটা পুরী বর্ণনা করিয়াছেন এবং সুবরাজ বিজয়সিংহের সভাবর্ণন করিয়া নূতন করিয়াছেন। এই বর্ণনায় কবিত্ব নাই, কেবল অমুপ্রাসের ঘটা আছে।

বলরাম পুরী বর্ণনা করেনই নাই, শুককে দূত করিয়া পাঠাইয়া সংক্ষেপে কার্য সারিয়াছেন। এ বিষয়ে নৈষধচরিত্ত তাঁহার কল্পনার খোরাক যোগাইয়াছে।

(ঘ) জ্ঞানরের সহিত কোতোয়ালের প্রথম দর্শন কৃষ্ণরাম এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

“সহর জমিছে তথা বাঘাই কোটাল (র)।

খোরাসানি খঞ্জর কোয়রে খরবার ॥

করিবর উপরে আয়ারি মাঝে বসি।

সমুখে কামান তীর ধরি রাশি রাশি ॥

পাকাইয়া নয়ান বাহার পানে চায়।

চমকে অমনি তম্ব তরাসে কাঁপায় ॥

কালাগায়ে হেমহাব গলে অভিরাম ।
 পর্বত শিখরে যেন কর্ণিকার দাম ॥
 চাপদাড়ি প্রসন্ন বদনে ছেন বাসি ।
 রাহু যেন পরাসিল এক ভাগ শশী ॥
 দুই গৌর পরিপাটি যেন সে কলঙ্ক ।
 মোচড়িয়া লীলায় গরবে কাঁপে অঙ্গ ॥
 চৌদিশ ঘেরিয়া ঘোড় সোয়ারের রেলা ।
 রজপুত বলবান উজ্জবগ রহেলা ॥
 শিলা কাড়া করতাল চৌষড়ি ঘোড়ায় ।
 বারবধু বার সাথে স্রমিয়া বেড়ায় ॥
 তাহা দেখি মনে করে রাজার নন্দন ।
 পশ্চাতে বুঝিব ভায়া চতুর কেমন ॥”

রামপ্রসাদের বর্ণনা কৃষ্ণরামের যে ছায়া, তাহা পড়িলেই বুঝা যায়—

“হাস্তির আমারি পিঠে বাঘাই কোটাল ।
 শমন সমান দর্প দুই চক্ষু লাল ॥
 চৌপৌফা স্রজাই দাড়ি খুলিয়াছে ভাল ।
 সফেদ পোষাক পরা কলেবর কাল ॥
 রক্ত চন্দনের কোঁটা বিরাজিত ভাল ।
 পূর্বদিক প্রকাশ যেমত উষাকালে ॥
 * * * * *
 নকিব ফুকারে সদা হাজারির ভূর ।
 সহরে সোরৎ পড়ে, যায় বাহাছুর ॥
 স্তম্ভর হাসেন মনে, থাক দিন রাত ।
 পাছে যাবে বুঝাপড়া বাহাছুরি যত ॥

ভারতচন্দ্র কোটালের রূপের বিশেষ বর্ণনা করেন নাই, তাহার শাসনের কঠোরতার পরিচয় দিয়াছেন—

“কোটালের ভয়ে কেহ নাহি করে দয়া ।
 দেখিয়া স্তম্ভর ভয়ে ভাবেন অভয়া ॥”

কোটালকে দেখিয়া ভারতচন্দ্রের স্তম্ভর ভীত হইয়াছিলেন। গোপনে রাজকন্ডার প্রণয়প্রার্থী বিদেশী রাজকুমারের পক্ষে ইহা অধিকতর শোভন হইয়াছে।

গোবিন্দদাস বা বলরাম স্তম্ভরের সহিত পুর্বে প্রবেশকালে কোটালের সাক্ষাতের কথা লিখেন নাই। রাধাকান্ত বিদেশী প্রহরীযুগের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কোটালের কথা লিখেন নাই। রাধাকান্ত এইখানে একটু বৈশিষ্ট্য করিয়াছেন—পড়ের মধ্যে প্রবেশ

করাইয়া ক্রমশঃ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মহলে দেওয়ান-খানায় অপরাধিগণের বিচার ও শাস্তির দৃষ্ট দেখাইয়া চতুর্থ মহলে রাজকুমার বিজয়সিংহের সভায় লইয়া গিয়াছেন। রাজকুমার বিলাসী যুবক বহু পণ্ডপক্ষী পালন করেন, সর্বদা খোসগন্ধে কাগ কাটান, আমিরি নজর, গীত নাট্যে মসগল। তাহার পর সুন্দর রাজসভায় গিয়া রাজার নিকট গিয়া পরিচয় দিলেন—তিনি রত্নাবতী নগরের গুণাসিদ্ধ রায়ের সভাসদ, বিভাসুখ অভিলাষে বিশেষে আসিয়াছেন। রাজা তাঁহাকে আশীর্বাদ করিলেন।

“যে বিভা ভ্রমণ করি না পায় সংসারে।

অনার্যাসে হেন বিভা লভিবে তোমারে ॥”

তাহার পর রাজপদে প্রণাম করিয়া পুরী হইতে বাহির হইলেন।

(ঙ) কোটালের স্থান অতিক্রম কবিয়া সুন্দর সরোবরতীরে উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দদাস তাঁহাকে বীরসিংহদেয়ে প্রবেশ করাইয়াই কদম্বতরুতলে উপবেশন করাইয়াছেন, সরোবরের উজ্জ্বল করেন নাই। কৃষ্ণরাম তাঁহাকে দিব্যসরোবরতীরে কদম্বতলে রত্নবেদীর উপর ‘ষট্চাঁদের’ মত বসাইয়াছেন। ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সুন্দর বসিলেন বকুলতলায়। কৃষ্ণরাম বর্মসিদ্ধতরু রাজকুমারকে দেখিয়াই নগর-কামিনীগণের

“অবশ শরীর হৃদয় অস্থির
খসি পড়ে কাঁখে কুন্ত ॥”

বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, সরোবরে সুন্দরের স্নানের কথা লিখেন নাই। রামপ্রসাদের সুন্দরও সরোবরে স্নান করেন নাই, কিন্তু ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

“ফুলজ জলজ ফুল প্রফুল্ল তুলিলা।
স্নান করি শিবশিবা চরণ পূজিলা ॥
সন্মুখে দাড়িম ছিল ভাঙ্গিয়া কৌতুকে।
আপনি খাইলা কিছু কিছু দিলা তুকে ॥
করে লয়ে এক পদ্ম লইলেন ঘ্রাণ।
এই ছলে ফুলধনু হানে ফুলবাণ ॥
আকুল হইয়া বৈসে বকুলের-মূলে।
বিগুণ আগুন জ্বালে বকুলের ফুলে ॥
হেন কালে নগরিয়া অনেক নাগরী।
স্নান করিবারে খাইলা স্নেহে সহচরী ॥
সুন্দরে দেখিয়া পড়ে কড়সী খসিয়া।”

বলরাম লিখিয়াছেন—

“বেলা হৈল অবসান দেখি বালা রম্য স্থান
বসিল কদম্ব-তরু-তলে।

হেন কালে যত নারী কাখে তারা কুন্তকরি
 জল আনিবার তরে চলে ॥
 তরুণে পড়ে আঁধি মনোহর রূপ দেখি
 মুরছিত যতেক রমণী ।
 সে রূপ লিখিতে নয় সতে পরস্পরে কয়
 বলরাম কহে শুদ্ধ বাণী ॥”

বলরাম সরোবর বর্ণনা করিয়াছেন। তবে স্নানরত্নের স্নানের কথা লেখেন নাই এবং অতি আশ্চর্যের বিষয়, বর্ধমান প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিয়ত সঙ্গী স্নান বা গুপ্তপক্ষী অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

বিজ্ঞ রাধাকান্ত লিখিতেছেন, স্নানরত্ন রাজসভা হইতে বাহির হইয়া সরোবরতীরে যাইতেছেন, তখন অট্টালিকাসমূহ হইতে নগর-কামিনীগণ রূপবান্ স্নানরত্নকে দেখিয়া মোহিত হইল। এইখানে নারীগণের ‘বিভ্রম’-এর এক বর্ণনা করিয়াছেন।—

“কেহ বলে কলক কিসের কুলবতী ।
 হাইল হস্তারা সব অবজিত গতি ॥
 রহিল কাহার করে কঙ্কলের লতা ।
 কেহ ধায় এক পায় পরিয়া আলতা ॥
 সীমন্তে শিমূর গেল সজ্জ কর্ণকটি ।
 চলিল যুবতীযুত কেশ বেশ তেজি ॥
 অবিরত তারাপরা তরুণী প্রচুর ।
 নুপুর ভরমে পদে পড়িল কেয়ুর ॥
 কঙ্কণ ভরমে পদে পরে খুলি খুলি ।
 মস্তকে কাঁচুলী তুলি দিল বক্ষবুলি ॥
 অঞ্চলে বন্ধন দেয় বলিয়া চিকুর ।
 না মানিল সুরজন তেজি নিজ পুং ॥

এই সকল যুবতীগণের চিত্তবিকারের বর্ণনা কবি করিয়াছেন। তাহার পর সরোবরে তরুণে স্নানর উপবেশন করিলে আব একদফা জলার্থিনী কামিনীগণ কতৃক স্নানরত্নকে দেখিয়া চিত্তচাক্ষুর্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

কৃষ্ণরাম কুলবতীগণকে কামোন্মত্তা করেন নাই, কেবল তাহাদের চিত্তচাক্ষুর্যের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন এবং ছদ্মবেশী রাজকুমার স্নানরত্নকে তাহারা ছদ্মবেশী দেবতা বলিয়াই মনে করিয়াছিল, তাহাই বলিতে চাহিয়াছেন। বলরামও এখানে কৃষ্ণরামের হুবহু অনুসরণ করিয়াছেন এবং “না রহে কাহার কাখে কুন্ত পড়ে খসি” এই উক্তি দ্বারা কৃষ্ণরামের কাব্যের অনুকরণের প্রমাণ দিয়াছেন।

ভারতচন্দ্রের নগর-নাগরীগণ কোন কল্পনার আশ্রয় লয় নাই, তাহারা মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য-মূলত নারীগণের মতই রূপবান্ যুবাকে দেখিয়া পত্ন্যস্তরে কামোদিত হইয়া উঠিয়াছিল। কবির লেখনীতে এই চিত্র অপূর্ব ক্ষুটিয়া উঠিয়াছে—

“দেখিয়া সুন্দর রূপে মনোহর
স্বরে অরঙ্গর যত রমণী ।

কবরী ভূষণ কাঁচুলী কষণ
কটির বসন খসে অমনি ॥

বলিতে না পারে দেখাইয়া ঠারে
এ বলে উহারে দেখ লো সহ ।

মদন জালায় মরম গলায়
বকুল তলায় বসিয়া অহি ॥

আহা মরে যাই লইয়া বালাই
কুলে দিয়া ছাই ভজি ইহারে ।

যোগিনী হইয়া ইহারে লইয়া
যাই পলাইয়া সাগর পারে ॥

কহে একজন লয় মোর মন
এ নবরতন ভুবন মাঝে ।

বিরহে জালিয়া সোহাগে গালিয়া
হারে মিলাইয়া পড়িলে সাজে ॥

আর জন কয় এই মহাশয়
চাপা ফুলময় ধোঁপায় রাখি ।

হলদী জিনিয়া তলু চিকনিয়া
স্নেহেতে ছানিয়া কলসে মাখি ॥

ধিক্ বিধাতায় হেন যুবরায়
না দিল আমায় দিবেক কারে ।

এই চিতগামী হবে যার স্বামী
দাসী হয়ে আমি সেবিব তারে ॥

মরে গিয়া আর দেখিব কি ছার
মিছার সংসার ভাতার জরা ।

সতিনী বাধিনী শাক্তী রাগিনী
নন্দী নাগিনী বিষের ভরা ॥

সেই ভাগ্যবতী এই বার পতি
অশ্রুে ভুঞ্জে রতি মন আবেশে ।

এ মুখ চুখন করয়ে যখন
 না জানি তখন কি করে শেষে ॥
 রতি মহোৎসবে এ করপল্লবে
 কুচঘট যবে শোভিত হবে ।
 কেমন করিয়া ধৈর্য্য ধরিয়া
 শুভানে মরিয়া শুভান রবে ॥
 ছেন লয় চিতে রতি বিপরীতে
 সাধিতে পারিতে ভর না সছে ।
 হৃদয়ে মিলিত হৃদয়ে রচিত
 এই সে উচিত ভারত কহে ॥”

রামপ্রসাদও ভারতচন্দ্রের অনুকরণে ললিত স্ত্রীপদী ছন্দেই এই উক্তি বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে এমন কাব্য ছটিয়া উঠে নাই—অনুকরণের জড়তা তাহার কবিত্বকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে, বরং স্থানে স্থানে কবিত্ব অভাবে কাব্য অশ্লীল হইয়া উঠিয়াছে—

“কেহ কহে আজি ওকে করে রাজী
 শেষে দিয়া বাজী না দিব ছেড়ে ।
 শান্ত্রী শান্ত্রী নাহি পতি দূর
 শূন্য ঘোর পূর কে দিবে তেড়ে ॥
 কহে কোন নারী হয় আত্মাকারী
 ভুলাইতে পারি এ গুণ আছে ।
 বিষবা যেগুলি বিষম ব্যাকুল
 চক্ষে দিয়া ধূলা লবে গো পাছে ॥”

রামপ্রসাদ অধিকন্তু নাগরীগণের রূপবর্ণনা করিয়া এবং তাহার পর তাহাদের মুখ দিয়া সুলভরকে যে দেবতা বলিয়া ভ্রম করার কথা বলাইয়াছেন, তাহা কুরুমেরই প্রভাব । দ্বিজ রাধাকান্ত লিখিয়াছেন, যাঁতে জল আনিতে গিয়া নগরকামিনীগণ কুমারকে দেখিয়া প্রথমে কোন দেবতা বলিয়া ভ্রম করিয়া বিতর্ক করিতেছিল । এই বিষয় বর্ণনায় কবি কিছু কবিত্ব দেখাইয়াছেন । তাহার পর রাধাকান্ত নারীগণের চিন্তাচঞ্চল্য বর্ণনা করিয়াছেন ।

(ক্রমশঃ)

মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত

কিছু দিন হইল, চকদীঘির ‘রাচ প্রত্নাগাব’ হইতে একটি স্তব্ধ মঙ্গলকাব্যের পুঁথি আমাদের হাতে আসিয়াছে। পুঁথিটি ‘বিশাললোচনী বা বিশালাক্ষীর গীত’। ভণিতাগুলি হইতে সহজেই গ্রন্থকাবের নাম পাওয়া যায়—শ্রীমুকুন্দ কবিচন্দ্র। পুঁথিটির লিপি ও কাগজ দেখিয়া জ্ঞান বলিয়া মনে হয় না, পত্রসংখ্যা ১২৪ এবং পুঁথিটি অখণ্ডিত। শেষ পৃষ্ঠায় লিপিকরের পরিচয় আছে—“স্বাক্ষরমিদং শ্রীকিশোরদাসমিত্রস্ত যোকাম সাং আমুরিয়া পরগনে মণ্ডলবাট আমল শ্রীযুত(২) মহারাজ কিস্তীচন্দ্র রায় মহাসয় সন ১১৪২ সাল তারিখ ৩০ কার্তিক ॥”

পুঁথিটির পঞ্চম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় এই ভাবে রচনাকাল ও গ্রন্থকাবের পরিচয় আছে,—

“সাকে রব রথ বেদ সমাঙ্ক গণিতে।

বাস্তুলীমঙ্গল গীত হৈল সেই হইতে ॥

* * *

বিপ্রকুলে জন্ম পিতামহ দেবরাজ।

পিতা বিকর্তন মিশ্র বিদিত সমাব ॥

শ্রীযুত মুকুন্দ হারাবতির নন্দন।

পাচালি প্রবন্ধে করে ত্রিপুরা স্বরণ ॥”

পুঁথির অন্ত্যন্ত অংশ হইতে জানা যায়, কবি তাঁহার ধ্বন্যভাষ্য গদাধর পণ্ডিতের যথোচিত শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার তিন পুত্র ছিল—রমানাথ, চন্দ্রশেখর ও সনাতন। গ্রন্থ রচনার তাবিথের পংক্তি দুইটির সহিত মুকুন্দরাম কবিকর্ণগের ‘চণ্ডী’ বা অভয়ামঙ্গলের রচনাকালের অল্পত সাদৃশ্য দেখা যায়—

“শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।

কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা ॥”

বঙ্গবাসি-সংস্করণে লিখিত আছে—“গ্রন্থরচনার শক নিরূপণ প্রভৃতি শেষের কয়েকটি বিষয় হস্তলিখিত পুঁথিতে পাওয়া যায় না, কেবল মাত্র মুদ্রিত পুস্তকে আছে।”

এ ক্ষেত্রে এই পংক্তি দুইটি প্রকৃত মুকুন্দরামের চণ্ডীর কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বঙ্গবাসি-সংস্করণের মুকুন্দরামের চণ্ডীর ঐ শ্লোক দুইটি হইতে রচনাকাল স্থির করা হইয়াছে ১৪৯৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। বর্তমান পুঁথিতে যে সংখ্যাসূচক শব্দগুলি আছে, তাহা হইতেছে রস, রথ, বেদ ও শশাঙ্ক। চণ্ডীর পাঠের ‘রস রস বেদ শশাঙ্ক’কে ৯,৯,৪,১, এবং ‘অক্স বান্য গতি’ ধরিয়া ১৪৯৯ করা হইয়াছে। এ ক্ষেত্রে রস ও রথ শব্দ আছে। ‘রথ’ শব্দের অর্থ যদি চরণ ধরা যায়, তাহা হইলে ২ সংখ্যা ধরিতে হয়। কাজেই তারিখ হয় ১৪৯৯ শক বা ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দ। আর যদি লিপিকরপ্রমাদবশে

‘রস’ ‘রথ’এ পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উভয় গ্রন্থের রচনাকাল একই বৎসর বলিতে হয়।

একটি বৈশিষ্ট্য এই পুঁথিতে দেখা যায় যে, ইহাতে চৈতন্যদেবকে বন্দনা করা হয় নাই, অথচ মুকুন্দরাম বিশেষ করিয়া শ্রীচৈতন্যবন্দনা করিয়াছেন। মুকুন্দরাম মানসিংহের গোড়-বল-উৎকল শাসনকালে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আকবরের মৃত্যু হইয়াছিল ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে। সেই সময়ে মানসিংহ বাংলার শাসনকর্তা ছিলেন। সুতরাং ১৫৭৭ খ্রীষ্টাব্দে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর রচনাকাল হইতে পারে না। ঐ পংক্তি দুইটি অক্ষিপ্ত এবং খুব সম্ভবতঃ তাহা বিশাললোচনীর গীতেরই এই পংক্তি দুইটি। কবিচক্ষু চৈতন্যকে দেবতার পর্যায়ে ফেলিতে পারেন নাই। তাহার কারণ, তিনি মাত্র কিছু কাল পূর্বে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন এবং নরস্ব হইতে দেবস্ব প্রাপ্ত হন নাই।

এই কাব্যে অনেক অংশের সহিত মুকুন্দরামের চণ্ডীর সাদৃশ্য আছে, অনেক অংশের ছব্বহ মিল আছে। চণ্ডীর ধনপতি সওদাগরের উপাখ্যানে জ্ঞানাই ওঝার পাত্র নির্বাচন প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

“বর্জ্যমানে ধুস দস্ত যার বংশে সোমদস্ত
মহাকুল বেণ্যার প্রধান।
বাঙালীর প্রতিহৃদী ষাটশ বৎসর বন্দী
বিশালাকী কৈল অপমান।”

এবং ‘কুটুম্বসমাগম’ প্রসঙ্গে—

বর্জ্যমান হইতে বেণে আইসে ধুস দস্ত।

ঘোল শো বেণের মাঝে বাহার মহত্ব ॥

‘জুগুৎসহের ব্যবস্থা’ প্রসঙ্গে ধুস দস্ত ধনপতিকে ‘মাগাইত ভাই’ বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন।

এই ধুস দস্ত হইতেছে বর্তমান কাব্যের প্রধান উপাখ্যানের নায়ক। আমরা এখন এই কাব্য সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আলোচনা করিব না। তবে এই কথা বলিতে চাহি যে, কাব্যটি আত্মোপাস্ত পাঠে ইহাকে মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী বলিয়া মনে হয়।

শ্রীযুত শুভেন্দু সিংহ রায় ও শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই উভয়ের চেষ্টায় কাব্যটি প্রকাশিত হইতেছে। ইহার বহু পরিশ্রম করিয়া ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। ইতি—

পত্রিকাধ্যক্ষ।

(১) (১) নম শ্রীশ্রীদুর্গাঐ নম ॥

মঙ্গল রাগ ॥০॥

খল (১) রেণু শুচাইয়া যুবতি রসবতি ।
 সরস গোময় বসে স্থান কৈল স্নিগ্ধি ॥
 স্নগন্ধি চন্দন রসে রচিল দেহালি ।
 আরোপিল খেতধাত্ত হেমঘট বারি ॥
 ঘটে ছ্যাত ডাল দিল কঠে ফুলমাল ।
 স্থাপিল কুঞ্জরমুখ দেবির কুমার ॥
 জত দেবতাব তথি হয় অধিষ্ঠান ।
 মুসিকবাহন দেব দেবের প্রধান ॥
 স্নগন্ধি ফুলের ঝারা ধবল বিতান ।
 বাঙ্ছিল ছান্দলা সর্বমঙ্গল নিদান ॥
 জসের পট্টহ সঙ্ঘ বাজে অবিরল ।
 ঘাঘর মূপুর বাজে স্ননাদ মাদল ॥
 স্তুতি করে দ্বিজগণ প্রনব প্রথমে ।
 আরম্ভে দেবতা পূজা নাএক কল্যাণে ॥
 যুবতি সকল মেলি দেহে ছলাছলি ।
 আনিল সিন্দূর গন্ধ খই খিরপুলি ॥
 মোদক লড্যাক কলা মধুর শ্রীকল ।
 নারিকেল লবঙ্গ কপূর জাতিফল ॥
 ইন্ধু সসা নারিকেল বিচিত্র তাড়ুল ।
 স্নতস্নবাসিত তথি আতব ততুল ॥
 পানিফল পনস কেসরি খণ্ড দধি ।
 ধূপ ধিপ নৈবেদ্য রচিল অথাবিধি ॥
 দেবতা পূজিয়া সতে করএ প্রনতি ।
 গায়েনে মঙ্গল গায় চণ্ডিপদে মতি ॥
 ভক্ত সেবকে চণ্ডি হয় বরদায় ।
 শ্রীজুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা স্বহাষ ॥০॥

গৌরী রাগ ॥০॥

জপমালাঙ্ঘ্রবপাষ (দণ্ড) ধরি হাথে ।
 ফনিজ হৃদয় মাঝে জ্ঞাতভার মাথে ॥

প্রলম্ব জঠর চাকু ভূজ ত্রিলোচন ।
 শ্রীজন পালন মহাপ্রলয় কারন ॥
 বন্দো দেব গণপতি মুশিকবাহন ।
 বিচিত্র সাহুর্জ চর্ম বিভূতিভূসন ॥
 (২) সিন্দূরে মণ্ডিত গণ্ড কুঞ্জরবদন ।
 মকর কুণ্ডল কর্ণে প্রধুমোচন (১) ॥
 চারি দশ লোকনাথ চপল নিশ্চল ।
 পারিজাতমালা বিভূষিত গণ্ডস্থল ॥
 ব্রহ্মরূপ শনাতন প্রধান ঐশ্বর ।
 দেবের প্রধান পুঙ্খ চরণ কমল ॥
 একানেকা লম্বুগুরু ব্যস্তব্যস্ত তম্বু ।
 ধ্যানেনে না জানে ব্রহ্মা নান্নায়ন স্বাহ ॥
 শ্রবন পবন নিজ শ্রম জল হরা ।
 মধুগন্ধ লোভে মস্ত চপল ভ্রমরা ॥
 কুমতি দহন দক্ষ ভবভয়হারি ।
 নিয়ত দুরিত দুঃখ অগছপকারি ॥
 নব শশী শিরে সোভে সরি শুছান্দ ।
 মদগ্ধবান্দনপর পুনমিক চান্দ ॥
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুঙ্গমতি ।
 শ্রীজুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতি ॥ • ॥

পয়ার ॥ • ॥

নম দেবি ভগবতি নৃমুণ্ডমালিনী ।
 কুমতিনাসিনি স্নগ্ধ সামির্জদাহিনী ॥
 অতুলিত গুণ্ড দ্বকুল কলেবরে ।
 উদিত রুচির সিং সশোভর সিরে ॥
 কুটিল কবরি ভার বচন মধুর ।
 ললাটে চন্দন বেধ সিমন্তে সিন্দূর ॥
 বিলোলিত লকাবলি নয়নে কঙ্কজল ।
 ঝলমল করে কর্ণে মকর কুণ্ডল ॥
 চপল নয়ন মুখ রাকা হিমকর ।
 শ্মিত বিকসিত গণ্ড ইসত পাণ্ডব ॥

দাড়িষ কুণ্ডম জিনি অধর জ্বলয় ।
 যুগল দশন পাঁতি গুঞ্জরে ভয়র ॥
 নাসিকা উপরে সোতে রুচীর মুকুতা ।
 কটি (১) দেশে বউলী গলায় কিয়াপাতা ॥
 অবিরল ছুই কুচ কনক শ্রীকল ।
 মদন ভাণ্ডার নিকেতন মনোহর ॥
 দ্বিভূজে সরল সঙ্ঘ ক্ষাতি (২) হুয়াট্টা ।
 আগে রত্নচুড়ি সোতে কড়ে হেম মাটা ॥
 বিঘাল হৃদয় সোতে অমূল্য কাঁচলী ।
 অভিনব হেমরুচি সম লক্ষ বলী ॥
 ভূষণপরি রত্নতাড় অমূল্য রতন ।
 কটীতে কিঙ্কিনী সোতে চরণে ঝঞ্জন ॥
 হবের ভয়র মাঝা নাতি সরোবর ।
 কনক রুচির কুণ্ড নিতম্ব যুগল ॥
 রামরজা জিনী উরু রূপে নাহি সীমা ।
 ত্রিপুরসুন্দরি গোরি গৌরিম মহিমা ॥
 রত্নের অঙ্গুরি শোভে বায় কর সাধে ।
 ত্রিমুখ পাণ্ডুলি শোভে চরণের আগে ॥
 মরালগামিনি দেবি না চলে প্রচুর ।
 রুহু রুহু বাজে ছুই চরণে ছুপুর ॥
 জীবননাথের কাছে আছ যুত বেশে ।
 সেবকে স্ববণ কবে রঞ্জন দৌরণে ॥
 রাগ মান তাল সঙ্ঘ কিছুই না জানি ।
 আপনার গীতে লোকে রঞ্জাবে আপনি ॥
 তোমার বচন মিথ্য নহে কোন কালে ।
 আপনি কথিলে মোরে বশী কেন্দ্রালে ॥
 জখন করিবে পুত্র গীতের প্রকাশ ।
 সুনিতে আপন গীত তেজিব কৈলাস ॥
 জদি বা প্রভুর সঙ্গে থাকী কুতূহলে ।
 প্রভু সঙ্গে আশীষ ডাকিলে হাথে তালে ॥
 সুনিতে আপন গীত সুরপুরি তেজ ।
 বিসাল লোচনি জয়া লৈয়া মকভুজ (১) ॥
 (৩) সকল সফল রস পরিপূর্ণ জয়া ।
 প্রণত সেবকে কভু না ছাড়িবে দয়া ॥

হাথে তালে ডাঁকে তিন অবনত নর ।
 নাএক আসরে চুর্ণা উরহ সত্তর ॥
 ত্রিপুরে ত্রিপুরা পূজা জয় ২ ধ্বনি ।
 শ্রীজুত মুকুন্দে তনে সুরতোষ বানি ॥৩৥৩৥
 প্রণত সেবকে রক্ষ নারায়নি
 চারিধিক দশ লোকে ।
 জুবি জার ভব কে বলিব জুব
 দেবতা না জানে জাকে ॥
 কামচারি হরি বাহিনী সত্তরি
 মহামায়া মহদরি ।
 জুবি পঙ্কজিনি মঙ্গল গেহিনি
 সুরহর সহচরি ॥
 সহজে চপলা সেবক বৎসলা
 ভাগিরথি ভামুতি ।
 ত্রিভুবনে গতি তুমি ভগবতি
 সন্ততি দাইনী সতি ॥
 তুমি কাল নিশা ক্রপা শক্তি রূপা
 ধোরূপা তবসিনি ।
 বিকট দসনি কয়ালবদনি
 দয়ামই নারায়নি ॥
 অমলা বিমলা কুমতি কমলা
 চতুঃসপ্তি চতুর্কলা ।
 সজ্জিনি শুলিনি রঞ্জিনি রঞ্জিনি
 মানবমন্তকমালা ॥
 তুমি মাহেশ্বরী বাহুজি খেচরি
 দানবদলনি ভিমা ।
 গদিনি খড়্গিনি চাপিনি স্থলীনি
 জার তহু নাহি সিমা ॥
 সিদ্ধ জলদেবী লোক ভয়করী
 নাসিকা দিঘল ধরী ।
 প্রচুর হাসিনী দেবতা জননী
 দুর্গতী নাসিনী দুর্গা ॥

অচলনন্দিনী বিশাললোচনি
তুমি ত্রৈলোক্যের মাতা ।

তোমার চরণ আর নাহি মন
তাহার সকলি বুধা ॥

বাহুলিময়ল সীত আনন্দিত
হৈয়া জেই জন স্ননে ।

তারে সানন্দিত হবে কপালিনী
শ্রীমুখ মুকুন্দ তনে ॥৪৪॥

॥ সুইরাগ ॥

(৩) অধর সুরঙ্গ দল মুখ সসিরগুল
গুলনিত তিলকুল নাসা ।

অতি প্রেমে অভিমুখ নয়ন খঞ্জন যুগ
কলরব কোকিলির ভাসা ॥

ললাটে হুতন চাঁন্দ চিকুর জলধনিন্দ
কনককুণ্ডল শ্রুতি সোভে ।

পিঠে পাট ধোপ লোলে কবরি মালতি মালে
মধুকর ভ্রমে মধুলোভে ॥

নবচন্দ্র শিরোমণি কোলে নগনন্দিনী
কৈলাসে বহিলা কৌতুকে ।

সেবকে অঙ্গরন কবে একভাবে সেবে আরে
চারি অধিক দল লোকে ॥

বিকুঞ্জে সরল সম্ব আগে পাছে অতিরঙ্গ
মনী হেম গঠিত ককন ॥

মুণাল জিনিঞা ভূষণ স্তপক দাড়িধবিজ
বিজিতলে(গ) মুরঙ্গ দমন ॥

গলে গজমতিহার নিল পলে মনীমাল
কুচযুগ সিংখরি বিলোলা ।

আমলে ধবল মিলে কনক পৃথিবিবরে
গঙ্গা জমুনা জলধারা ॥

রক্ততের তাড় হাথে পাণ্ডলি অরুন পদে
কাঁচলি হৃদয় বিসালে ।

অতুলিত স্তলনিত কুমিস্ত্রের বিরচিত
স্বকল্প মদন কলেবরে ॥

তাঘূলে মুখ রঞ্জে মাঝায় কেসরি গঞ্জে
কুন্দকুম্ম নাম হাঙ্গে ।

কনক চম্পক ছবি ললাটে উদিত রবি
সিন্দূরে তিমির বিনাসে ॥

নাতি গভির সর উরু জিনি করিকর
মহুর গতি গজরাঞ্জে ।

মুখরিত কিঙ্কিনি কটিদেশে স্তম্বনি
রক্ত মূগুর পদে বাঞ্জে ॥

ক্রহি কামধনুসর কটাক্ষে জীবন হর
জয়ন্ত কৃত প্রাননাথে ।

সেবিয়া সারদা পদ আনন্দেজনক গিত
বিরচএ মুকুন্দ পণ্ডিতে ॥৪৫॥

॥ সুইরাগ ॥

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেবরাজ পুরন্দর
সদয় হৃদয় সাক্ষরি ।

(৪ক) বরুন পবন জয় রবি সসি হুতাসন
নাটে গিতে তে(গি)জ সুরপুরি ॥

কিন্নরা কিন্নরি পায় গনেসে মুদঙ্গ বার
একতালে নাচে বিস্তাধরি ।

জগতিমণ্ডল মাঝে ছান্দলা বাঙ্কিয়া গুঞ্জে
জগজনে জানিঞা ইষরি ॥

উর চণ্ডি ভগবতি আনন্দে পুণ্ডিতমতি
প্রণত সেবকে দিতে বর ।

মুদঙ্গ সঙ্গীত নারী গায়নে হুড়িল গিত
তেজ চণ্ডি দেবতা নগর ॥

গলে নরশিরোমালা শিরে সোভে সশিকলা
প্রোভাসনে রন্ধিনী বাহুলী ।

কর্প প্রথর কাতি উজ্জল দশন জ্যোতি
ত্রিভুবনে তুমি ক্ষেমধরি ॥

সড়ঙ্গ মঙ্গল ধূপ বিবিধ নৈবেদ্য ধিপ
নায়েকে রচিল পূজাবিধি ।

বিসালাক্ষি শশীমুখি সংহতি করিয়া সখি
ভননা কদলা সরস্বতি ॥

বিরিক্তি প্রকৃত্তী জন্ত দেবতা না জানে তব্ব
 নাম জয়া অন্তরঙ্গলনী ।
 শুন তিন বিভাবীনি আদি অস্ত্র নাহি জানি
 অশেষ বিশেষ মায়াবিনী ॥
 কুমতিনাসিনি সুখ সামির্দদাইনী হুঃখ
 ভবভয় ছুরিত হারিনী ।
 অজোনিসত্ত্বা শতী শিবসক্তি অগদাদি
 শ্রীজন পালন সংহারিনী ॥
 তুমি নগনন্দিনী শূল চক্র সন্ধানী
 গদিনি ঞ্জিনী ঘোররূপা ।
 ললাটে ফলকে জার বিধি লিখে ছুরাচার
 বিপরিত তব কর রূপা ॥
 যে তোমার পদ সেবে অভিমত কর্ম লভে
 ক্ষিতি তার জনম সফল ।
 (৪) চণ্ডিপদ সরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজ
 বিরচএ সরস মঙ্গল ॥ ৩ ॥ ৬

॥ পরায় ॥

মঙ্গলকারিনী জয়া বিপত্যানাশিনী ।
 মহা মায়াবিনী মধুকৈটভ্যাতিনী ॥
 সক্তিরূপা নিরুপারূপিনীষরি দেবি ।
 জাহার প্রসাদে মুখজন মহাকবি ॥
 তার পাদপদ্ম বন্দো সেবিয়া সতত ।
 প্রজাপতি বন্দো শ্বেত বিহঙ্গমরথ ॥
 শঙ্খচক্র গদাপদ্ম বিভূষিত করা
 বিহঙ্গনাথের নাথ বন্দো দ্বাঘোদর ॥
 ভূজগ পট্ট কর বিসাল লগুড় ।
 ব্রসব বাহনে প্রানমহো সশিচুড় ॥
 সিঙ্গুরে মণ্ডিত গণ্ড কুঞ্জরবদন ।
 বন্দো গজমুখ নিজলোহিত সোচন ॥
 সরবনভব দেব ময়ূর বাহন ।
 পূর্ণহৃদাকর মুখ বন্দো সড়ানন ॥
 দিবসাদিপতি শুভ বন্দো জয়রাট ।
 মোক্ষহাল কৈলে মাতা রাজবল্লাহাট ॥

সকল বিফল তার অভক্ত চণ্ডিরে ।
 সুরাসুর নর স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে ॥
 হেম হৈম বিরচিত দেউল বিগল ।
 জথা দেবি বৈসে সর্বদেবতাবতার ॥
 বন্দো বিসালাক্ষি দেবি গলে মুগ্ধমাল ।
 ডাহিনে বন্দিলু নন্দি বামে মহাকাল ॥
 সমুখে ডামরসাই বির হুহমান ।
 ক্ষেত্র জাটবট্টাট্ট বন্দো বলদাম ॥
 ঐরাবতারুচ সচিনাথ পুরন্দর ।
 ত্রিদেব নগরপতি সচির ইন্দর ॥
 জার কঠে পারিজাত মালা জামুগতা ।
 রাত্রিদিবা সন্ধ্যাকালে (৫ক) নহে মলিনতা ॥
 মেরুপ্রদক্ষিণে অবিরত পরকাসি ।
 কমল কুমুদবজ্র বন্দো রবিসসি ॥
 তাঁর পাদপদ্ম বন্দো জোড় করি কর ।
 কেবল ভরোসা চুর্ণা চরণকমল ॥
 ভকততারন দিন রজনীর নাথ ।
 বিহগনাথে জেঠ সুরভুতাজাত ॥
 প্রানমহো তাঁর পদকমল যুগল ।
 কেবল কুর্পর জার প্রথিমিগুণ ॥
 পক্ষে জার বৈশে বিষ্ণু অমিত চরিত্র ।
 পুষ্পমধ্যে প্রানমহো পরম পবিত্র ॥
 গলিত তুলসিলাভ ভঞ্জে জেই জন ।
 অচিয়াতে হয় স্বর্গ মর্ত্তের ভাজন ॥
 উদয় পর্বত গিরি হেম হিমাচল ।
 বন্দিলু নিবসে জথা দেবতা সকল ॥
 দসরথ নুপুণ্ড শ্রীরাম লক্ষ্মণ ।
 ভরথ শঙ্কর বন্দো সিতার চরণ ॥
 ভারথি কমলালয়া কৃষ্ণের যুবতি ।
 একত্রবাসিনি বন্দো সর্বলোকের গতি ॥
 ব্রহ্মাদি না জানে জার জলের কারণ ।
 ব্রহ্মকমণ্ডলু ব্রহ্মরূপ নারায়ণ ॥
 নবংশী সিরোমনি সিরে নিবাসিনী ।
 বন্দো ভাগিরথি মহাপাতকমাসিনী ॥

সরসিজাগনা সিজাতরুনিবাসিনী ।
 বন্দো বিষহরি দেবী ভূজগজননী ॥
 কমলকানন ভবা হরের হুহিতা ।
 প্রণত অনেরে মাতা রক্ষিহ সর্বদা ॥
 প্রথমে বাজিক মুনি ব্যাস বন্দো শ্রুত ।
 সত্য ত্রেতা ষাণ্ময় কলি বন্দো চারি যুগ ॥
 নানা তির্ধ ক্ষিতিতলে বন্দো যথা তথা ।
 ভকতি করিয়া বন্দো অনন্ত দেবতা ॥
 ভাষীনি যোগিনী বন্দো ধর্ম নিরঞ্জন ।
 পণ্ডিতে মণ্ডিত সভা বন্দো গুরুজন ॥
 বশিষ্ঠ পণ্ডিত গদাধর বৃহত্তাত ।
 অসিক্ত কৈল (৫) জন্মে দিয়া বস্ত্রজাত ॥
 শুক্রে লংঘিতে চাহি অলপ সক্তি ।
 সমুদ্র তরণে ভেলা বাছিল চন্দ্রতী ॥
 অলংঘ্য শুক্রে গিরী অপার সাগর ।
 কেবল ভরসা চুর্গার চরণকমল ॥
 কলিকালে কথা জ্ঞত পুরাণষোড়শা ।
 আচম্বিতে হৈল মোর চকল বীসনা ॥
 হুনিয়া প্রবন্ধ মনে বাটিল সঙ্কোচ ।
 ক্ষেমিহ পণ্ডিত জন যদি থাকে দোষ ॥
 সেই সভা নহে যথা না থাকে পণ্ডিত ।
 এক চিন্তে স্নান নর বাণ্ডলীর গীত ॥
 ত্রিপুরার গুণকথা জগতের হিত ।
 প্রবুধ তরুণ সিদ্ধ জন বিমোহিত ॥
 জার মতী রহে চণ্ডীর চরণকমলে ।
 রোগ সোক দারিদ্ৰ্য না থাকে কোন কালে ॥
 সাক্ষে রব রথ বেদ সঙ্গ পণ্ডিতে ।
 বাসুলীমঙ্গল গীত হইল সেই হইতে ॥
 চণ্ডীর চরণে মতী পূর্বজন্মতপে ।
 পয়ার রচিয়া কথা কথিব সংক্ষেপে ॥
 ত্রৈলোক্য না জানে কেহ দেবীর প্রভাব ।
 স্নানিলে চুর্গতি খণ্ডে ধনপুত্র লাভ ॥
 জ্বল মোক্ষ পায় যদি করে ভাল সেবা ।
 পরিবার লইয়া অধে বঞ্চে রাজি দিবা ॥

জনক জননী বন্দো গুরু চরণ ।
 প্রণাম করিয়া বন্দো সমস্ত ব্রাহ্মণ ॥
 জুমারি জুমর ভঞ্জে নহে কুমিলন ।
 একভাবে পূজে অদি চণ্ডীর চরণ ॥
 বিপ্রকুলে অশ্রু পিতামহ দেবরাজ ।
 পিতা বিকর্ষন মিশ্র বিদিত সমার ॥
 শ্রীমুত মুকুন্দ হারাবতির নন্দন ।
 পাঁচালি প্রবন্ধ করে ত্রিপুরা স্বরণ ॥১৭॥

॥ বসন্তরাগ ॥

দক্ষের হুহিতা সতি হিমালয়ের ধরে ।
 ভবপঙ্কি জনমিলা যেনকাঞ্চরে ॥
 জন্মিঞা বিজয়া (৬ক) জয়া গৈয়া দুই সখি ।
 তপস্তা করিতে গেলা রাকা শশিমুখি ॥
 তপ করে ভগবতি মহেশ ভাবিয়া ।
 ষাটখ বৎসর বনে পবন ভক্ষিয়া ॥
 পার্শ্বতীর তপে স্থির নহে পদ্মপতি ।
 সন্তরে আইলা যথা বৈসে ভগবতী ॥
 আচ্ছাদন কপিন নমস্কারমালা ।
 কুশ কমণ্ডলু হাথে হৈয়া ব্রহ্মচারী ॥
 ত্রিপুরা নিকটে হর বলে ত্রিলোচনে ।
 কমলমুকুরমুখী তপ কি কারণে ॥
 অসত্য না বল মোরে স্নান সশীমুখি ।
 আমি তপস্বিনী বড়ু তোর চুঃখে চুঃখি ॥
 তপের কাবণ তোর আমি নাহি বুঝি ।
 কীরে হেতু পতীবর মাগ স্নান নগ্নি ॥
 অনবধ্য(৬) তহু কেহ মাগে স্বর্গবর ।
 উত্তম স্বরীর তোর স্বর্গে বাপধর ॥
 পুরুষরতন চাহে সর্ব লোকে জানী ।
 রতন পুরুষ চাহে কোথাহ না শুনি ॥
 সুবতীরতন তুমি না করিহ লাজ ।
 যদিবা পুরুষ চাহ তপে কোন কাজ ॥
 প্রথম যৌবন তোর চুঃখ নাহি সহে ।
 ধর্মের সাধন দেহ মুনিজন কহে ॥

অশ্বিনিকুমার বিধি হরি পুন্সর ।
 আর বা কেমন দেব ইহ প্রাণেশ্বর ॥
 বড়র বচনে বলে পরিহারি লাজ ।
 তপস্বিনি নারিরে জিজ্ঞাসা কোন কাজ ॥
 ব্রাহ্মণের বচন না লংঘে তপস্বিনী ।
 পুনরুজ্জী করি ইছি প্রভু জলপানী ॥
 স্নানিয়া দেবীর বাণী হাসে ব্রহ্মচারী ।
 রূপগুণ আতিকুল সকল বিচারী ॥
 স্নান ল স্নমুখী নাহি বুঝ ভাল মন্দ ।
 ত্রিপুরাচরণে কহে আচার্য মুকুন্দ ॥১॥

॥ কামোদ রাগ ॥

গলে হাড় মাল হস্তে নৃকপাল
 জনম গেল চাঁদ বয়্যা ।
 প্রেত ভূত সঙ্গে বিভূতি মাথে রদে
 পাগল ধুতুরা খায়্যা ॥
 সকল গুণহীন (৬)রূপে ত্রিনয়ন
 না জানী কোন জাতি জহু ।
 কাহার নন্দন বুঝি নে কী আছে ধন
 লাগট পুরাতন তহু ॥
 চল ল গুণবতি কে তোরে দিল মতী
 নাতিনী ছলে উপহাষে ।
 এ বোলে করি ভর তপস্তা নিরন্তর
 যুগল সখী দুই পাষে ॥
 ক্রকটী করি নাচে প্রতিজন নাছে
 ভিক্ষা মাগে দেবে ২ ।
 ইছিলে ভালবর সশানে আর ধর
 স্নানারী ভজে কুপুরুষে ॥
 ধুস্তর ফুল কানে সন্ধ্যাষ বিষণী
 কখন পরে বাঘছাল ।
 হৃদয় বিষয়ণ সুরভিনন্দন
 বাহন সিরে জটাভার ॥
 ব্রাহ্মণ বুঝে সহি কি জানি কী কহি
 স্নানিয়া প্রভুতিরক্ষার ।

বড়ুরে প্রতিসেধ করহ সখী ক্রত
 মন্দ বলিবেক আর ॥
 জে বলে মহাজনে মন্দ জেবা স্নানে
 তাহার পাপ ছর নহে ।
 ত্রিপুরাপদস্থল কমল মধুকর
 মুকুন্দ কবিচন্দ্র কহে ॥১॥

॥ পয়ার ॥

ব্রাহ্মণের বদনে প্রভুর নিন্দা স্নানী ।
 তপের কানন তেজে নগেব নন্দিনী ॥
 মরালগামিনী রামা জায় পদে ২ ।
 হাথ দিয়া ব্রহ্মচারি আগলিল পথে ॥
 শশীমুখী বলে বড়ু কিরূপ তোমার ।
 আমি তপস্বিনি নারী ছাড় ছুরাচার ॥
 তোমারে জানিল আমি বপট তপস্বি ।
 কাননে ভুলিলে তুমি দেখিয়া রূপসী ॥
 হরিনাম কর বুধা হাথে জপমালা ।
 বাহিরে নলকুত ভাণ্ড ভিতরে মদিরা ॥
 দেবীর বচনে উচ্চ বলে ব্রহ্মচারী ।
 আমি ত্রিনয়ণ শিব স্নান প্রাণেশ্বরী ॥
 তুমি ভূতনাথ দেব আমি নাহি জানি ।
 আপন মুরতী যদি ধর স্নলপাণী ॥
 চণ্ডীর বচনে ব্রহ্মচারী বেশ ছাড়ে ।
 আপনার কণ্ঠ উজ্জল কৈল ছাড়ে ॥
 হাতে নৃকপাল ধুস্তর ফুল কানে ।
 (৭ক) বিভূতি ভূসিল সকল অপচ্যনে (৭) ॥
 সুরনদি হীণ্ডির (৭) ধবল কৈল জটা ।
 ললাটে উইল চাঁদ চন্দনের কোঁটা ॥
 মলয় পবন বহে ডাকয়ে কোকিলী ।
 কান্দে রাখে মনোহর সিদ্ধা সিদ্ধ সুলী ॥
 মকর কুণ্ডল কানে ঘন মুখে হাশী ।
 চন্দ্রিকা প্রকাশে যেন পুণিয়ার সসি ॥
 রূপে ত্রিভুবন মোহে দিতে নাহি সিয়া ।
 উরিল কচির কণ্ঠে গরল কালিমা ॥

পরিণ বাঘের ছাল স্বপ্ন বাসুকী ।
 বলদ উপরে ত্রিনয়ন পঞ্চমুখি ॥
 ত্রিভুজ ভূসিত ভূজ ডমরু বাজায় ।
 পথে আগলিল গৌরি দেব মহাকায় ॥
 তুমি প্রাণনাথ স্বরহর ত্রিনয়ন ।
 আমার পিতার ঠাঞি কর নিবেদন ॥
 বসিষ্ঠে ডাকিল দেব কুবেরের মিত ।
 উরিল বসিষ্ঠ মূনি যুবতি সহিত ॥
 মূনিরে পুজিয়া দেব বলে জ্বলপানি ।
 বিভাহ করিব আমি নগের নন্দিনি ॥
 চল মহাসয় মূনি হিমালয়ের ঠাঞি ।
 উত্তম জনের কথা ব্যভিচার নাঞি ॥
 হিমালয়ের ঠাঞি মূনি দিল দরসন ।
 মূনিরে পুজিয়া গিরি দিলেক আসন ॥
 শুন মূনি মহাসয় তুমি সর্ব জ্ঞান ।
 কি ছেতু আমার গৃহে করিলে পয়ান ॥
 মূনি বলে সুন নগ নগের প্রধান ।
 মহাদেবে কর তুমি গৌরি কছা দান ॥
 তোমার আদেশ ভাল বলে হিমালয় ।
 (৭) শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাবিজয় ॥১৥

॥ মঙ্গলরাগ ॥

গৌরি বিভা দিব হরে স্তব্ধকণ বেলা ।
 বাহিরে বাঙ্ছিল গিরি রতন ছান্দলা ॥
 জ্ঞানাজানি কৈল হিমালয় প্রীতি ঘরে ।
 জ্বি-পুরুসে ধাওধাধাই সকল নগরে ॥
 নানা সম্বৎ বাজ বাজে স্বয়ম্বৎ ভেরি ।
 আনন্দিত হইল লোক নগনুপনুরি ॥
 সুরজ বসন পরে রত্নের কুণ্ডল ।
 ললাটে সিন্দূর কার নয়নে কঙ্কল ॥
 সম্বা বিধবা নারী ভ্রমে নানা স্থখে ।
 কেহ কাঁখে করি চুমু দেই সিঁদুখে ॥
 কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ গায় গিত ।
 মঙ্গল উচ্চারে কেহো যুবতি সহিত ॥

কেহো পরিহাসে হলদি জল ছলে ।
 যুবতি জনের দেই নিতম্ববসনে ॥
 সিঁদু বর্জ তরন ত্রিবিধ জনে মেলা ।
 গুয়া পান লয় একে ২ খই কলা ॥
 কস্তুরি চন্দন গন্ধ কুঙ্কমের খেলা ।
 বিভাহের কালে জত অবলা প্রবলা ॥
 অধিবাষ কৈল গুরু নগের বিয়ারি ।
 নান্দিমুখ জধাবিধি কৈল হেমগিরি ॥
 মহেস বরিব স্তখে গৌরি দিব দানে ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥১৥

॥ মঙ্গলরাগ ॥

যতেক যুবতিগণ হইয়া হরসিত মন
 জল সাহে দিয়া জয়ধ্বনি ।
 কক্ষে করি হেমবারা কঠে দিয়া পুষ্প ঝারা
 ছিরদগামিনি নিতম্বীনি ॥
 পঞ্চশ্বরে গায় গিত ঘরে ২ উপনিত
 রাখে ঘট আলিপনা দিয়া ।
 নানা(চক)পরিপাটী করি আশীষা গৃহের নারি
 জল দিল তখি উভারিয়া ॥
 ললাটে সিন্দূর দিল নয়নে কঙ্কল আর
 কপূর তাধুল দিল ভুজে ।
 সম্বৎ ঘণ্টা বিনা বেনি দগড় কাঁসড় ধ্বনী
 মৃদঙ্গ পট্টহ সানি বাজে ॥
 গৃহে আশী রামাগণ করে পড়া মঙ্গলন
 ঘরে হইতে অধিকারে আনি ।
 চারিদিকে চারিকলা পুণ্ডরের মাঝে সিল
 তচুপর বসিল ভবানী ॥
 জয় ২ উচ্চারণ অঙ্গে দেই উদর্ভন
 কেহো ২ জল চালে সিরে ।
 বসন পরিণ গৌরি স্তব্ধ দিয়া বেড়ে নারী
 নানা বেস করে লইয়া ঘরে ॥
 ঔসধ বাটিল নারি বরিবারে ত্রিপুরারী
 সাজিয়া লইল হেম থালা ।

জিগুয়াচরণ আসে কবিচন্দ্র মধু ভাসে
রক্ষ দেবী সর্বমঙ্গলা ॥ * ॥

সৈলন্ততাপদ মজ্ঞে ময়মথ
অঙ্গ ভনই কবিচন্দ্র ॥ * ॥

॥ মম্বার রাগ ॥

॥ অতিছন্দ ॥

গৌরির বিবাহে রামা হরসিত হইয়া ।

প্রেসিত পেসিত বাটিল মৌসধি

বস্ত্রে সর্করা দিয়া ॥

কুঞ্জরগামিনি অত্যন্ত রমনি

ভূজতে ভেসজ ডালা ।

বরিতে সঙ্কর চলিলা সঙ্কর

নিকটে উপনীত ভেলা ॥

ভূজপরি ভূজ অত্যন্ত সজ

নিছিয়া পেলই রঙ্গে ।

মুকুটে মৌসধি যোক্তা যুবতি

চিত্রণ চলই ভঙ্গে ॥

গোত্রবণ পতি গন্ধে ছোটই

হরিভূজ নখসই ছাল ।

ক্রকুটিত নেত্র বিভূষিত গাত্র

হৃদয়ে অস্তিক মাল ॥

সিরোপরি গজ গৌরি আধ অঙ্গ

ত্রিহুল দিশিম ভূজ ।

পেশি দিগাধর মহিলামণ্ডল

বদন লুকাঅছি লাজে ॥

ভূজ মারে ছো না সধরে কো

(৮)নারী অতিরথ ছোট ।

কিঙ্কণি কঙ্কণ ঠেকাঠেকী বঙ্কন

কেহ কোথা পড়ে উঠে ॥

অম্পিত বসনা মিস্তিত রষণা

হৃদয় মারল ভুক ।

আমাতা লাগট দেখিয়া বিকট

সর্বহ ভাবহ হুঃখ ॥

ভেজত নাটকী হাশত মুচকী

কেবল নারদ ভজ ।

গলায় হাড়ের মাল জটা বয়ে শিরে ।

কিলীং করে সাপ জটার ভীতরে ॥

ধুম্বর কুম্ভ কর্ণে সন্ধের কুণ্ডল ।

বিভূষিত ভূষণ অঙ্গ বস্ত্রিত অঘর ॥

আইমাং আলো ঝিয়ে বিধাতা ছরস্ত ।

গৌরীর কপালে ছিল যুগী জ্বরী কান্ত ॥

বাজার নন্দন কিবা হেন মনে বাসি ।

কোথা হইতে আইল বুঢ়া কুণ্ডল তপস্বি ॥

ঘটাইয়া দিল জেবা এমত কুকাঙ্গ ।

অবস্ত্র তাহার মুণ্ডে পড়িবেক বাঙ্গ ॥

না হউক বিবাহ গৌরি থাকু অবস্থিতা ।

হেন বরে বিবাহ দেই দারুন তোর পিতা ॥

আল বুক মরোং হেথা আইস গৌরি ।

জনক জননী আজি তোরে হইল বৈরি ॥

লাগট দেখিয়া হরে বলে আইয়গন ।

জুনিঞা মেনকা দেবি যুড়িল ক্রন্দন ॥

মহেসের তব সবে জানে ভগবতি ।

কবিচন্দ্র বিরচিত মধুর ভারিণি ॥ * ॥

॥ কো রাগ ॥

দেখ গ যুবতিগণ বিধি বড় নিদারুন

কি করিব বল না ভারিণি ।

বিভূষিত মাখিয়া গায় জ্বরী তহু অতিসয়

ঐ সিং গৌরার পতি ॥

গলায় বাকিয়া গৌরি হইলু জে দেসান্তরি

জেন বিভা না করে মহেস ।

ছাড়িয়া গৃহের আস করিব কাননবাস

এই কথা কহিলু বিশেষ ॥

ত্রৈলোক্য সুন্দরি গৌরী বর কেন-মুগি বুঢ়া

এত হুঃখ সহে যোর প্রানে ।

করিয়া গরল পান তেজিব আপন প্রান
 যেন আমি না দেখি নয়ানে ॥
 যুগল নয়ান খাইয়া সম্বন্ধ করিল গিয়া
 এত দুঃখ দেই তোমার বাপ ।
 তোমার বালাই লইয়া জলে প্রবেশিবা গিয়া
 তবে সে খণ্ডিব মোর তাপ ॥
 (৯ক) আগে বাপ দেখে বর তবে ধন কুল ঘর
 আর জ্ঞাত তার অম্ববন্ধ ।
 যদি দোস থাকে বরে কি করিব কুল ঘরে
 এই কথা বিধির নিবন্ধ ॥
 ঘটক বসিষ্ঠ মুনি কুচেষ্ঠা করিল কেনী
 বীর হইয়া হইল কুমতী ।
 বর্ণের নির্ণয় নাঞি কাহারে কহিব মুঞি
 বর আত্মা দিল ব্রহ্মপতী ॥
 পঞ্চম বৎসরের কালে তপস্তা করিতে গেলে
 জন্মে হইল ষোড়শ বৎসর ।
 ধাতার দাক্ষণ মতী বৃষ্টিতে নারিল গতি
 পশুপতী তোরে দিল বর ॥
 স্ননিয়া মায়েব কথা হৃদয়ে লাগিল ব্যথা
 প্রভুনিলা সহিতে না পারি ।
 হৃদে চিন্তে নারায়ণী নারদে ডাকিয়া আনী
 কবিচন্দ্র রচিল মাধুরী ॥১৥

॥ পয়ার ॥

নারদে ডাকীয়া বলে অচলনন্দিনী ।
 সমোচিত রূপ ধর প্রভু সুলপাঙ্গী ॥
 বিবাহের কালে এত নহেত উচিত ।
 ধরি মনোহর রূপ পালহ পিরিত ॥
 নারদের বচনে প্রভু দেব স্বরহর ।
 ইজিতে ধরিল রূপ কামিনীমনোহর ॥
 ইস্ত ময়নে আশী দেখিল যেনকা ।
 সরভের চন্দ্র জেন সম্পূর্ণ চন্দ্রিকা ॥
 জামাতার রূপ দেখি পড়ি গেল ধন্দে ।
 রড়ারড়ি জামা রামা কুল নাছি বাঞ্চে ॥

আইসং, রামাগণ দেখ গ জামাতা ।
 সফল অর্ঠরে আমি ধরিল হুহিতা ॥
 মনমোহন কিবা জামাতার রূপ ।
 আইসং আইয়গণ দেখ গ স্বরূপ ॥
 মেনকার বচনে সতে দিল নয়ন ।
 দেখিল শিবের রূপ জিনি জিহুবন ॥
 মুকুন্দা পড়িল জ্ঞাত দেখিল যুবতী ।
 হৃদয় কুণ্ডমবান হানে রতিপতী ॥
 ধিরেং জামা রামা রূপ নিরক্ষিয়া ।
 সতে মরি হরগৌরীর বালাই লইয়া ॥
 দেখিয়া হরের রূপ জ্ঞাতেক অবলা ।
 আঁখি ঠারাঠারি করে হৃদয় চপলা ॥
 জেন হাশি তেন সরা বিধীর ঘটন ।
 চামি মরকত জেন অভেদ মিলন ॥
 হর হরি আরাধন কৈল ভাগ্যবতী ।
 তে কারণে বিধি হেদে দিলেন পুপতী ॥
 তরুণ যুবতি (৯)জ্ঞাত বুদ্ধ জেন যোলা ।
 একেং রামাগণ খায় মনকলা ॥
 বিরচিল কবিচন্দ্র ত্রিপুরার বরে ।
 মনকলা খায় রামা মশম অকরে ॥

॥ একাবলী ছন্দ ॥

তরুণী জ্ঞাতেক রামা বলে ।
 তপস্তা করিব সিদ্ধজলে ॥
 তবে যদি না পাই জিনয়ণ ।
 তবে সতে তেজিব ভীবন ॥
 তখনি কথিল যুবা নারী ।
 জনক জননী হৈল বৈরী ॥
 হেন বর ছিল যদি দেশে ।
 তবে বাপ না কৈল উদ্দেশে ॥
 বিবাহ না দিল হেন বরে ।
 বজ্র গড়ুক তার গিরে ॥
 জখন ছিলাম অবস্থিতা ।
 যুগল নন্দন খাইল পিত্তা ॥

তখন কখিল বৃদ্ধ জন।
 পুনরপি নেউটুক যৌবন ॥
 ছুরেতে তেয়াগিয়া রক্ত।
 পরিতোশে আনি তবে গজ ॥
 তবে সে পুরয়ে মোর আস।
 হা হা বিধি করিল নৈরাস ॥
 অখন ছিলাম বাপঘর।
 কোথা ছিল হেন পোড়া বর ॥
 অনল আনলে সতে বলে।
 কুমারের পোয়ান জেন জলে ॥
 নীবারিল সতে চিত।
 বরিতে চলিল তুরিত ॥
 মেনকা লৈয়া জ্ঞাত সখা।
 শিবের সমুখে দিল দেখা ॥
 অধিকাচরণে দিয়া মতী।
 কবিত্ব কহে জ্ঞানরথি ॥১॥

॥ মঙ্গল রাগ ॥

মেনকা বরিল শিবে পায় দিয়া দধি।
 দেউটী জালিয়া ফিরে সকল যুবতী ॥
 গলায় ঘনর দিয়া ফিরে যথাবিধী।
 মহেসের মুকুটে হাসিল কলানিধী ॥
 রতনে ভূসিল গৌরী কলধৌতনিভা।
 উচ্চারে মঙ্গল জ্ঞাত সখা বিধবা ॥
 অজনে সানন্দ জ্ঞাত কন্ডাবরব্রজ।
 ভুবনমোহন রূপ ব্রহ্ম ব্রহ্মব্রজ ॥
 সিংহপ্রভে ত্রিপুরা বিভূজে নাগদল।
 চারি দিগে চারি রত্ন প্রদীপ উজ্জল ॥
 ধরিলেক অঙ্কশপট জ্ঞানফল পাইয়া।
 সম্মিষণ বেগে সিংহ জায় বইয়া ॥
 প্রাক্ষিণ সাত বার ছই হাত বুকে।
 ঘুচাইল অঙ্কশপট শিবের সমুখে ॥
 পাক দিয়া পেলো পান উর্দ্ধ ছই ভূজে।
 হরগৌরীর বিবাহে সকল দেব লাচে ॥

জৈলোক্যমোহিনী(১০ক)দেবী বুকে পরিপাটি।
 ছই কর্ণে ভুলি দিল চিরাতের কাঁটি ॥
 হরিল ছইার মন মাচনে ॥
 মালা দিয়া ভগবতী বরে ত্রিলোচনে ॥
 বিবিধ ঔষধ দিল মুকুটে যথিয়া।
 নারিকেল পিয়ে প্রভুর বুকে হাথ দিয়া ॥
 নায়েকে চামুণ্ডা চণ্ডী করিবে কল্যান।
 তোমার প্রসাদে হউক বনপুত্রবান ॥
 নুমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া দৈবরি ॥ * ॥

॥ কামোদ রাগ ॥

মধুর মাদল বাজে ছন্দবি দ্বিমিত ॥
 গৌরি মহেসে ছই করিল ছামনি ॥
 প্রেত ভূত পিচাস সধনে পেলো চেলা।
 উরিল নারদ মুনি কন্দলমেষলা ॥
 হড়াহড়ি যারামারি কন্ডাবরগনে।
 ব্যাকুল বসিষ্ট মুনি কন্দল মার্জনে ॥
 সঙ্কড় চাউলি পেলো জ্ঞাত বিভাধরি।
 মধুকরকোলে কেলি করে মধুকরি ॥
 নারদ কখিল ক্রপা কর সর্বজনে।
 মাজিল(৭)কন্দলরে বিনা গুয়া পানে ॥
 বস্ত্র হিমালয় গিরি বস্ত্র সে মেনকা।
 কোটী চান্দ মুখবরে গৌরি দিল বিভা ॥
 ধনি ২ করে জ্ঞাত উর্ধ্বসি পনিকা।
 অস্তরে হরিশ ছইল স্নানিঞা মেনকা ॥
 বেদমন্ত্র পড়ে গুরু কোলে ভগবতি।
 ছলাছলি দিল আশী সকল যুবতি ॥
 কন্ডাদান অথাবিধি কৈল হিমগিরি।
 সঙ্করেয়ে সংপ্রদান করিল সঙ্করি ॥
 দক্ষিণা সন্তোষে বিজ পড়ে জ্ঞানবেদ।
 জে বচনে সকল দারিঙ্গ হুঃখ ভেদ ॥
 থির ভোজন করে মহেস সঙ্করি।
 অথে পুছ গেল জ্ঞাত নগরে নাগরি ॥
 পুষ্পের সযায় হর ত্রিপুরা সহিত।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে বাহুলির গিত ॥ * ॥

॥ প্রথম পালা সমাপ্ত ॥

“গৌড়ীয় সমাজ”

প্রতিবাদ

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয়-রচিত ও ‘সাহিত্য-পরিবহ-পত্রিকা’ ৬০ ভাগ, প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত “গৌড়ীয় সমাজ” নামক প্রবন্ধে অনেকগুলি ভুল আছে। রীতি-বিরুদ্ধ কাজও প্রবন্ধকার যোগেশবাবু ইহাতে কিছু করিয়াছেন। এইগুলি সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন মনে করি।

গৌড়ীয় সমাজ প্রবন্ধের সকল তথ্য ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’ প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ: ৯-১৩; ৪০৭ হইতে নকল করা হইয়াছে। কিন্তু ঐ নকলেও অনেক ভুল আছে। প্রথমে এই নকলের ভুলগুলির কথা বলিব; সঙ্গে সঙ্গে অল্প ছোটখাট ভুলগুলিও দেখাইব।

প্রবন্ধের প্রথম অংশের দ্বিতীয় অঙ্কচ্ছেদে এবং অঙ্কজ রামচন্দ্র দেবের পরে মূল্যতিরিক্ত “সরকার” শব্দটি আছে। প্রচলিত রীতি অনুসারে উহা চৌকা বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া উচিত ছিল। মূলের কাশীনাথ মল্লিক স্থলে উপরোক্ত অঙ্কচ্ছেদেই হইয়াছে—“কাশীনাথ মাল্লা”!!! প্রথম পৃষ্ঠার পাদটীকায় “pp. 549-54. London” স্থলে—The Asiatic Journal, London, December 1823 হওয়া উচিত ছিল। নিগড় শব্দের প্রচলিত অর্থ—বেড়ী; পাদবন্ধনী। যোগেশবাবু তাঁহার প্রবন্ধে তাহা (১৮ পৃষ্ঠা) “ভারতবাসীর গলায় পরিতে বাধ্য” করিয়াছেন। পত্রিকায় ২১ পৃষ্ঠায় তৃতীয় অঙ্কচ্ছেদে, মূলের “উত্তর২” [অর্থাৎ উত্তরোত্তর] স্থলে “সম্বরই” হইয়াছে। ঠিক পরের অঙ্কচ্ছেদে ‘সমাচার দর্পণ’ “২০ ডিসেম্বর” স্থলে “২৩ ডিসেম্বর” হইয়াছে।।।

নকলকারীর দোষে যে এই ভুলগুলি হইয়াছে, তাহা অস্পষ্ট। এই শ্রেণীর প্রবন্ধ নকল করিবার কতকগুলি নিয়ম আছে। বর্তমান প্রবন্ধ নকল করিবার সময় তাহা মানিয়া চলা হয় নাই বলিয়া মনে হয়।

নকলের ভুল ছাড়া প্রবন্ধটিতে অস্পষ্ট উক্তি অনেক আছে। একটি মাত্র দেখাইব। প্রবন্ধের প্রথম পৃষ্ঠায় যোগেশবাবু বলিয়াছেন : গৌড়ীয় সমাজের “মূল বাংলা অল্পষ্ঠান-পত্রখানি পাইতেছি না।” এই অস্পষ্ট উক্তি হইতে অনেকে মনে করিতে পারেন যে, তিনি বহু অল্পসন্ধান করিয়াও উহা পান নাই। কিন্তু ব্রজেননাথের পুস্তকের ৪০৭ পৃষ্ঠার মন্তব্য—অল্পসন্ধান করিয়াও যদি তিনি উহা না পাইয়া থাকেন, অথবা ঐরূপ অল্পসন্ধান করিবার সময় ও শক্তি যদি তাঁহার না থাকে, তাহা হইলে ঐ বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া লেখা কি তিনি উচিত মনে করেন না? ইতিহাসের ছাত্র তিনি ইহা নিশ্চয়ই জানেন যে, এই শ্রেণীর অস্পষ্ট উক্তি ঐতিহাসিক প্রবন্ধের গৌরব কতখানি লান্ধব করে।

যোগেশবাবুর প্রবন্ধের কয়েক স্থানে গৌড়ীয় সমাজে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নাম আছে।

ছুইটি স্থলে দলের প্রথম জনের নামের পূর্বে “পণ্ডিত” শব্দটি আছে। প্রথম বার (পৃঃ ১৬) রামজয় তর্কালঙ্কারের নামের পূর্বে এবং দ্বিতীয় বার (পৃঃ ২০) রঘুরাম শিরোমণির নামের পূর্বে। এ রীতিও অপূর্ণ। পণ্ডিত শব্দটি যদি দলের প্রথম জনের বিশেষণ হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, দলের অপর তর্কালঙ্কার শিরোমণিরা কি অপরাধে বিশেষণহীন ভাবে উল্লিখিত হইলেন। তাহা ছাড়া রামজয় তর্কালঙ্কার, রঘুরাম শিরোমণি প্রভৃতি যে অর্থে পণ্ডিত,—রসময় দত্ত, প্রসন্নকুমার ঠাকুর সেই অর্থে পণ্ডিত নহেন। এই জ্ঞাত পণ্ডিত শব্দটি, কষ্টকল্পনা করিয়াও দলের সকলের বিশেষণ বলা যায় না।

“বদেশের হিত-সাধনের জন্ত একরূপ বহু প্রচেষ্টা আবশ্যক, যাহা কোন ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা একক ভাবে...” ইত্যাদি বাইবেলগম্ভী অমুখ্যবাদ সম্বন্ধে কিছু বলা বাহুল্য। ১২ পৃষ্ঠার “We therefore...” প্রভৃতি কথাগুলির মধ্যে স্পষ্ট নকলের ভুলের (ঐ বাক্যের তৃতীয় পঙক্তিতে “And translators” শব্দের পর বাক্যের প্রধান ক্রিয়া undertake কথটি না দেওয়ার) সম্বন্ধেও কোন কথা বলিব না। কিন্তু উপরোক্ত ইংরেজীর অমুখ্যবাদের মধ্যে—“এই ভাবে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পূর্ণ হইবে”—এই কথার মূল তিনি কোথায় পাইলেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিব।

প্রবন্ধের সকল স্থানে এই ভাবে নানা রকম ভুল থাকিলেও যোগেশবাবুর ভুলটি বড়ই উপাদেয়। সমাজের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কিছু বলিয়া (অংশ ১), অমুখ্যবাদ-পত্রটির মর্ম্মালোচনার আসিয়া (অংশ ২), পরবর্ত্তী অধিবেশনগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনার পর—বীরে বীরে, ধাপে ধাপে অগ্রসর হইয়া তিনি শেষ সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন (অংশ ৩)। সত্যার বিবরণ, উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের নাম, চাঁদার পরিমাণ—সমস্তই ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’ হইতে নকল করিয়া যোগেশবাবু ঐ আকর-গ্রন্থের ঋণ স্বীকার করেন নাই। প্রমাণ লোপ করিয়া তাঁহার নকলের ভুলগুলি সংশোধনের পথও বন্ধ করিয়াছেন। ইহা ইতিহাস-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ও নীতি-বিরুদ্ধ হইলেও কারণহীন নয়। পরিষদের নিয়মাবলীর ও দ্বারা অতিপ্রায় অমুখ্যারে তাঁহার প্রবন্ধের মৌলিকতা প্রমাণ করিবার জন্ত ইহার প্রয়োজন সম্ভবতঃ ছিল।

প্রবন্ধের শেষের দিকে যোগেশবাবুর ঐতিহাসিক নিষ্ঠা প্রকাশ পাইয়াছে। অতি ছোট ছুইটি খবরের পর ব্রজেননাথের গ্রন্থের নাম তিনি করিয়াছেন। তাঁহার প্রবন্ধের স্থান-বিশেষে তাঁহার সাবধানতা দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। তাঁহার মতে সমাজের চারিটি অধিবেশন হইয়াছিল। “চারিটি”,—এই শব্দও তিনি অনেক সময়ে বিশেষণহীন ভাবে লিখেন নাই;—“অন্যান্য চারিটি” লিখিয়াছেন। কিন্তু এত আড়ম্বর সম্বন্ধেও তাঁহার শেষ সিদ্ধান্ত পরীক্ষার মুখিক প্রসবের জন্ম কৌতুককর।

সমসাময়িক সংবাদপত্রে গৌড়ীয় সমাজের ছয়টি মাত্র অধিবেশনের উল্লেখ আছে।^১ যে

১। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, তথা যোগেশবাবুর প্রবন্ধে ছয়টি অধিবেশনের উল্লেখই আছে। অথচ যোগেশবাবু বলিয়াছেন “অন্যান্য চারিটি।” গবেষণামূলক প্রবন্ধ আমরা পূর্বে অনেক দেখিয়াছি। কিন্তু এমত আশাধর্ম্মমতক গবেষণা আর দেখি নাই।

‘সমাচার দর্পণ’ অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে সমাজের প্রত্যেক অধিবেশনের সংবাদ ছাপাইত, তাহাতেও পরবর্তী আধবেশনের কোন খবর নাই। সমাজগৃহ নির্মাণ করিবার প্রস্তাব হইলেও উহা নিশ্চিত হয় নাই। কালীশঙ্কর ঘোষালের ‘ব্যবহারমুকুর’ নামক গ্রন্থ সমাজের পক্ষ হইতে প্রকাশের কথা হইলেও সমাজ তাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই। পরবর্তী কালের কোন গবেষণামূলক গ্রন্থের সঙ্কলক অথবা প্রকাশকদের কেহ নিজেদের পূর্বগামী হিষ্টাবে বা অল্প কোন ভাবে গৌড়ীয় সমাজের নাম করেন নাই। দেশীয়দিগের দ্বারা সমাজ বা সমিতি প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে গৌড়ীয় সমাজ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ইহা তো ব্রজেননাথ বহু পূর্বেই দেখাইয়াছেন। এই জন্তই ব্রজেননাথকে অতিক্রম করিবার ইচ্ছায়, সমাজের কর্মের ও প্রভাবের কোন চিহ্ন পরবর্তী কালে না থাকা সত্ত্বেও যোগেশচন্দ্র তাঁহার প্রবন্ধে লিখিলেন (পৃ: ২২):—“বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের এই যে দ্রুত উন্নতি ও বহুমুখী প্রসারলাভ—ইহার মূলে গৌড়ীয় সমাজের মজল-হস্ত প্রত্যক্ষ (bio) করি” !!!

নকলের ভুল, ইংরেজীর অমূল্যদের ভুল, কাঁচা অমূল্য এবং প্রবন্ধের সমস্ত উপাদান ব্রজেননাথের গ্রন্থ হইতে নকল করিয়া অতি অবাস্তব ছুইটি খবরের শেষে তাঁহার গ্রন্থের নাম করিয়া ব্রজেননাথের কীর্তিকে প্রকারান্তরে স্বীকার করিবার ও পাঠকের নিকট সাধু সাজিবার অপচেষ্টা ছাড়া এই প্রবন্ধে যোগেশবাবুর নিজস্ব কিছুই নাই।

যোগেশবাবুকে আমি শ্রদ্ধা করি। শ্রদ্ধা করি বলিয়াই আশ্রয় স্বীকার করিয়া এত কথা লিখিলাম। এই ধরনের প্রবন্ধ তাঁহার ও সাহিত্য-পরিবর্তন-পত্রিকার স্তন্য কি তাহা নষ্ট করিবে, তাহা তিনি দয়া করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন। ইতিহাসের ক্ষেত্রে নূতন মাল-মসলা আবিষ্কার না করিয়া নূতন কথা বলা যায় না। এ সত্য তাঁহার ভুলিয়া যাওয়া উচিত হয় নাই।

শ্রীপ্রবোধকুমার দাস

উত্তর

শ্রীযুত প্রবোধকুমার দাসের প্রতিবাদ পাঠ করিলাম। ইহাকে প্রতিবাদ না বলিয়া ‘অভিযোগ’ বলাই যুক্তিযুক্ত। প্রবোধবাবুর অভিযোগ—আমি মূল প্রশ্নাদি লোপ করিয়া পূর্ব-আলোচিত বিষয়ই উক্ত প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছি, কারণ “পরিবর্তন নিয়মাবলীর ৪ ধারার অভিপ্রায় অনুসারে তাঁহার [যোগেশবাবুর] প্রবন্ধের মৌলিকতা প্রশংসা করিবার জন্য ইহার প্রয়োজন সম্ভবতঃ ছিল।” প্রবোধবাবুর আর একটি উক্তি—“ইতিহাসের ক্ষেত্রে নূতন মালমসলা আবিষ্কার না করিয়া নূতন কথা বলা যায় না। এ সত্য তাঁহার [যোগেশবাবুর] ভুলিয়া যাওয়া উচিত হয় নাই।” অভিযোগকারীর এই উক্তিগুলির সত্যতা প্রথমেই যাচাই করিয়া দেখা যাক।

‘গৌড়ীয় সমাজ’ প্রবন্ধে আমার মূল বক্তব্য গৌড়ীয় সমাজের অমুঠানপত্র সম্পর্কে। এই অমুঠানপত্রের ভিত্তিতে আমি গৌড়ীয় সমাজের উদ্দেশ্য, কর্মপ্রণালী এবং অধিবেশনাদির আলোচনা করিয়াছি। অমুঠানপত্রখানি তখন বাংলায় পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলেও আমি এখানি ব্যবহার করিতে পারি নাই। এখানির ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮২৩ সনে ‘ওরিয়েন্টাল রিভিউ’তে। ইহার সঙ্গে সমাজের প্রথম ছইটি অধিবেশনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ—মায় চাঁদার পরিমাণ ও সভ্যদের নাম—প্রদত্ত হয়। এ সকলই লণ্ডনের ‘এশিয়াটিক জর্নালে’ প্রবাহ উদ্ধৃত হইয়াছিল। আমি সে যুগের ও এযুগের বহু ইংরেজী বাংলা পুস্তক দেখিয়াছি, পত্র-পত্রিকারও ফাইল ঘাটিয়াছি। কিন্তু কোথাও এ সম্বন্ধে আলোচনা অজ্ঞাবহি আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই। বহু অমূল্য জিনিষের মত এটিও লোকচক্ষুর অগোচরে অনাদৃত অবস্থায় ছিল।

১৮২৩-২৪ সনের ‘সমাচার দর্পণে’ ‘গৌড়ীয় সমাজে’র কিছু কিছু বিবরণ বাহির হয়, যেমন ঐ সময়ের ‘সমাচার চক্রিকা’ও বাহির হইয়াছিল। প্রবন্ধে ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় “সংবাদপত্রে সেকালের কথা”, ১ম খণ্ড, ৩য় সং, ৯-১১ পৃষ্ঠায় গৌড়ীয় সমাজের চারিটি অধিবেশনের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই প্রবন্ধের ৪০৭ পৃষ্ঠায় অমুঠানপত্রখানি মূলে ও অনুবাদে কোথায় রহিয়াছে তাহার নির্দেশমাত্র আছে। যে-কোন অমুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা দেখিতে পাইবেন—‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’র প্রথম বিবরণগুলিতে গৌড়ীয় সমাজের অমুঠানপত্র হইতে কোথাও উদ্ধৃতি নাই। এখানির কথা মাত্র তিন বার অতি সংক্ষেপে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে : (ক) “...ঐ সভায় অমুঠানপত্র পাঠ করিলেন” (পৃ. ৯) ; (খ) “...বে অমুঠানপত্রখানি পাঠ করা গেল...” (পৃ. ১০) ; এবং (গ) “...সভায় অমুঠানপত্র আপনি পাঠ করুন...” (পৃ. ১১)। গৌড়ীয় সমাজের অমুঠানপত্রখানির, সাধারণ পাঠক-পাঠিকার অজ্ঞাত-বিষয়, আলোচনার প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কোথায়ও অমুঠানপত্রখানির উল্লেখ বা ইহা প্রাপ্তির নির্দেশমাত্র থাকিলেই ‘এ বিষয়ে আলোচনা হইয়াছে’ এ কথা কোন ক্রমে ব্যক্তি বলিতে পারেন না।

অভিযোগকারী আমার প্রবন্ধের আরও অনেক ভুল-ত্রুটি দেখাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এগুলির বেশীর ভাগই এত তুচ্ছ ও নিরর্থক যে, জবাবের অপেক্ষা রাখে না। অভিযোগকারী প্রবন্ধের কয়েকটি ভ্রম-প্রমাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলির অধিকাংশই আমার পাণ্ডুলিপিতে ঠিকই ছিল। তথাপি মুদ্রিত ভ্রমগুলির সংশোধনও যথাস্থানে যথাগময়ে পাঠাইয়া দিয়াছি। অভিযোগকারীর মাত্র কয়েকটি অভিযোগের জবাব সংক্ষেপে এখানে দিব :

১। অভিযোগকারী ‘নিগড়’ শব্দের প্রয়োগে (পৃ. ১৮) ভুল ধরিয়াছেন। অভিধানে দেখিতেছি—‘নিগড়’ শব্দটির প্রচলিত অর্থ শৃঙ্খল, লোহার শিকল। মূল অর্থ ‘পায়ের বেড়ী’ বটে। অভিযোগকারী যে ভাষাতত্ত্বের এই সাধারণ কথাটিও জানেন না যে, শব্দের মূল অর্থ ক্রমে ক্রমে বদলাইয়া গিয়া থাকে ইহাই আশ্চর্য।

২। অভিযোগকারী ‘পণ্ডিত’ শব্দটির প্রয়োগ লইয়া আপত্তি তুলিয়াছেন। এক জনের

প্রথম নামটির আরম্ভে পণ্ডিত থাকিলে, ‘কমা’ চিহ্ন দ্বারা স্বতন্ত্র করা সম্ভব, শেষের দিকের ‘রসময় দত্ত’ ‘পণ্ডিত’ হইবেন বলিয়াছেন। অস্বতঃ সূক্তি। স্তার রাসবিহারী ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ ‘কমা’ ‘কমা’ দিয়া এইরূপ লিখিলে যে চিত্তরঞ্জন দাশকেও ‘স্তার’ উপাধিভূষিত মনে করিতে হইবে তাহা এই প্রথম তুলিলাম।

৩। অভিযোগকারী আমার অমুবাদকে (পৃ. ১৭ : ‘বঙ্গদেশের হিতসাধনের জন্ত...’) ‘বাহুবলগন্ধী’ বলিয়াছেন। এ বিষয়টি পাঠক-পাঠিকারই বিচার্য।

৪। অভিযোগকারী আমার প্রবন্ধে উদ্ধৃত ইংরেজী অংশের (পৃ. ১৯) অমুবাদে ভুল করিয়াছেন। আমি উহার আক্ষরিক অমুবাদ করি নাই, তাৎপর্য্য মাত্র দিয়াছি।

৫। অনূন চারিটি সভার ‘অনূন’ বিশেষণটিতে আপত্তি তোলা হইয়াছে, ‘অনূন’ বলিবার হেতু এই : আমার দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছে যে, গৌড়ীয় সমাজের আরও অধিবেশন হইয়াছিল। সমাজের মূল উদ্দেশ্য—(ক) বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন এবং (খ) শাস্ত্রালোচনার প্রসার দ্বারা শ্রীষ্টানির প্রতিরোধ। ক্রমে শেষোক্ত উদ্দেশ্যটি একটি হইয়া পড়ায় মিশনরী পরিচালিত ‘সমাচার দর্পণে’ ইহার সংবাদ আর প্রকাশিত হয় নাই। অল্পষ্ঠানপত্রের বিষয়বস্তু এই কারণেই ‘দর্পণে’ স্থান পায় নাই বলিয়া মনে হয়। ‘সংবাদপত্রে সেকালের কথা’ (১ম খণ্ড) প্রথম গ্রন্থনকালে বহু অমুসন্ধান করিয়াও ‘সমাচার চক্রিকা’র ঐ সময়কার কাইল পাওয়া যায় নাই। এই সকল কাইল পাওয়া গেলে গৌড়ীয় সমাজের পরবর্ত্তী অধিবেশনগুলির কথাও হয়ত জানা যাইত।

৬। অভিযোগকারীর মতে আমার ‘শেষ সিদ্ধান্ত পূর্ব্বতের সুবিধ প্রসবের স্তার কোতুকর’। গৌড়ীয় সমাজের কোন নিজস্ব বাড়ী ছিল না, সমাজ কর্তৃক কেন বই ছাপা হয় নাই—এই সকল কারণে তিনি ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন। ঐ সময়কার বাংলাদেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক অবস্থাদি সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে অভিযোগকারী এরূপ মন্তব্য নিশ্চয়ই করিতেন না। তখন নব্যশিক্ষার ফলে সবেমাত্র আমাদের সমাজ-জীবন গড়িয়া উঠিতেছিল। গৌড়ীয় সমাজের মত একাডেমিক এসোসিয়েশান, সর্ব্বভাষাভাষী সভা, বঙ্গভাষাপ্রকাশিকা সভা, সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, ভূম্যাধিকারী সভা—কত সভা সে সময়ে স্থাপিত হইয়াছে আবার উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রভাব বা দান আজিও অস্বাকার করিবার উপায় নাই। ইহাদের কোনটিরই নিজস্ব বাড়ী ছিল না, ইহাদের দান বা কৃতি কোন পুস্তকে লিপিবদ্ধ না থাকিলে, বা পরবর্ত্তীরা উল্লেখ না করিলেও কি এইজন্মই আমাদের গুলিয়া যাইতে হইবে? গৌড়ীয় সমাজ আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতিমূলক সমাজ-জীবন বা সমাজ প্রচেষ্টায় পণ্ডিত। ইহার প্রেরণা পরবর্ত্তী দশ-পনের বৎসরে সমগ্র বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালীর সমাজ-জীবনে উপলব্ধ হইয়াছিল।

৭। অভিযোগকারী আমাকে ‘নকলকারী’ বিশেষণে আপ্যায়িত করিয়াছেন। অন্ততঃ দশ বার ‘নকল’ শব্দটিও উক্ত অভিযোগ-পত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে। ‘নকল’ কথাটির প্রচলিত অভিধানিক অর্থ—‘অনুলব্ধ’, ‘প্রতিলিপি’। অভিযোগকারী আমার প্রবন্ধে কোথায়

অনুবরণ বা প্রতিলিপির স্পর্শ পাইলেন বুঝিলাম না। আমি সমসাময়িক তথ্যসমূহ বাচাই করিয়া দেখিয়াছি, 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা'ও অবশ্যই দেখিয়াছি। যেখানে যেখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করিয়াছি সেখানে সেখানে গ্রন্থখানির উল্লেখও করিয়াছি।

অভিযোগকারী আমার প্রবন্ধ লেখার মূলে বিশেষ উদ্দেশ্য আরোপ করিয়াছেন। তবে আমি যে ইহাতে নূতন বিষয়ই আলোচনা করিয়াছি সে সম্বন্ধে আশা করি বিমতের অবকাশ নাই।

ত্রিযোগেশচন্দ্র বাগল

[এ সম্বন্ধে আর বাদানুবাদ প্রকাশিত হইবে না।—স. সা. প. প.]

জন্ম-সংশোধন

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	হইবে না	হইবে
১৬	১৫	কাশীনাথ যাদব	কাশীনাথ মল্লিক
২১	২৮	২৩ ডিসেম্বর ১৮২৩	২০ ডিসেম্বর ১৮২৩

সভাপতির ভাষণ

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর হইতে চলিল, ১৩১৫ বঙ্গাব্দের ২১শে অগ্রহায়ণ বর্তমান পরিবৎ-
মন্দিরের গৃহপ্রবেশ-উৎসব হয়। সেই অঙ্কুঠানে রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন :

- “আমাদের দেশ বছকাল হইতে পুণ্ডরীক হইয়া শোক করিতেছে। সে বাহা
• আরও করে, তাহা কোনো একটি ব্যক্তিকেই আশ্রয় করিয়া দেখা দেয় এবং সেই
একটি ব্যক্তির সঙ্গেই বিলীন হইয়া যায়,—তাহার সংকল্পকে বিচিত্র সার্থকতার
পরম্পরার মধ্য দিয়া ভাবী পরিণামের দিকে বহন করিয়া লইয়া যাইবার কোনো
উপায় নাই। ক্ষুদ্রতা, বিচ্ছিন্নতা, অসমাপ্তি কেবলই দেশের ঋণের বোঝা বাড়াইয়াই
চলিয়াছে, কোনোটাই পরিশোধ হইবার কোনো মূল্যকণ দেখা যাইতেছে না।”

গত অর্ধশতাব্দীকাল বলমাতার বহু কৃত্তী সন্তান আমাদের এই বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎকে
আশ্রয় করিয়া বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির—অর্থাৎ, বাংলা দেশ ও জাতির বহুবিধ
কল্যাণ ও উন্নতি বিধান করিয়াছেন; কিন্তু সে সমস্তই প্রায় ব্যক্তিগতভাবে কিংবা
দলগতভাবে। নানা জনের সমবেত চেষ্টায় সার্থকতা-পরম্পরার মধ্য দিয়া এই প্রতিষ্ঠান
সম্পূর্ণ আত্মনির্ভরশীল ও স্বপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কখনও রামেন্দুসুন্দর-ব্যোমকেশ, কখনও
হরপ্রসাদ-নলিনীরঞ্জন-অমূল্যচরণ, কখনও হীরেন্দ্রনাথ-রাধাক্ষেত্র, কখনও বঙ্কনাথ-ব্রজেননাথ
পক্ষিমাতার মত এই প্রতিষ্ঠানকে বুকের উচ্ছ্বাস দিয়া রক্ষা করিয়াছেন; শত্রু-আশ্রয়-
নিরপেক্ষভাবে শুধু সাধারণ সমস্ত ও কর্মীদের সেবার ও টানে পরিবৎ-রথের চাকা চলে
নাই। এই পদ্ধতির কুফল আজ আমরা শোচনীয়ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি। আজ যখন
এক ছুই বা তিন স্বার্থলেশহীন সঙ্কল্প ব্যক্তিকে পরিবৎ-মন্দিরের কার্যপরিচালনার জন্য
আমরা একান্তভাবে পাইতেছি না, তখনই আমাদের অস্থির হইতেছে যে, এক ছুই তিনকে
বাদ দিয়া নিরানন্দের একশো একশো-এককে ধরিলে আমাদের এতখানি বিপদ হইত না।
পরিবৎ এমন অসহায় হইয়া পড়িত না।

আগে এক ছুই তিনের পিছনে রাজা জমিদার শ্রেণীর লোক ছিলেন একাধিক; কোনও
অপ্রত্যাশিত কারণে ভরাডুবি হইতে বলিলে এক ছুই তিনের প্রভাবে তাহারাই সামলাইয়া
লইতেন। এই কাছিন্দানা পরিবৎ-নীতি সারা পৃথিবী হইতেই উঠিয়া যাইতেছে, বাংলা
দেশের বড়লোকেরা গরীব হইয়া পড়াতে এখানে অনেক পূর্বেই উঠিয়া গিয়াছে। পৃথিবীর
অস্ত্রয যথানে উঠিয়া গিয়াছে, সেখানে রাষ্ট্র-সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিপ্রতিষ্ঠানগুলি চালু
রাখিয়াছেন। এখানে পুরাতনের পতন হইয়াছে, কিন্তু নতুন তাহার দায়িত্ব একেবারেই
লয় নাই। যতক্ষণ এই সব কার্যকরী প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রায়ত্ত না হইতেছে, ততক্ষণ তো এগুলিকে
বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে। নহিলে এই পরিবৎ-বহু মূল্যবান পুণি, মূর্তি, মুদ্রা, চিত্র এবং
অসংখ্য চিত্রাশ্রয় বইয়ের যে সম্পত্তি গত বাট বৎসরের চেষ্টায় জমা হইয়াছে, বাহা আর অঙ্ক

কোথাও নাই, সেগুলি তখনই হইয়া যাইবে। সর্বনাশ হইবে বাংলা দেশ ও জাতির। এখন আমাদের উপযুক্তপরিমাণ সভ্য নাই যে, তাঁহাদের চাঁদায় সব জুটুভাবে চলিবে; এককালীন দান নাই, পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের সাহায্য হাঙ্গরভাবে নগণ্য, করপোরেশন সামান্য বা দিতেন, তাহাও বন্ধ করিয়াছেন—পরিষৎ-প্রকাশিত কয়েকটি বইয়ের আর হইতে আমরা পরিষৎকে কোনো রকমে ভাসাইয়া রাখিয়াছি। এই ভাবে বই বেচিয়া পুথিবীর আর কোনো সংস্কৃতিবুলক প্রতিষ্ঠানকে আশ্বরক্ষা করিতে হয় বলিয়া আমার জানা নাই। এখানেই দেখুন, হিন্দী-সাহিত্য-পরিষৎ, এশিয়াটিক সোসাইটি, ভাণ্ডারকর ইনস্টিটিউট প্রভৃতি কি পরিমাণ সরকারী সাহায্য পাইয়া বাচিয়া আছেন। অথচ তাঁহারা দেশ ও জাতির জন্ত বাহা করিতেছেন, পরিষৎ তাহার চেয়ে কম কাজ করিতেছেন না। যে কেহ পরিষদের পূর্বাগর ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে ইহা উপলব্ধি করিবেন।

এখন এই অবস্থায় আমাদের কর্তব্য কি? আবার নুতন করিয়া আমরা এই পরিষৎকে দেশের লোকের হাতে তুলিয়া দিতে চাই। তাঁহারাই ইহার সম্পত্তির দায়িত্ব লইবেন, ইহাকে চালু রাখিবেন। আমার হিসাবে পরিষৎকে জুটুভাবে চালাইতে হইলে মাত্র দুই হাজার মাসিক এক টাকা হারের সভ্য চাই। তখন আর কাহারও দরজায় আমাদের যাইতে হইবে না—না সরকার, না জমিদার। বাচিয়া থাকিবার জন্ত এটিকে তখন শুধু বইবেচা-প্রতিষ্ঠান হইয়াও থাকিতে হইবে না। এখন নিয়মিত টাকা দেন, এমন মাত্র পাঁচ শত সভ্য আছেন। আর মাত্র পনেরো শত সভ্য কি পরিষৎ কামনা করিতে পারেন না? এই দুই হাজার সভ্য নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা পরিষদের পরিচালন-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করিলে ব্যক্তি বা দলগত একনায়কত্বের যে সন্দেহ অনেকে করিয়া থাকেন, তাহারও আর অবকাশ থাকিবে না।

সম্পূর্ণ বিলোপ ও ভাঙন হইতে রক্ষা পাইতে হইলে এই ধরনের পরিবর্তন করিতেই হইবে—এই আমার সুচিন্তিত অভিমত। আজ বাড়ি-ভাড়া দিয়া ও বই বেচিয়া যে পরিষৎ টিকিয়া আছে—ইহা সমগ্র বাঙালী জাতির অগৌরব। এই অগৌরব হইতে অবিলম্বে বাঙালী জাতিকে বাঁচানো দরকার। আমার এই আবেদন সমগ্র বাঙালী জাতির কাছে।*

শ্রীসঞ্জয়ীকান্ত দাস

সত্যপতি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ঊনষষ্টিতম বার্ষিক কার্যাবিবরণ

বুঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ৫৯ বৎসর অতিক্রম করিয়া বর্তমান বর্ষে ৬০ বৎসরে পদার্পণ করিল। ৫৯ বৎসরের কার্য-বিবরণী সংক্ষেপে সমস্তবর্গের নিকট উপস্থাপিত করিতেছি।

শোক-সংবাদ—বিগত বার্ষিক অধিবেশনের পর হইতে আজ পর্যন্ত আমরা যে সকল পরম হিতৈষী সমস্তবর্গকে হারাইয়াছি, প্রথমেই তাঁহাদিগকে স্মরণ করিতেছি, ও তাঁহাদের কার্যাবলী সন্তুষ্টিচক্ষে উল্লেখ করিতেছি।

বিগত ১৭ই আশ্বিন জুসাহিত্যিক এবং ঐতিহাসিক ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিগত ১৮।২০ বৎসর তিনি পরিষদের নানা বিভাগে কাজ করিয়া পরিষদের সহিত একান্ত হইয়াছিলেন। ব্রজেননাথ সাহিত্য-পরিষদের কি ছিলেন এবং সাহিত্য-পরিষৎ ব্রজেননাথের কি ছিলেন, তাহা বাংলা সাহিত্যের অম্লরাণী মাঝেই জানেন। দারুণ আর্থিক অসুস্থতির সময় তিনি কর্মভার গ্রহণ করেন। একনিষ্ঠার সহিত পরিষদের সেবা করিয়া তিনি পরিষদকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও স্বাবলম্বী করিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। ব্রজেননাথের মৃত্যুর প্রায় অব্যবহিত পরে আমরা ২৩এ কার্তিক পরিষদের প্রতিষ্ঠাকালীন সভ্য, প্রাক্তন সহকারী-সভাপতি ও বিশিষ্ট-সভ্য পণ্ডিতাজগদ্য বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বশ্রদ্ধ মহাশয়কে হারাইয়াছি। পরিষৎ-পুণ্ডিশালার কাজ করিতে-করিতেই তিনি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' পুঁথি আবিষ্কার করিয়া ও বিস্তৃত টীকা-সহযোগে পরিষৎ-মন্দির হইতে তাহা প্রকাশ করিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তর আনয়ন করেন। এই পুস্তক প্রকাশের ফলে তাঁহার সহিত পরিষৎও অবিস্মরণীয় কীর্তির অধিকারী হইয়াছেন। বিগত ১৫ই আষাঢ় বিখ্যাত মনোবিদ ও প্রাক্তন সহকারী-সভাপতি ডাঃ গিরীজশেখর বসু পরলোক গমন করিয়াছেন। গিরীজশেখর তাঁহার বিভিন্নমুখী প্রতিভাধারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের স্মৃতি শ্রদ্ধার সহিত জাতির অন্তরে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। এতদ্ব্যতীত সাধারণ সদস্য ডাঃ অনিল সেন, ভূতনাথ কর, এস. আর. দাশ, হরেন্দ্রনাথ দে, দৈবকীপ্রসন্ন রায়ের মৃত্যুও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রাক্তন সদস্য হুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, রাজনীতিজ্ঞ নলিনীরঞ্জন সরকার, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহলানবীশ, শিল্পী বামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় এবং ভূতপূর্ব বিচারপতি দ্বারিকানাথ মিত্রের মৃত্যুও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পৌরপতি নির্মলচন্দ্র চন্দ্র সদস্য না হইলেও পরিষদের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। দেশনেতা শ্রীমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের অকাল-বিদ্যোপগে সমগ্র জাতি আজ শোকাবদ্ধ। রাজনীতি-ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ না করিলেও

শিক্ষা-ক্ষেত্রে তাঁহার দান এবং বাংলা ভাষার প্রসার ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁহার অপরিণীত চেষ্টা তাঁহাকে অবিস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

সুসংবাদ :—পরিষদের এবং বাংলা-ভাষাভাষীর পক্ষে দুইটি আন্দোলনের সংবাদ আমি ঘোষণা করিতেছি। প্রথম, পরিবর্তিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে, পশ্চিম বঙ্গ সরকার পরিষদের প্রয়োজনীয়তা ও বাংলা সাহিত্যের কর্মপ্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ পরিষদের সভাপতিকে পদাধিকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য হইবার অধিকার প্রদান করিয়াছেন। এই জন্য আমরা পশ্চিম বঙ্গ সরকারের সুবিবেচনার ভূমসী প্রশংসা করিতেছি।

আর একটি সুসংবাদ—অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা-ভাষাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় ভাষার তালিকাভুক্ত করিয়াছেন। বর্তমানে প্রতিবেশী রাজ্যসমূহ এবং অবাঙ্গালী নেতৃবর্গ বাংলা ভাষাকে সম্বলিত করিবার জন্য নির্লজ্জভাবে যে চেষ্টা করিতেছেন সেই কথা স্মরণ করিয়া আমরা অন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ডাঃ ভি. এস. কৃষ্ণকে তাঁহার এই উদার মনোভাবের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই প্রসঙ্গে আমি পরিষদের পুথিশালাধ্যক্ষ পণ্ডিতপ্রধান শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের পরিবর্তে কর্তৃক প্রকাশিত “বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান” পুস্তকখানির জন্য রবীন্দ্রপুরস্কার প্রাপ্তিতে তাঁহাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

এখন আমাদের নিজের কথায় আসিতেছি।

বান্ধব—বর্ষশেষে পরিষদের একজন মাত্র বান্ধব আছে :—শ্রীনরসিংহ মল্লদেব।

সদস্য—১৩৫৯ বঙ্গাব্দের শেষে পরিষদের বিভিন্ন শ্রেণীর সদস্য-সংখ্যা এইরূপ :—

বিশিষ্ট-সদস্য—১। শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়, ২। শ্রীমহনাথ সরকার, ৩। ৩। শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজীবন-সদস্য—১। রাজা শ্রীগোপাললাল রায়, ২। শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত, ৩। শ্রীগণপতি সরকার, ৪। ডাঃ শ্রীনরেন্দ্রনাথ লাহা, ৫। ডাঃ শ্রীবিমলাচরণ লাহা, ৬। ডাঃ শ্রীসত্যচরণ লাহা, ৭। শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস, ৮। শ্রীসত্যীশচন্দ্র বসু, ৯। শ্রীহরিহর শেঠ, ১০। ডাঃ শ্রীমেন্দাদ সাহা, ১১। শ্রীনেমিচাঁদ পাণ্ডে, ১২। শ্রীদীলামোহন সিংহরায়, ১৩। শ্রীপ্রশান্তকুমার সিংহ, ১৪। ডাঃ শ্রীরঘুবীর সিংহ, ১৫। শ্রীহরিশঙ্কর বসু, ১৬। শ্রীবীণাপাণি দেবী, ১৭। শ্রীমুরারিমোহন মাইতি, ১৮। শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়, ১৯। রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, ২০। শ্রীসরেন্দ্রনাথ সিংহ রায়, ২১। শ্রীতপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, ২২। শ্রীজ্ঞানভূষণ বিদ্য, ২৩। শ্রীজিবেশ বসু, ২৪। শ্রীজগন্নাথ কোলে, ২৫। শ্রীমহিমচন্দ্র ঘোষ, ২৬। শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অধ্যাপক-সদস্য—বর্ষশেষে ৫ জন।

সহায়ক-সদস্য—বর্ষশেষে ১৫।

সাধারণ-সদস্য—বর্ষশেষে কলিকাতা ও মকঃবলবাসী সংখ্যা ৬৫১।

অধিবেশন :—আলোচ্যবর্ষে এই কমিটি সাধারণ অধিবেশন হইয়াছিল। (১) অধি-

পঞ্চাশত্তম বার্ষিক অধিবেশন—২৯এ ভাদ্র ১৩৫৯, (২) বিশেষ অধিবেশন—ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে শোক-সভা—২৭এ আশ্বিন ১৩৫৯, (৩) প্রথম মাসিক অধিবেশন—৬ই অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, (৪) বিশেষ অধিবেশন—বসন্তরঞ্জন রায়ের পরলোকগমনে শোক-সভা—২০এ অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, (৫) দ্বিতীয় মাসিক অধিবেশন—২৭এ অগ্রহায়ণ ১৩৫৯, (৬) তৃতীয় মাসিক অধিবেশন—২৬এ পৌষ ১৩৫৯, (এই দিন পরিষদের সভাপতি শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ও বর্তমান বাংলা-সাহিত্য” বিষয়ে এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।) (৭) চতুর্থ মাসিক অধিবেশন—২৪এ মাঘ ১৩৫৯, (৮) পঞ্চম মাসিক অধিবেশন—৩০এ ফাল্গুন ১৩৫৯, (৯) ষষ্ঠ মাসিক অধিবেশন ও ঋষি বক্রিমচন্দ্রের বার্ষিক স্মরণোৎসব—(এই বিশেষ অধিবেশনে বক্রিমচন্দ্রের চারিখানি উপভাষার মধ্য হইতে একটি করিয়া দৃষ্ট অন্তিনীত হয়। অন্তিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন ‘জয়শ্রী-সভেব’র সদস্যগণ।)—২৮এ চৈত্র ১৩৫৯, (১০) সপ্তম মাসিক অধিবেশন—১৯এ বৈশাখ ১৩৬০, (১১) অষ্টম মাসিক অধিবেশন—২৬এ জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০, (১২) সমাধিক্ষেত্রে ও পরিষদ-মন্দিরে কবির মধুসূদন দত্তের স্মরণে বিশেষ অধিবেশন—১৫ই আষাঢ় ১৩৬০ (এই দিন ভূতপূর্ব সহকারী সভাপতি ডাঃ গিরীশচন্দ্রের বহুর পরলোকগমনে শোক-সভা হয়।) (১৩) বিশেষ অধিবেশন—শ্রীমাদ্রসদ মূখোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে শোক-সভা—২৪এ আষাঢ় ১৩৬০।

এতদ্ব্যতীত পরিষদের উদ্যোগে আলোচ্য বর্ষে বিশেষজ্ঞ-স্বারা বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। এই সকল বক্তৃতায় পরিষদের সদস্যগণ ব্যতীত বাহিরের অনেক ব্যক্তি যোগদান করেন। সে বক্তৃতাগুলি নিম্নে দেওয়া হইল।—

(১) লোক-সঙ্গীত (গম্ভীরী সঙ্গীত) :—আলোচনা : শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস, ও সঙ্গীতে অংশগ্রহণকারী শ্রীতারাপদ লাহিড়ী ও তৎসম্প্রদায়—৩ মাঘ ১৩৫৯; (২) লোক-সঙ্গীতে বঙ্গ মহিলা—শ্রীকামিনীকুমার রায়—১০ই মাঘ ১৩৫৯; (৩) ম্যাজিক লর্ডন সংযোগে বক্তৃতা—বক্তা : শ্রীনির্মলকুমার বসু। (ক) শিল্পশাস্ত্র ও ভারতের বিভিন্ন শ্রেণীর মন্দির—১৭ই মাঘ ১৩৫৯; (খ) রেখ দেউলের প্রকারভেদ—২৪এ মাঘ ১৩৫৯; (গ) বাংলা দেশের মন্দির—২রা ফাল্গুন ১৩৫৯; (ঘ) উড়িষ্যার মন্দির ও মূর্তি—৯ই ফাল্গুন ১৩৫৯; (৪) সংস্কৃতি ও ভারতীয় সংস্কৃতি—বক্তা : ডাঃ শ্রীমধীরকুমার দাশগুপ্ত—২৩এ ফাল্গুন ১৩৫৯; (৫) কবিকৃতি ও সমালোচনা—বক্তা : শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ—৩০এ ফাল্গুন ১৩৫৯; (৬) উড়িষ্যার ভাষা ও সাহিত্য এবং তাহার বর্তমান রূপ—বক্তা : শ্রীহরেকৃষ্ণ মহাতাব—২রা চৈত্র ১৩৫৯; (৭) জয়দেব ও গীতগোবিন্দ—বক্তা : ডাঃ শ্রীমুন্সীলকুমার দে—৭ই চৈত্র ১৩৫৯; (৮) ম্যাজিক লর্ডন সংযোগে বক্তৃতা—বক্তা : ডাঃ শ্রীমুন্সীলকুমার দে—৫ই বৈশাখ ১৩৬০; (৯) গোড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন—বক্তা : শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ—১২ই বৈশাখ ১৩৬০; (১০) হিন্দী সাহিত্য ও তাহার বর্তমান অবস্থা—বক্তা : ডাঃ শ্রীমহাদেবপ্রসাদ সাহা—১৯এ বৈশাখ ১৩৬০; (১১) রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসব—(ক) ২৫এ বৈশাখ ১৩৬০ কবির প্রতিকৃতিতে নাল্যদান ও সঙ্গীত; “গীতোক্তী” সম্প্রদায়ের শিল্পীগণ সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন।

(খ) ২৬এ বৈশাখ—রবীন্দ্রনাথের ঋতু সঙ্গীত—বক্তা : শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ; রবীন্দ্রনাথের ঋতু সঙ্গীত পরিবেশন—“বৈতানিক” শিল্পীরূপে শ্রীপ্রসাদ সেনের পবিচালনায় সঙ্গীতাংশে অংশ গ্রহণ করেন ; (গ) ২৭এ বৈশাখ ১৩৬০—অভিনয় “গান্ধারীর আবেদন” ও “বৈকুণ্ঠের খাতা”—পরিষদের সমস্ত ও সমজাগণ অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেন ; (১২) গোড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন—বক্তা : শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ—২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ; (১৩) আধুনিক বাংলা ভাষা—বক্তা : শ্রীচন্দ্রাহরণ চক্রবর্তী—২ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ; (১৪) গোড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন—বক্তা : শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ—১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৬০ ।

কার্যালয়—সভাপতি : শ্রীসজনীকান্ত দাস । সহকারী সভাপতি : শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীভারতেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়, শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ, শ্রীযত্ননাথ সরকার ও শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত । সম্পাদক : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—১৭।৬।৫২ তারিখে ব্রজেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয় । শ্রুতস্থানে অত্রতম সহকারী সম্পাদক শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন । সহকারী সম্পাদক : শ্রীপাচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল—ইনি পরে সম্পাদক পদে নির্বাচিত হইলে শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় সহকারী সম্পাদক নির্বাচিত হন, ও শ্রীহরলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । কোষাধ্যক্ষ : শ্রীগণপতি সরকার । চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীচন্দ্রাহরণ চক্রবর্তী । পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীদীনেশচন্দ্র তর্কচাণ্য । গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা ।

কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্য—(ক) সদস্যপক্ষে : ১। শ্রীঅতুল সেন, ২। শ্রীআনন্দোষ তর্কচাণ্য, ৩। শ্রীইন্দ্রজিত্ রায়, ৪। কাদার এ দৌতেন, ৫। শ্রীকামিনীকুমার কন্ন রায়, ৬। শ্রীগোপালচন্দ্র তর্কচাণ্য, ৭। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ১০। শ্রীভারতপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, ১১। শ্রীজিহবিনাথ রায়, ১২। শ্রীদীনেশচন্দ্র তর্কচাণ্য, ১৩। শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৪। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ১৫। শ্রীনলিনীকুমার ভট্ট, ১৬। শ্রীবরদাশঙ্কর চক্রবর্তী, ১৭। শ্রীবিজনবিহারী তর্কচাণ্য, ১৮। শ্রীমনোমোহন ঘোষ, ১৯। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ও ২০। শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহরায় । শৈলেন্দ্রবাবু সহকারী সম্পাদক পদে নির্বাচিত হইলে শ্রুতস্থানে শ্রীপুলিনবিহারী সেন নির্বাচিত হন । (ঘ) শাখা-পরিষদ-পক্ষে :—২১। শ্রীঅতুলচরণ দে, ২২। শ্রীজহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ২৩। শ্রীমণীষিনাথ বসু, ও ২৪। শ্রীমাণিকলাল সিংহ ।

নির্দিষ্ট কার্য ব্যতীত কার্য-নির্বাহক-সমিতি নিম্নলিখিত বিশেষ কার্যগুলি সম্পাদন করিয়াছেন :—

১। (ক) কবির হেমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর এক প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে । এই গ্রন্থাবলী ১৩৬০ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ মাস হইতে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হইয়াছে । গ্রন্থাবলী সম্পাদনা করিতেছেন শ্রীসজনীকান্ত দাস । (খ) এতদ্ব্যতীত

শ্রীমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়-সঙ্কলিত “জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি” টাকা-টীপনা সংযোগে প্রকাশের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকের গ্রন্থবন্ধ বসন্তবাসু পরিষৎকে দান করিয়া রুতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

২। পূত-৮ই শ্রাবণ পরিষৎ ৫৯ বৎসর অতিক্রম করিয়াছে। এই বৎসর পরিষদের হীরক-জয়ন্তীর বৎসর। ইহার অন্ত এই বৎসরের শীতকালে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান করিবার চেষ্টা চলিতেছে।

৩। পরিষদের ইলেকট্রিকের-তার প্রভৃতি জীর্ণ হওয়ায়, আশু সংস্কারের প্রয়োজন। এজন্য যথাসম্ভব শীঘ্র এগুলি সংস্কার করিয়া যথাযথ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

৪। কার্য-নিরীক্ষক-সমিতির সভ্য-নিরীক্ষনে ভোট গণনা করিবার অন্ত শ্রীনলিনীকুমার ভট্ট, শ্রীপাচুগোপাল গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীপ্রবোধকুমার দাস ও শ্রীহেমরঞ্জন বসুকে লইয়া একটি সমিতি গঠিত হয়।

৫। পরিষদের গ্রন্থাবলী প্রকাশ বিষয়ে কার্য-নিরীক্ষক-সমিতিকে পরামর্শ দিবার অন্ত ও অন্তান্ত ব্যবস্থা করিবার অন্ত একটি শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই শাখা-সমিতিতে আছেন,—শ্রীজিদিবনাথ রায়, শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীহুশীলকুমার দে এবং পরিষদের সম্পাদক ও সভাপতি।

৬। কার্য-নিরীক্ষক-সমিতির কার্যে সহায়তার অন্ত সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ও ইতিহাস শাখা গঠিত ও আয়-ব্যয়, পুস্তকালয়, চিত্রশালা ও ছাপাখানা সমিতি গঠিত হয়।

প্রতিনিধি প্রেরণ—আলোচ্য বৎসরে পরিষৎ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও সমিতিতে যে সকল প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছেন, সেই সকল প্রতিষ্ঠান ও সমিতির পরিষৎ-নির্বাচিত প্রতিনিধির নাম নিম্নে দেওয়া হইল।—

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নলিখিত পদক, পুরস্কার ও বক্তৃতা সমিতিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছিলেন—

(ক) কমলা-বক্তৃতা সমিতি—শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য,

(খ) গিরিশচন্দ্র ঘোষ-বক্তৃতা সমিতি—শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল,

(গ) শরৎচন্দ্র-বক্তৃতা সমিতি—শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,

(ঘ) সরোজিনী বসু-পুরস্কার সমিতি—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

২। গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

৩। পুণা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বিগত ষোল্ল মাসে ‘ভারতীয়-ভাষা-বিকাশ-পরিষদ’ নামে এক সর্ব-ভারতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। আচার্য শ্রীযতুনাথ সরকার এই অধিবেশনে পরিষৎ-পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন।

৪। পরিষদ-সম্পাদক পদাধিকার বলে ‘নিখিল-ভারত বঙ্গ সাহিত্য-সম্মেলন’র কার্যকারী সমিতিতে প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—আলোচ্য বর্ষেও উনব্বিতিতম ভাগ পত্রিকা দুইটি বৃদ্ধ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।

পুঁথিশালা—আলোচ্য বর্ষে পুঁথিশালায় নূতন সংগৃহীত নিম্নলিখিত ২০ খানি পুঁথির মধ্যে ১৭ খানি উপহার স্বরূপ এবং বাকী ৩ খানি পুরাতন পত্র-রাশি বাছিয়া পাওয়া গিয়াছে।—

ক্রমিক সংখ্যা	পুঁথির নাম	রচয়িতা		
১	মহাভারত—সভাপর্ক	বেদব্যাস	১৭১৬	শকাব্দ
২	—বনপর্ক	"	১৭২১	"
৩	—বিরাট পর্ক	"	১৭২০	"
৪	—উদ্যোগ পর্ক	"	১৭১৮	"
৫	—ভীষ্ম পর্ক	"	১৭১৮	"
৬	—দ্রোণ পর্ক	"	১৭১৯	"
৭	—কর্ণ পর্ক	"	১৭১৯	"
৮	—শল্য, গদা, সৌপ্তিক ও জ্ঞী পর্ক	"	১৭১৭	"
৯	—শান্তি ও রাজধর্ম পর্ক	"	১৭২০	"
১০	—শান্তি ও দান পর্ক	"		
১১	—শান্তি ও মোক্ষ পর্ক	"	১৭২০	"
১২	—হরিবংশ পর্ক	"	১৭২০	"
১৩	রামায়ণ—আদি, অযোধ্যা ও অরণ্য কাণ্ড	বাল্মীকি	১৬৯৩-৯৪	"
১৪	—কিষ্কিন্ধ্যা, কুমারী ও লঙ্কা কাণ্ড	"	১৬৯৪-৯৫	"
১৫	অধ্যাত্ম রামায়ণ	মহাদেব কবিত		
১৬	মাধব মালতী	রামচন্দ্র মুখুটী		
১৭	নামহীন পুঁথি	কপি গীষাধর		
১৮	অমর শতক	অমর কবি	১৫৮৭	শকাব্দ
১৯	ছন্দোমঞ্জরী	গঙ্গাদাস কবিরাজ	১৬৫০	"
২০	বৃন্দাবন কাব্য	উদ্যোতনোত্তম মানিক		

রমেশ-স্তবন—আলোচ্য বর্ষে ইহার সম্পূর্ণ বিতলটি রেশনিং অফিসরূপে এবং নিম্নতলের দক্ষিণদিগন্ত বারান্দা 'সাহিত্য-পরিষৎ-পোষ্ট অফিস'রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দান—"Journals" প্রকাশ-বাবদ পশ্চিমবঙ্গ-সরকার ২০০০, ১ দান করিয়াছেন। গ্রন্থ প্রকাশের অল্প বার্ষিক সাহায্যও ১২০০, পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ব্যতীত পরিষদের বিভিন্ন বিভাগের উন্নতির জন্য দানের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার আবেদন করা হয়। বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারি আমরা পরিষদের বর্তমান বৎসরের কাণ্ডের পরিকল্পনা সমেত অর্থসাহায্যের জন্য একটি আবেদন করি। পরিতাপের বিষয়, আমাদের

সে আবেদনের কোন ফলই হয় নাই। সরকার পরিষদের পুস্তকাদির তালিকা প্রণয়নের জন্য ২৫০০০/- দিতে স্বীকৃত হইয়া ১৩৫৬ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে ৫০০০/- দান করেন। ইহাতে আংশিক ভাবে তালিকা সম্বলনের কাজ হইয়াছিল; বাকী সাহায্য না পাওয়ায় এই কাজ আর অগ্রসর হইতে পারে নাই। অত্যন্ত চুঃখের সহিত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অরুণ করাইয়া দিতেছি যে, পরিষদের জ্ঞান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সম্বন্ধে যদি তাঁহারা উদার মনোভাব প্রদর্শন করিতে কার্পণ্য করেন, তাহা হইলে দেশের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই সমুচিত হইবে এবং অদূর-ভবিষ্যতে বাঙ্গালী জাতির একটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান লুপ্ত হইবে। অত্যন্ত চুঃখের বিষয়, অর্থের অনটনের জন্য পরিষদ-প্রোগ্রামারের পুস্তক-তালিকা সম্পূর্ণ না হওয়াতে অসুসঙ্গিত ছাত্রগণ তাঁহাদের কার্যে পরিপূর্ণ সহায়তা লাভ করিতে পারিতেছেন না। পরিষদ-মন্দির সংস্কারের অভাবে জীর্ণ এবং যে কোন দিন যে-কোন বিপদ ঘটিবার আশঙ্কা আছে। পরিষদ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জনসাধারণের সম্পত্তি। এই কথা বিবেচনা করিয়া আশা করি সরকার তাঁহাদের বহুমুখী সম্প্রদায়িত করিয়া পরিষদকে সাহায্য করিয়া জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বজায় রাখিতে অগ্রণী হইবেন।

গ্রন্থ-প্রকাশ—১। সাধারণ তহবিলের অর্থে। (ক) ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বলিত 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় নূতন ১১৯৩১৪ সংখ্যক পুস্তকে গিরীশচন্দ্র বসু, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমীলা নাগ ও নিরুপমা দেবীর জীবনী ও ৯২ সংখ্যক পুস্তকে ত্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'রামপ্রসাদ সেনের জীবনী' প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই চরিতমালায় ২৪২৫ সংখ্যক পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ ও ৪১ সংখ্যক পুস্তকের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। (খ) ব্রজেননাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ত্রীসজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। ২। ঝাড়গ্রাম-গ্রন্থ প্রকাশ তহবিল হইতে ইতিপূর্বে (ক) 'রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী'র ১ম, ৩য়, ৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হয়, আলোচ্য বর্ষে ২য়, ৪র্থ, ও ৭ম খণ্ড প্রকাশিত হইলে রামমোহনের সমগ্র বাংলা রচনাবলী এক খণ্ডে বাঁধানো হইয়াছে। এই গ্রন্থাবলীর ৩য় খণ্ডটির ২য় সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) দীনবন্ধু মিত্রের 'ষাদশ কবিতা', 'কমলে কামিনী', 'বিবিধ-গল্পপত্র', 'নবীন ভপস্বিনী', 'লীলাবতী', 'শ্রবণী কাব্য,—এই ছয় খানি পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। (গ) বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজ সিংহ' (৪র্থ সং), 'লোক রহস্য' (৩য় সং) প্রকাশিত হইয়াছে।

আলোচ্য বর্ষেও 'সিকার্ডো'র 'ধনবিজ্ঞানে'-এর মুদ্রণ-কার্য শেষ হয় নাই। আশা করা যায় ১৩৬০ বঙ্গাব্দের মধ্যেই পুস্তকটির মুদ্রণ-কার্য শেষ হইবে।

শাখা-পরিষৎ :—আলোচ্য বর্ষে মানপুরের (মানভূম) 'মিলনী সভা'কে শাখা-পরিষৎ স্থাপন করিতে অসুমতি দেওয়া হয়। তবে ইহার উত্তোষন সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই।

এতদ্ব্যতীত মূল পরিষৎ এবং ইহার শাখাগুলির সহিত পরিষদের সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করিবার জন্ত কার্য-নির্বাহক সমিতির নির্দেশমত শ্রীসজনীকান্ত দাস, শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল, শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীজহরলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীপুলিনবিহারী সেন ও শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষকে লইয়া একটি শাখা-সমিতি গঠিত হয়। নানা কারণে এই শাখা-সমিতির কোন সভা অষ্টাবিধি আহ্বান করা যায় নাই। আশা করা যায়, আগামী বৎসর এ বিষয়ে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করা হইবে।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের শিল্প শাখা তাঁহাদের নিজস্ব পরিষৎ-মন্দির নির্মাণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। শিল্প-এর কর্মীবৃন্দকে এজন্ত আমরা আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

চিত্র-প্রতিষ্ঠা—কবি ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরীর একটি তৈলচিত্র গত ৩৮/৫৯ তারিখের প্রথম মাসিক অধিবেশনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই তৈলচিত্র বসিরহাটের ভূজঙ্গধর রায়চৌধুরী-স্মৃতি-সমিতি দান করিয়াছেন।

নিয়মাবলীর পরিবর্তন : গত ২৮/১২/৫৯ তারিখে বর্ষ মাসিক অধিবেশনে ৯ সংখ্যক নিয়মাবলীতে সংযোজনের জন্ত নিম্নলিখিত নিয়মটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে :—

“যে কোন সাধারণ সদস্য যিনি একাদিক্রমে অন্তর ১৫ বৎসর পরিষদের সদস্যশ্রেণীভুক্ত আছেন, তিনি এককালীন ১৫০ টাকা পরিষদকে দান করিলে, কার্য-নির্বাহক সমিতি ও সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে আত্মীয় সদস্যরূপে গণ্য হইবেন।”

কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান :—বিগত বাৎসরিক কার্য-বিবরণে উল্লেখ করিবার পর আলোচ্য বর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য পাওয়া যায় নাই। আলোচ্য বর্ষে পরিষদকে একটি ‘জনহিতকর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান’ বলিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বীকার করিয়াছেন এবং সরকারী গেজেটে এই মর্মে বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করিয়াছেন। তথাপি পরিষৎ, পৌর প্রতিষ্ঠানের সাহায্য হইতে কেন বঞ্চিত হইল তাহার কারণ আমরা জানি না। আশা করি, পৌর প্রতিষ্ঠান তৎপর হইয়া তাঁহাদের সাহায্য অবিলম্বে প্রদান করিবেন। অবশ্য পূর্বের তায় এ বৎসরও পৌর প্রতিষ্ঠান পরিষদের ট্যাক্স রেহাই দিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

দুঃস্ব-সাহিত্যিক-ভাণ্ডার :—আলোচ্য বর্ষে এই ভাণ্ডার হইতে সাত জনকে নিয়মিত মাসিক সাহায্য দান করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে পাঁচজন সাহিত্যিকের বিষয়া পত্নী, একজন মহিলা সাহিত্যিক ও একজন পুরুষ সাহিত্যিক।

এই ভাণ্ডার প্রধানত পুলিনবিহারী দত্ত প্রদত্ত টাকার স্রব হইতে পরিচালিত হয়। কিন্তু বর্তমানে স্রবের হার কমিয়া যাওয়ায় নূতন অর্থ সাহায্য দ্বারা ভাণ্ডারের সঞ্চয় বৃদ্ধি না হইলে ভবিষ্যতে পরিষদের এই অতি প্রয়োজনীয় কার্যটি বন্ধ হইবার আশঙ্কা আছে। আশা করি, দেশবাসী এ বিষয়ে যথাকর্তব্য করিবেন।

গ্রন্থাগার—আলোচ্য বর্ষে গ্রন্থাগারে ২৬৪ খানি পুস্তক ও পত্রিকা (ক্রীত ৬৭ ও উপহারপ্রাপ্ত ১৯৭ খানি) সংযোজিত হইয়াছে।

ক্রীত পুস্তকের মধ্যে দুই-আড়াই বৎসরের 'সংবাদ-প্রভাকর' (১২৬০।৬।৬২ সাল) উল্লেখযোগ্য।

আলোচ্য বর্ষে বহু অল্পসংখ্যক পাঠককে পরিষৎ-গ্রন্থাগার হইতে দুপ্রাপ্য পুস্তক পত্রিকা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়।

উপসংহার :—বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ৫৯ বৎসর অতিক্রম করিয়া ৬০ বর্ষে পদাপণ করিল। পরিষদের এই ৫৯ বৎসরের ইতিহাস যে কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষে গৌরবের ও গর্বের বিষয়। তৎসঙ্গেও পরিষদের বর্তমান কক্ষ-পরিষৎ উপলব্ধি করেন যে অনেক কিছুই করা উচিত ছিল, যাহা নানা কারণে করা যায় নাই এবং অদূরভবিষ্যতে যুগোপযোগী অনেক কিছুই করিবার প্রয়োজন আছে। অনারহু কার্য করিবার দায়িত্ব দেশের ছাত্র, যুবক ও নবীন-সাহিত্যিকদের। ভাগ্যহত বাঙ্গালী নানা প্রকারে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত। ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাংলা বিচ্ছিন্ন এবং অ'জ বাঙ্গালী বিভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী। হুঃখের বিষয় আমাদের প্রতিবেশীরাও আমাদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন নহেন। এই হৃদয়ে বাঙ্গালীর একমাত্র গর্বের বস্তু তাহার ভাষা ও সাহিত্য। সেই ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিবার গৌরব ও প্রসারিত করিবার দায়িত্ব দেশের বর্তমান ও অনাগত দিনের যুবকদের। ১৮৫৮ বঙ্গাব্দের বার্ষিক অধিবেশনে স্বর্গত ব্রজেননাথ পরিষদের কর্মতার গ্রহণ করিবার জন্ত দেশের যুবক ও ছাত্রদের সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। ব্রজেননাথের কর্মশক্তি ও যোগ্যতা আমার নাই। তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমি আবার সমস্ত বাংলা ভাষাভাষী, বিশেষতঃ যুবক ও ছাত্র সম্প্রদায়কে পরিষদের কর্মতার গ্রহণ করিয়া, পরিষদের বার্ষিক-পীড়িত কক্ষীদের অবসর দিবার জন্ত আহ্বান জানাইতেছি।

বহুজনের কথিত ভাষা হিগাবে হিন্দী সরকারী ভাষার মর্যাদা পাইয়াছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের লক্ষ্য বাংলা ভাষাকে সমগ্র ভারতের সাংস্কৃতিক ভাষায় পরিণত করা। আশা করি আমরা সকলে এ বিষয়ে অবহিত হইব। ইহাই আমার আশা, আকাঙ্ক্ষা ও নিবেদন। বন্দেমাতরম্।

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সম্পাদক

হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলীর নিম্নলিখিত গুপ্তকণ্ঠলি প্রকাশিত হইল

সম্পাদক : শ্রীসঞ্জীকান্ত দাস

- ১। বৃহৎসংহার কাব্য (১-২ খণ্ড) ৫/- ২। আশাকামন ২/- ৩। বীরবাহু কাব্য ১৫/-
৪। ছান্নাময়ী ১৫/- ৫। দশমহাবিদ্যা ৫/- ৬। চিন্তা-বিকাশ ১/-
৭। কবিতাবলী ৪/- সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্যরথীদের গ্রন্থাবলী

সম্পাদক : ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসঞ্জীকান্ত দাস

বক্ষিমচন্দ্র

উপভাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গীতা
আট খণ্ডে রেজিনে আবৃত্ত বাধাই। মূল্য ৭২/-

ভারতচন্দ্র

অন্নদামঙ্গল, রসমঞ্জরী ও বিবিধ কবিতা
রেজিনে বাধানো—১০/-
কাগজের মলাট—৮/-

দ্বিজেন্দ্রলাল

কবিতা, গান, হাসির গান
মূল্য ১০/-

পাঁচকড়ি

অধুনা-দ্ব্যাপ্য পত্রিকা হইতে নির্বাচিত
সংগ্রহ। দুই খণ্ডে। মূল্য ১২/-

মধুসূদন

কাব্য, নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা
রেজিনে আবৃত্ত বাধাই। মূল্য ১৮/-

দীনবন্ধু

নাটক, প্রহসন, গল্প-পুস্তক দুই খণ্ডে
রেজিনে আবৃত্ত বাধাই। মূল্য ১৮/-

রামেন্দ্রসুন্দর

সমগ্র গ্রন্থাবলী পাঁচ খণ্ডে।
মূল্য ৪৭/-

শরৎকুমারী

‘সুতবিবাহ’ ও অন্যান্য
সামাজিক চিত্র। মূল্য ৬৫/-

রামমোহন

সমগ্র বাংলা রচনাবলী রেজিনে আবৃত্ত বাধাই। মূল্য ১৬৫/-

বলেদ্র-গ্রন্থাবলী

বলেদ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী। মূল্য ১২৫/-

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

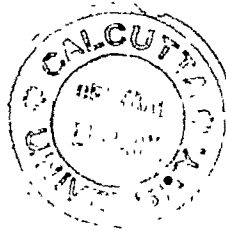
সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

৬০ ভাগ, তৃতীয় সংখ্যা

পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীত্ৰিদিবনাথ রায়



২৫০১, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ মন্দির

হইতে শ্রীদীনবন্ধু রায় কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬০ বর্ষের কৰ্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি

শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস

সহকারী সভাপতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

শ্রীগণপতি সরকার

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

শ্রীতারানাথকর বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীস্বনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

রাজা শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়

শ্রীসুশীলকুমার দে

সম্পাদক

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল

সহকারী সম্পাদক

শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীমনোমোহন ঘোষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

কোষাধ্যক্ষ : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ গুহ রায়

পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীনির্মলকুমার বসু

কার্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

- ১। শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, ২। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৩। শ্রীকুমারেশ ঘোষ, ৪। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৫। শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৬। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ৭। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৯। রেভাঃ ফাদার এ. এ. দৌতেন, ১০। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ১১। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১২। শ্রীপ্রবোধকুমার ঘোষ, ১৩। শ্রীপ্রভাষরী দেবী, ১৪। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীবিজ্ঞানবিহারী ভট্টাচার্য, ১৬। শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৭। শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত, ১৮। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, ১৯। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ জাহা, ২০। শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, ২১। শ্রীচিত্তরঞ্জন রায়, ২২। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়, ২৩। শ্রীযাপিকলাল সিংহ, ২৪। শ্রীজলিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৬০ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা

সূচি

১। কবীর ও পূর্বভারতীয় সাধনা	—শ্রীঅধার চট্টোপাধ্যায় ...	১০৭
২। গৌরববিজয়ের রচয়িতা প্রবন্ধের (প্রতিবাদ)	—ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ...	১১৪
৩। বাংলা ভাষার বিজ্ঞানস্বরূপ কাব্য	—শ্রীদ্বিবিবনাথ রায় ...	১২২
৪। বঙ্গী ও সিনি ঠাকুর	—শ্রীমাণিকলাল সিংহ ...	১৩৮
৫। কাষিকার বারমাতা	—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ...	১৪০
৬। মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত—সক° শ্রীশুভেন্দু সিংহ রায় ও শ্রীঅবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	...	১৪২



পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রদত্ত বহুসম্মানিত ১৯৫১-৫২ রবীন্দ্র-স্মারক-পুরস্কারপ্রাপ্ত

শ্রীঅবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী :

সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম-২য় খণ্ড : মূল্য ১০/- + ১২।০

সেকালের বাংলা সংবাদপত্রে (১৮১৮-৪০) বঙ্গালী-জীবন
সময়ে যে-সকল অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়, তাহারই সম্বলন।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : (৩য় সংস্করণ) ৪/-

১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশের
সংস্করণ ও সাধারণ মঙ্গলকালের প্রামাণ্য ইতিহাস।

বাংলা সাময়িক-পত্র ১ম-২য় ভাগ ৫/- + ২৪।০

১৮১৮ সালে বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্মাবধি বর্তমান
শতাব্দীর পূর্ব পর্যন্ত সকল সাময়িক-পত্রের পরিচয়।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ১ম-৮ম খণ্ড (২০খানি পুস্তক) ৪৫/-

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্য-সাধক ইহার
উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

১৯৫২-৫৩ রবীন্দ্র-স্মারক-পুরস্কারপ্রাপ্ত

বঙ্গালীর সারস্বত অবদান (বহু নব্যজ্ঞান চর্চা) ১০/-

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—২৪০।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা

শ্রীরাজশেখর বসু অনূদিত

কালিদাসের মেঘদূত

॥ মূল, অনুবাদ, অম্বয় সহ ব্যাখ্যা ও টীকা সংবলিত ॥

মেঘদূতের অনেকগুলি বাংলা পট্টানুবাদ আছে। পট্টানুবাদ যতই সুরচিত হউক, তাহা মূল রচনার ভাবাবলম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য। ইহাতে প্রথমে মূল শ্লোক, তাহার পর ষাণ্মাস্তব মূলানুবাদী স্বচ্ছন্দ বাংলা অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অনুবাদে সমাসবহুল সংস্কৃত রচনার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, সেই জন্য পুনর্বার অম্বয়ের সহিত ষাণ্মাস্তব অনুবাদ ও প্রয়োজন অনুসারে টীকা দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ মূল্য দেড় টাকা

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত

অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরম্ভে বর্তমান ছিলেন। কাব্যহিসাবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত দুরোপীয় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে—তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে কালিদাসের কাব্যের সমপর্যায়ের কাব্য বলিয়া মনে করেন। কোনো ভারতীয় ভাষায় ইতিপূর্বে ইহার অনুবাদ হয় নাই।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ॥ প্রতি খণ্ড দেড় টাকা

শ্রীরমা চৌধুরী অনূদিত

নারী-কবিগণ কর্তৃক রচিত

কবিতাবলী

বাংলা ভাষায় কোনো অনুবাদ না থাকায় বৈদিক নারী-ঋষি ও তৎপরবর্তী কালের নারী-কবিদের রচনা এত কাল জনসাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। এই গ্রন্থে ২৬ জন বৈদিক নারী-ঋষির ২৫০টি ঋক্, ৩২ জন নারী-কবির ১৪২টি সংস্কৃত কবিতা ও ৯ জন নারী-কবির ১৬টি প্রাকৃত ঋষিতার বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে।

মূল্য দুই টাকা

বিশ্বভারতী

৬৩ ছারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলীর নিম্নলিখিত গুস্তকগুলি প্রকাশিত হইল

সম্পাদক : শ্রীসঞ্জনীকান্ত দাস

- ১। বুদ্ধসংহার কাব্য (১-২ খণ্ড) ৫/- ২। আশাকানন ২/- ৩। বীরবাহু কাব্য ১৪/-
৪। ছানাময়ী ১৪/- ৫। দশমহাবিভা ৮/- ৬। চিত্ত-বিকাশ ১/-
৭। কবিতাবলী ৪/- ৮। রোমিও-জুলিয়েট ২৪/- ৯। নলিনী-বসন্ত ১৪/-
১০। চিন্তাতরঙ্গিনী ১/- শীঘ্রই অদৃষ্ট রেঞ্জিনে বাধাই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্যরথীদের গ্রন্থাবলী

সম্পাদক : ভ্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসঞ্জনীকান্ত দাস

বক্ষিমচন্দ্র

উপভাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গীতা
আট খণ্ডে রেঞ্জিনে অদৃষ্ট বাধাই। মূল্য ৭২/-

ভারতচন্দ্র

অন্নদামঙ্গল, রসমঞ্জরী ও বিবিধ কবিতা
রেঞ্জিনে বাধানো—১০/-
কাগজের মলাট—৮/-

দ্বিজেন্দ্রলাল

কবিতা, গান, হাসির গান
মূল্য ১০/-

পাঁচকড়ি

অধুনা-হুম্মাপ্য পত্রিকা হইতে নির্বাচিত
সংগ্রহ। ছই খণ্ডে। মূল্য ১২/-

মধুসূদন

কাব্য, নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা
রেঞ্জিনে অদৃষ্ট বাধাই। মূল্য ১৮/-

দীনবন্ধু

নাটক, প্রহসন, গল্প-পত্ন ছই খণ্ডে
রেঞ্জিনে অদৃষ্ট বাধাই। মূল্য ১৮/-

রামেন্দ্রসুন্দর

সমগ্র গ্রন্থাবলী পাঁচ খণ্ডে।
মূল্য ৪৭/-

শরৎকুমারী

‘সুতবিবাহ’ ও অন্যান্য
সামাজিক চিত্র। মূল্য ৬৪/-

রামমোহন

সমগ্র বাংলা রচনাবলী রেঞ্জিনে অদৃষ্ট বাধাই। মূল্য ১৬৪/-

বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলী

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী। মূল্য ১২৪/-

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

উত্থাপ্ত ভূমিকা সহ কয়েকখানি

বিশিষ্ট গ্রন্থের প্রামাণিক সংস্করণ

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন—	বনমতরঞ্জন রায় বিশ্বব্রত	...	৬।০
বোধগান ও দৌহা	—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	...	৫
শকুন্তলা	—ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞানাগর	...	১
সীতার বনবাস	—ঐ	...	১
পালামো	—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	১০
স্বর্ণলতা	—ভারকমাধ পল্লোপাধ্যায়	...	২।০
সারদামঙ্গল	—বিহারীলাল চক্রবর্তী	...	১
মহিলা [(১ম ও ২য় খণ্ড)	—অরেন্দ্রনাথ মজুমদার	...	২
আলালের ঘরের দুলাল—	প্যারীচাঁদ মিত্র	...	৩।০
হুতোম প্যাঁচার নকশা	—কালীপ্রসন্ন সিংহ	...	৪।০
পদ্মিনী উপাখ্যান	—রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	...	১
সে কাল আর এ কাল—	রাজনারায়ণ বসু	...	১
স্বপ্ন	—গিরীন্দ্রশেখর বসু	...	২।০
পুরাণপ্রবেশ	ঐ	...	৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১ আপার সাকুলার-রোড, কলিকাতা-৬



সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৩০ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা

১৩৩০

কবীর ও পূর্বভারতীয় সাধনা

শ্রীমুখার চট্টোপাধ্যায়

(২)

গত বার আলোচনা করে দেখিয়েছিলাম যে, কবীরের সঙ্গে পূর্বভারতীয় সাহিত্য ও ধর্মমতের নিবিড় সম্বন্ধ আছে। দেখিয়েছিলাম যে, সিদ্ধাচার্য্যদের সহজ সাধনার ভাষা, আউল-বাউলের সাধনার ধারা, বৈষ্ণব সাধনা, নান্দবর্ম্ম ও মহাযান সম্প্রদায়ের ধারা, সবই এসে কবীরের মাঝখানে মিশেছে। আরও দেখিয়েছিলাম যে, বাংলার চর্যাপদ, চণ্ডীদাসের সাহিত্য ও বাংলা মিথিলায় প্রচলিত বিজ্ঞাপতিব পদের সঙ্গে কবীরের কি অদ্ভুত মিল আছে। এবার দেখা বাক যে, কবীরের মধ্যে বাংলা ভাষা কেমন করে একটি স্তররূপে আঙু ও বিস্তারিত আছে, তার পর কবীরে বাঙালীজ্ঞানোচিত মনোবৃত্তি এবং কবীরের “ধর” ও “বোলী” সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

কবীরের ভাষা

যদি আমরা কবীরের ভাষাকে বিশ্লেষণ করে দেখি, তবে দেখব—কবীরের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের বিভিন্ন ভাষা এসে তাঁর সর্বধর্ম্মসম্বন্ধের বাণীকে চিরন্তন করে রেখেছে। শ্রামশূন্য দাস “কবীর-প্রভাবলী”র মাঝখানে দেখিয়েছেন যে, কবীরের ভাষা “খিচরী” অর্থাৎ খিঁচুড়ী বা মিশ্রিত ভাষা। এর মধ্যে আছে পঞ্জাবী, রাজস্থানী, ব্রজভাষা, আউরী, বিহারী, বাংলা, ফার্সী ও আরবী। এই বহুভাষাসম্বন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে অভিনব ব্যাপার নয়। যদি আমরা বৌদ্ধ গাথা-সংস্কৃত সাহিত্য থেকে শুরু করে আধুনিক কালে টি. এস. এলিয়টের সাহিত্য পর্যন্ত আলোচনা করে দেখি, তবে দেখবো যে, এই ভাষা-সম্বন্ধ একটা পুরানো রীতি মাত্র। অনেক দিন ধরে এর ধারা চলে আসছে এবং আজ পর্যন্ত এর জের শেষ হয়নি। অনেকে কবীরের এই ভাষা-সংকরতাকে ভাল চোখে দেখেননি। কিন্তু হিন্দীর সমালোচকেরা কি করে ভুলে যেতে পারেন রহীমের অপূর্ণ শূন্য “মদনাষ্টক” কবিতাকে; বাঙালী সমালোচকেরা নিশ্চয় দ্বিভাষ্যজ্ঞানের ‘হাসির গান’কে এই ভাষা-সংকরতার জন্ত অপছন্দ করেননি। কবীরের মধ্যে পঞ্জাবীর প্রভাবের ব্যাখ্যা প্রয়োজন। তবে রাজস্থানী ও ব্রজভাষার ব্যবহার কবীরের পক্ষে খুব অসম্ভব মনে হয় না। কারণ, উত্তরভারতের বিভিন্ন অংশে রাজস্থানী ভাষায় বিরচিত ‘বীরগাথা কাব্য’ তখন প্রচলিত ও ব্রজভাষার চেউ তখন সমস্ত উত্তরভারতকে বিচলিত করেছে। ফার্সী ও আরবী ভাষার ব্যবহারও কবীরের পক্ষে মোটেই অসম্ভব মনে হয় না। কেন না, এই দুইটি ভাষা রাজকীয় সমাদরের কল্যাণে বহুল প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ মুসলমানগৃহে লালন-পালন ও

মুসলমান ঞ্জসম্প্রদায়ে বিচরণ কবীরের বাণীর উপর প্রভাব বিস্তার করবে বই কি ! কিন্তু কবীরের পক্ষে বাঙলা ও বিহারী ভাষার ব্যবহার একটু বিচিত্র বলে মনে হয়। বিহারের ভাষা ও বাংলার ভাষা বেশী সমানব তো প্রাকৃত অংশে পায়নি। বিজ্ঞাপতির জন্ত মৈথিলী অনেক পরবর্তী কালে সমাদৃত হয়েছিল এবং ভারত অনেক পরবর্তী কালে বাংলা। কবীরের মধ্যে বাংলা ভাষা ও বিহারী ভাষার ব্যবহার বিশেষ বিস্ময়কর। কেউ কেউ বলেছেন, কবীর বিহার ও বাংলার অনেক সাধুসন্ত ও শিষ্যদের সঙ্গে মিশেছিলেন বলে তাঁর মধ্যে বাংলা ও বিহারী ভাষার প্রভাব দেখা যায়। যদিও এই ব্যাখ্যা খুবই নির্ভরযোগ্য, তবুও কবীরের মধ্যে বাংলা ও বিহারী ভাষার ব্যবহারের আর কোন কারণ থাকতে পারে না কি ? এ আলোচনা পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের জন্তে রেখে দিয়ে আমরা এখন দেখি, কবীরের মধ্যে বাংলা ভাষা কি রকম ভাবে আছে। এই প্রসঙ্গে আমরা কবীরের মধ্যে পঞ্জাবী ভাষা সম্বন্ধে আলোচনা করব। কেন না, কবীরের মধ্যে শ্রামসুন্দর দাস যেখানে পঞ্জাবী ভাষার বৈশিষ্ট্য দেখেছেন, সেখানে কোনও কোনও জায়গায় বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্যও দেখা যায় বলেই আমাদের বিশ্বাস।

শ্রামসুন্দর দাস কবীরের ভাষা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে, কবীরের মধ্যে পঞ্জাবী ভাষার নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :—

১। “ন” স্থলে “ণ”

২। পঞ্জাবী স্তবচন, যথা—

(ক) জুণ বিজুগা পাণিয়া, পাণী জুণ বিজুগ [ভূমিকা ; ক, গ্ৰন্থাবলী ; দাস : পৃষ্ঠা ৬৮]

বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে কবীরগ্ৰন্থাবলীতে শ্রামসুন্দর দাস বলেন যে, এর মধ্যে (ক) বাংলা ধাতু $\sqrt{\text{আছ}}$, ও (খ) “ইল” প্রত্যয় আছে। যেমন :—

‘কহ কবির কছু আছিল জহিয়া’

(গ) বাংলা ধাতু $\sqrt{\text{পার}}$ (হিন্দী—সকনা) ব্যবহৃত হয়েছে। যথা—

‘পাঁই কু ঠাকুর খেত কু নেপই, কাইথ খরচ ন পারই’

তুলসীদাস ও জায়সীয়াভিতর অম্লরূপ ব্যবহার আছে। শ্রামসুন্দর দাসের মতে কবীর যে ‘উপকারী’ স্থলে ‘উপগারী’ ব্যবহার করেছেন, তা অপভ্রংশ রীতিরই বিচিত্র ক্ষের টানা মাত্র। সম্পাদকের মতে কবীরের রচনাতে “দাহন” স্থলে “দাজ্জ্বন”-এর ব্যবহার বিস্ময়কর। এই ব্যবহারের কোনও সম্ভাবজনক কারণ তিনি খুঁজে পাননি। সম্পাদকের মতে কবীরে যে ছটি প্রধান ‘বোলা’ দেখা যায়, তা হল আউনী এবং বিহারী।

‘কবীরগ্ৰন্থাবলী’র ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সম্পাদক শ্রামসুন্দর দাস ভাষাতত্ত্ব সম্বন্ধে ‘কবীরগ্ৰন্থাবলী’র যে আলোচনা করেছেন, তা উল্লেখযোগ্য হলেও বোধ হয় সম্পূর্ণ সম্ভাবজনক নয়। পঞ্জাবী ভাষার বৈশিষ্ট্য হিসেবে

তিনি দস্তা 'ন' স্থলে মুদ্রণ্য 'ণ'এর যে ব্যবহারের কথা আলোচনা করেছেন, তাকে পঞ্জাবী বৈশিষ্ট্য না বলে অপভ্রংশ বৈশিষ্ট্য বলাই বোধ হয় ঠিক হবে। আর যেহেতু পঞ্জাবী ভাষায় এখনও অপভ্রংশ বৈশিষ্ট্য (ইখ, হখ, গড্ডী ইত্যাদি) দেখা যায় সেই জন্ত (এই প্রসঙ্গে ডক্টর শ্রীহীনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-বিরচিত "ইণ্ডো-এরিয়ান এ্যাণ্ড হিন্দী" পুস্তক দ্রষ্টব্য) পঞ্জাবীতে দস্তা 'ন' স্থলে "ণ" ব্যবহার প্রচলিত। কিন্তু কবীরের সময়সময়ে প্রাচীন মধ্যবাংলায় এই অপভ্রংশ বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত বেশী মাত্রায় দেখা যায়। প্রাচীন মধ্যবাংলার নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" দ্বারা নাড়াচাড়া করেছেন, তাঁরাই এ বিষয়ে যথেষ্ট অবহিত। আমরা বসন্তরঞ্জন রায়সম্পাদিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দ্বিতীয় সংস্করণ হতে এই ধরনের কয়েকটি কথা ও পৃষ্ঠাসংখ্যা নীচে দিলাম :—

জাপো (৮১); পূণ (৮২); আপণ (৮২); দাণ (৮৩); মণে (৮৫); পাণে (৮৬); কাহিণী (৮৯); মহাদাণী (৮৯); ভালমণে (৯০); আলিমণে (৯১)। সুতরাং দস্তা "ন" স্থলে 'ণ' ব্যবহার পঞ্জাবী বৈশিষ্ট্য বলে গ্রহণ করার কোনও সন্দেহ কারণ নেই। এটি একটি অপভ্রংশ বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্য সমসাময়িক বাংলা পুঁথি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও পাওয়া যায়।

পঞ্জাবী সুভাবিত বলে সম্পাদক "লুণ বিলগা পাণিয়া, পাণী লুণ বিলগ" গ্রহণ করেছেন। কবীর-ব্যবহৃত ঐ অংশটির বাচ্য অর্থ "হুন মিশে যায় জলে, জল মিশে যায় হুনে"। এর গভীরতর আধ্যাত্মিক অর্থ বাদ দিয়ে দেখা যাক, এই ধরনের ব্যবহার বাংলাতে কবীরের সময়সময়ে ছিল কি না? কবীরের সময়সময়ে বিরচিত "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" গ্রন্থে (১৫শ—১৬শ শতাব্দী) অম্লরূপ প্রকাশভঙ্গীর উদাহরণ পাওয়া যায়। বিবহক্লিষ্টা রাধার "তানব" অর্থাৎ ক্রমক্ষীরমানতার বার্তা নিয়ে শ্রীকৃষ্ণের কাছে হাজির হয়েছে বড়ানি। বলছে :—

‘চন্দ্রাবলী রাধা তোর বিরহে মরে।

লুণী সম দেহ তার রসের সাগরে।’

অর্থাৎ, ‘কৃষ্ণ, রাধা তোমাব বিরহে মারা যেতে বসেছে। রসের সাগরে তার দেহ ‘লুণী’র মত।’“ হুনের পুতুল রসের সাগরে বা প্রেমের সাগরে পড়ে ক্রমশঃ নিঃশেষ হ’তে চলেছে।” [বসন্তরঞ্জন বাবু গ্রহণ করেছেন ‘লুণী’ অর্থাৎ ‘নবনী’। অর্থাৎ নবনী-সুকুমার দেহবিশিষ্টা রাধা রসের বা প্রেমের সাগরে পড়ে মারা যেতে বসেছে।’ এ ক্ষেত্রে বসন্তবাবু সম্বন্ধে অপরিণীত শ্রদ্ধা সত্ত্বেও বর্তমান লেখক তাঁর অর্থ গ্রহণ ক’রতে পারছেন না। কারণ ‘নবনী’ থেকে ‘লুণী’র বিবর্তন স্বাভাবিক হলেও এ ক্ষেত্রে অর্থবোধ হয় না। দেহকে ‘নবনী’র সঙ্গে তুলনা করা অনেক ক্ষেত্রেই হয়, কিন্তু সে ক্ষেত্রে নবনী-সুকুমার দেহের ক্ষীণতা বোঝাবার জন্ত ‘প্রেমের রৌদ্র’ বা ‘প্রেমের অনল’ প্রভৃতির ব্যবহার উচিত ছিল। (লবণ > লোণ > লুণ, লুণ) লবণ অর্থে ‘লুণ’ শব্দের ব্যবহার প্রাচীন মধ্যবাংলায় ছিল। এখনও ‘লবণ-হীন’ অর্থে ‘আলুনি’ শব্দের ব্যবহার বাংলাতে ও ‘লুণ’ শব্দের ব্যবহার ওড়িসাতে আছে।

কবীর-সময়সময়ে বা অল্প পরবর্তী কালে বিরচিত 'শ্রীচৈতন্যভাগবত'-এও এই ধরণের 'সুভাবিত' ব্যবহারের নিদর্শন আছে। যথা :—

“জুনির পুতুল যেন মিলায় সরিরে।”

বিরহক্লিষ্টা রাধাকে (= চৈতন্যকে) প্রেমের সলিলে (= সরিরে ; র = ল) লবণের পুতুলের মত ক্রমশঃ বিলীয়মান বলা হয়েছে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থ—“নবনী (কোমল) পুতুলের মত শরীর (শ = স) বিরহে মিলিয়ে যাচ্ছে।”—গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ ‘রসের সাগরে নবনী-দেহা রাধিকা’ অর্থ করা অপেক্ষা “প্রেম-রসের সাগরে লবণ-পুতুল সদৃশ দেহ” অর্থ করাই সঙ্গত মনে হয়। যদি তাই হয়, তা হলে কবীরের “জুণ বিলগ পাণিয়া, পাণী জুণ বিলগ” কেবল পঞ্জাবী প্রভাব বলা ঠিক হবে কি ? এ ধরণের ব্যবহার বাংলাতে বা পূর্বভারতেও ছিল। কবীর, যিনি সম্পাদকের মতে বাংলা ‘আছ’, ‘ইল’, ‘পার’ প্রভৃতি ব্যবহার করেছেন, তাঁর পক্ষে এ ধরণের ব্যবহার বাংলা বা পূর্বভারতীয় সাহিত্য থেকে গ্রহণ করা অসম্ভব মনে হয় না। অবশ্য পঞ্জাবী ভাষা হতে এই ধরণের শব্দ প্রয়োগ কবীরে আসা অসম্ভব, এ কথা আমরা বলতে চাই না। তবে পূর্বভারতীয় ভাষার প্রভাবকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কেবল পঞ্জাবীর প্রয়োগ বলাতেই আমাদের আপত্তি।

সম্পাদক কবীরের দ্বারা ‘উপকারী’ হলে ‘উপগারী’ ব্যবহারে বিম্বিত হয়েছেন। কিন্তু এই অপভ্রংশ বৈশিষ্ট্য এখনও বাংলায় চলে। বাংলাতে কথাবার্তায় ‘উপকার’ হলে ‘উগ্গার’ বলা হয়ে থাকে।

শ্রামশ্রমর দাস কবীরের “দাজ্বান” শব্দে (‘দাহন’ অর্থে) বিম্বিত হয়েছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার ধ্বনিবৈচিত্র্য নিয়ে ধারা আলোচনা করেছেন, তাঁরা জানেন—বাংলাতে “দাহ,” “সজ্ব,” “বাহ” ইত্যাদি শব্দ “দাজ্ব,” “সজ্ব,” “বাজ্ব” ইত্যাদি রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। সুতরাং ‘দাহ’ (দাজ্ব) শব্দের উচ্চারণ প্রভাবে ‘দাজ্বান’ (দাহন) শব্দের বিবর্তন হয়েছে মনে করলে বোধ হয় খুব ভুল হবে না। আর ‘হ’ যদি ‘জ্ব’ রূপে বাংলার আশে-পাশে কবীরের সময়ে ব্যবহৃত না হয়, তা হ’লে এটিকে কবীরের উপর বাংলার প্রভাব বলা অসঙ্গত হবে না বোধ হয়। তবে মনে রাখতে হবে, ‘হ’ > ‘জ্ব’ প্রাকৃত যুগ থেকে চলে আসছে। ‘মহম্ম’ শব্দ থেকে ‘মজ্ব’, ‘মঝু’ শব্দের বিবর্তন এমনি করেই হয়েছে।

কবীরের ‘বানী’, ‘বাণী’ কথাটি নাথযোগীর মাঝখান দিয়ে এসেছে অনেক বলেন। আর নাথযোগীর সঙ্গে বাংলার যোগ কিরূপ নিবিড় ছিল, তা এ বিষয়ে অরণ্যোগ্য। নাথযোগীর আদি গুরু ‘মীননাথ’ বাঙ্গালী ছিলেন বলেই সাধারণ বিশ্বাস। এটি কি পঞ্জাবী প্রভাব ?

কবীরের “সাখী” শব্দ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। কবীরের ‘সাখী’ ভারত-বিখ্যাত। এই পর্যায়ের পদের ভিত্তর কবীর সংসার সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জানিয়েছেন। এই তাঁর সাক্ষীর কাজ। কবীর বলেছেন :

“সাধী আঁখী জ্ঞানকী, সমঝ দেখু মন যাছি।

বিহু সাধী সংসারকা ঝগড়া ছুটত নাহি”।*

‘সাধী হল জ্ঞানের চোখ, মন ঘিরে সমঝে দেখ। সাধী (সাক্ষী) বিনা সংসারের ঝগড়ার নিষ্পত্তি হয় না।’ সংসারের মত ও পথের ঝগড়া দূর করতে কবীর ‘সাধী’ রচনা করেছেন। কিন্তু এই ‘সাধী’ শব্দের ব্যবহার সহজযানীদের মধ্যেও পাওয়া যায়। যথা “সাধি করিব জালঙ্ঘনী পাঞ”। (চর্যা : ১৬)। সাক্ষী অর্থে ‘সাধি’ ‘সাধী’ শব্দের ব্যবহার প্রাচীন মধ্য-বাংলার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের (২য় সংস্করণে ৫৭, ৬৯, ৮৫, ৯৪, ১৪৯, ১৭৪ পৃষ্ঠার) ভিতরে পাওয়া যাবে। কবীরের এই ‘সাধী’ পদগুলি সম্ভবতঃ সহজ-যানী সম্প্রদায়ের পদ রচনার একটি ধারা বলে মনে হয়। আব সহজযানএব সঙ্গে বাংলা বিহারের সম্বন্ধ কত নিবিড় ছিল, তা সবাই জানেন। দ্বিবেদী-জী বলেন : অসল মৈ সাধী কা মতলব হী য় হৈ কি পূর্বতর সাধকৌ কী বাত পর কবীর দাশ অপনী সাক্ষী য়া গবাহী দে রহে হৈ।—হিন্দী সাহিত্য কী ভূমিকা : পৃ. ৩৬।

কবীরপ্রণাবলী আলোচনা কবলে দেখা যায়, কবীরের মধ্যে নিম্নলিখিত পূর্বভারতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান—(১) সাধী, (২) বাণী, (৩) ভবিষ্যতে ‘ইব’* (৪) অতীতে ‘ইল’, (৫) ‘আছ’ ধাতু, (৬) ‘পার’ ধাতু, (৭) জ্ঞ, ক>গ ইত্যাদি ধ্বনিবৈশিষ্ট্য, (৮) ‘কিছু’ (—কছু), ‘তোর,’ ‘মোর’ শব্দের ব্যবহার। (৯) বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের পদসাম্য, (১০) বৈষ্ণবীয়তা ও সহজীয়তা। [‘ধসম’ শব্দের ব্যবহার নিয়ে দ্বিবেদী-জী “কবীর” গ্রন্থে বা লিখেছেন, তা বিশেষ অঙ্গযোগ্য। অবশ্য চম্পাবলী পাণ্ডুর কথাও অগ্রাহ্য নয়।]

উল্লিখিত আলোচনাগুলি দেখলে কবীরের সঙ্গে বাংলা-বিহারের যোগ কত নিবিড় ছিল, তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, ‘ব্রজভাষা’ ব্যবহার তখনকার কবির পক্ষে এক বিশেষ রীতি। ‘ব্রজভাষা’ তখন প্রধান কাব্যভাষা এবং প্রায় প্রতি প্রদেশের লোকই ব্রজভাষায় কবিতা রচনা করছিলেন। তাই বলত,

“ব্রজভাষা হেত ব্রজ বাস ন অছমানিয়ে।”

কিন্তু বাংলা বিহারের ভাব, ভাষা, ধ্বনি, ধর্ম কি তাতে কবীরে স্থান পেয়েছে দেখে বিস্মিত হতে হয়। ‘ব্রজভাষা’র বা সম্মান, সে সম্মান বাংলার ভ ছিল না, তবে ?

* ভবিষ্যতে ‘ইব’কে রাজস্থানী ‘বা’, হিন্দী ‘দা’, বাংলা ‘তে’ বলে গ্রহণ করা যায় কি ? দেখুন :—

(১) বৈ দিস কব আটেক ভাই;

জা কায়নি হম দেখে ধরী বৈ, মিলিবো অংগি লাগাই। [এখানে “আটেক” ভবিষ্যৎকাল নির্দেশক]—পৃ. ১১১।

(২) উন দেস জাইবো রে বারু, দেখিবো রে লোগ বৈবু লো।

উড়ি কাগারে উন দেস জাইবা, জাস মেলা মন চিত্ লাগা লো।—পৃ. ১১৩

কবীরের মধ্যে বাঙ্গালীস্বভাব মনোবৃত্তি

মনে রাখতে হবে, কবীরের কাশ্মীতে আবির্ভাবের পূর্বের ইতিহাস আমরা কিছুই জানি না। আর কবীর কাশ্মীতে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে ধারা বলেন, তাঁরা অনেক কিছদের সঙ্গে উল্লেখ করেন কবীরের কথা :—

“কাশ্মীমে” হম প্রগট ভয়ে হৈ রামানন্দ চেতায়ে ।”

অর্থাৎ কবীর বলছেন, ‘কাশ্মীতে রামানন্দ কর্তৃক উৎপন্ন হয়ে আমি প্রগট হয়েছি।’ অনেকে অর্থ করেন :—‘কাশ্মীতে আমার জন্ম এবং রামানন্দ আমাকে চেতিয়েছেন।’

কিন্তু ‘প্রগট’ (প্রগট) শব্দের অর্থ আবির্ভূত করাই ঠিক হবে। কবীর কাশ্মীতে উদ্ভূত হয়েছিলেন, কিন্তু কোন দেশের লোক ছিলেন তিনি। সাধারণতঃ সাধু সন্ন্যাসীরা নিজের গ্রামে বা দেশে ‘ভীখ’ পান না। অস্ত্র আবির্ভূত হওয়ারই তাঁদের রীতি। বিশেষতঃ বংশ-কৌলীভূত কবীরের পক্ষে আপন জীবদ্দশায় কাশ্মীর মত স্থান থেকে সম্মান লাভকে নিজের দেশ থেকে সম্মান লাভ বলা যায় কি? আর কাশ্মীতে বাস করলেই তাঁকে কাশ্মীর লোক মনে করতে হবে কেন? কাশ্মী প্রাচীন কাল থেকেই ভারতের প্রধান তীর্থক্ষেত্র। কবীরের পূর্বে বিখ্যাত বাঙ্গালী, মঘুর ঢাকা ‘মঘর্ষমুক্তাবলী’র লেখক কুলুক ভট্ট (গোড়ে নন্দনবাসিনামি স্তম্ভনৈর্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যং কুলে শ্রীমন্তট্টিদিবাকরস্ত তনয়ঃ কুলুকভট্টাভবৎ। কাশ্মী-মুত্তরবাহি জলুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈশ্চেন্নয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিহুবাং মঘর্ষমুক্তাবলী।) কাশ্মীতে জারুতীরে ঢাকা রচনা করেছেন। আর কবীরের পরে বাঙ্গালী মধুসূদন সরস্বতী তুলসীদাসকে হিন্দী রামায়ণ রচনায় কি সাহায্য করেছিলেন, ছানবার জঙ্গ রামনরেশ ত্রিপাঠী রামচরিতমানস : তুলসীজীবনী, পৃষ্ঠা ৯৮ দেখুন। কাশ্মী আজ পর্যন্ত বাঙ্গালীর প্রধান তীর্থস্থান। স্তবরাং ‘কবীর’কে কাশ্মীতে ‘প্রগট’ হওয়ার জঙ্গ কাশ্মীর লোক বলা কি উচিত হবে?

শ্রামশূন্যর দাস-সম্পাদিত কবীরগ্রন্থাবলীতে কবীরের একটি পদ আছে, যেটিকে তদ্ব্যখ্যাশূন্য করলে পদটিতে বাঙ্গালী-মনের ছাপ লক্ষ্য করে বিম্বিত হতে হয়। কবীর বলছেন :—

বাগড় দেস জুবন কা ঘর হৈ,

তহা জিনি জাই দাবন কা ডর হৈ ॥ টেক ॥

সব জগ দেধো কোই ন ধীরা, পরভ ধুরি সিরি কহত অবীরা ॥

ন তহা সরবর ন তহা পাণ্ডি, ন তহা সদগুরু সাধু বাণী ॥

ন তহা কোকিল ন তহা হাঁস, উচৈ চটি চটি হংসা মূবা ॥

—ক.প্রঃ পৃ. ১০২

অর্থাৎ :—

বাগড় দেশ ‘জু’ (গরম হাওয়া)-এর ঘর। সেখানে যে যায় তার দাহন ভয় ॥

সকল জগৎ দেখলাম, ধীর নয় কেউ, পড়ে ধুলি শিরে বলে আত্মীয় ॥

না সেখানে সরোবর না সেখানে পানী (জল), না সেখানে সঙ্গুত সাধুর বাণী ।

না সেখানে কোকিল, না সেখানে শুক ; উঁচুতে চড়ে চড়ে হংস মারা পড়ে ॥

এখানে লক্ষ্য করা যায়, কবির মনে ভাসছে সেই দেশের কথা, যেখানে ‘জু’ নেই, জল বা সরোবর সেখানে প্রচুর। যেখানে রয়েছে কোকিল, হংস, শুক। আর যেখানে নেই লাল ধূলো, যা মাথায় পড়লে মাথা আবির-রান্না হয়ে যায়। এ কি কবির Nostalgia ?

যে তিনটি পাখীর কথা কবীর বলেছেন, সেই তিনটিই বাংলার ঘরের প্রধান পাখী ছিল বলে সমসাময়িক শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সাফ্য দিচ্ছে। ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ (২য় সং পৃ. ৩৫) আছে :—

• ‘হংস রএ সরোঅরে হুআ হো প্যঞ্জরে
কুইলি সে নন্দন বনে।’

এ পাখীগুলি অবশ্য কেবল বাংলারই বলা উচিত হবে না। বাংলার আশে-পাশে সর্বত্রই এদের প্রাতি প্রীতি দেখা যাবে। কিন্তু বাংলার ‘জু’-ভীতি ও সরোবরভরা দেশ যেন কবীরের ঐ কবিতা থেকে কেমন একরকম ভাবে ইঙ্গিত করে বলে মনে হয়। এত সরোবর এবং লাল ধূলিবিহীন দেশ কি বিহার বা কান্দী ? কবীর কীর্তনিসাদের কোথায় দেখলেন ? সহজ্যান ও বৈষ্ণবধর্ম কেমন করে তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করল।

কবীরের বোলী

কবীরের বোলী পূর্বের। কিন্তু এ পূর্ব শব্দের অর্থ কি ? কবীরের একটি পদে কবীর বলছেন :—

“বোলী হমারী পূর্ব কী, হমে লৈখি নহী কোয়।

হমকো তো সেই লৈখি, ধুর পুরব কা হোয় ॥” বীজক মূল : রাধব দাস।

এর বাচ্যার্থ হল :—‘বুলী আমার পূর্বের ; কেউ আমার দেখেনি বা বোঝে না। আমাকে সেই দেখে, যে পূর্বদেশের যাজ্ঞী।’ এর একটি পাঠান্তর অখোধ্যাসিংহ উপাধ্যায়ের ‘কবীরচনাবলী’তে (পৃ. ২৪এ) পাওয়া যায়। সেখানে ‘ধুর পুরব কা’ না বলে ‘ঘর পুরব কা হোই’ বলে কবীর বলছেন দেখা যায়। অর্থাৎ ‘পূর্ব দেশে যার ঘর, সেই আমাকে বুঝবে বা দেখবে’ বলা হয়েছে।

এই পূর্ব শব্দের অর্থ কি ? বিহারকে পুরব বলা হত মধ্যযুগে। এ ক্ষেত্রে বাংলা বিহারের কোনও স্থানকে বলা হয়েছে কি ? যতদূর আমার মনে হয় কবীরের জন্ম বাংলা-বিহারের কোনও অঞ্চলে। তাই বাংলা বিহারেব সাধনরীতি, সাহিত্য, ভাষা, উচ্চারণ এই ভাবে কবীরের মধ্যে পাওয়া যায়। তবে কবীরের সাহিত্য ভারতের সাহিত্য, কবীরের পথ ‘ভারত পথ’।

গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা

(প্রতিবাদ)

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

ত্রিনিদাদন দেবনাথ মহাশয় গত বৎসরের সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় (৫৯ ভাগ, ৩৮ পৃঃ) “গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা কবীন্দ্র দাস—সেধ কয়জুলা নহেন” প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছেন। নূতন লেখক; তাঁহার উদ্ভব প্রশংসনীয়। কিন্তু তিনি সত্য উদ্ধার করিতে পারেন নাই। এই অল্প আমাকে এই প্রতিবাদ লিখিতে বাধ্য হইতে হইতেছে। “সত্যমেব জয়তে নানুত্তম।”

পরলোকগত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ-সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়ের পর ত্রীপকানন মণ্ডল ‘গোবর্ধবিজয়’ নামে যে একটি উৎকৃষ্টতর সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন (বিশ্বভাবতী প্রেসালয়, ১:৫৬ সাল), তাহা প্রবন্ধলেখক দেখিয়াছেন কি না, বুঝিতে পারিলাম না। অধিকন্তু তিনি ডক্টর শ্রীমুকুমার সেনের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ১ম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণও দেখেন নাই। তার পর মধ্যযুগের মুসলমান-রচিত সাহিত্যের সহিত প্রবন্ধলেখকের পরিচয় থাকিলে তিনি কখনই লিখিতে পারিতেন না—“অবশ্য, কয়জুলা গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা—এই মতের স্বপক্ষে বলা যায় যে, এখানে মুসলমান কবি হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বিধিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। কিন্তু আজি হইতে পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্বের অন্ধতামস যুগে—যখন স্বর্ধর্ষে বৃঢ় অন্ধ বিশ্বাস ও পরধর্ষে অসহিষ্ণুতাই ছিল মুসলমানদের জাতীয় চরিত্রের চরমতম ও পরমতম বৈশিষ্ট্য, তখনকার সেই অসত্য বর্করোচিত ধর্ম্মাঙ্কতার দিনে মুসলমান কবি কয়জুলার পক্ষে ‘কাফের’ হিন্দুশাস্ত্রীয় বিধিকে তদীয় কাব্যে প্রচারিত করা সম্পূর্ণ ই অস্বাভাবিক বলিয়া আমাদের নিশ্চিত বিশ্বাস।”

মধ্যযুগের শতাব্দিক মুসলমান বৈষ্ণব কবি আছেন। এই যুগের সৈয়দ জুলতান, সাবিরিদ খাঁ, মুহম্মদ খাঁ, সৈয়দ আলাওল, শেখ চাঁদ প্রভৃতির রচনায় যথেষ্ট হিন্দুমানি আছে। মাধবপন্থা সম্বন্ধে আবদুল হকুর মহম্মদের ‘গোপীচাঁদের সরাস’ প্রকাশিত হইয়াছে (ডক্টর নলিনাকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত, ঢাকা সাহিত্য-পরিষৎপ্রসূতাবলী নং ৯, ১৩০২ সাল)। তাহাতে আছে (শোষিত বানানে)—

“চৌদ্ধ সহস্র জুবন নিজ নাথে হবে পার।

শুকুর, মুহম্মদে কহে ব্রহ্মনাম সার ॥

এহি ত নামের গুণ

সাবধান হৈয়া শুন

পূর্বে অগিল রঘুনাথ।

সেহি নিজ নামের বলে

পাষণ ভাসিল জলে

সমরে রাক্ষস করিল নিপাত ॥

শতেক গ্রহরের সেতু বাঙ্কিল রামের হেতু,
ভল্লুক বানর হৈল পার ।

নিজ নাম জপন করে শুককে রাক্ষস মারে
জুবর্ণপুরী লকা কৈল ছারখার ॥

সীতা উদ্ধারিয়া রাম লৈয়া গেল নিজধাম
লোকের গায় অপযশ কথা ।

লোকের গল্পনা কথা জতুঘরে ভরিল সীতা
নিজ নামের বলে পাইল রক্ষতা ॥

পাণ্ডব রাজার নারী পিতার ঘরে অকুমারী
শুক্লমুখে নাম কৈল শিক্ষা ।

কুন্তী রাজার কন্যা, শুক্লমুখে নাম ধন্যা,
নিজ নাম জপিয়া কৈল দীক্ষা ॥

নিজ নাম জপিল মনে সূর্য্য দেখিল তানে
নিকুঞ্জেত ভোগ কৈল রতি ।

অকুমারী গর্ভ ধরে কর্ণ হৈল কর্ণধারে
নিজ নামে রক্ষা পাইল সতী ॥

নিজ নামে করি পূজা শিব পাইল দশভুজা
পুত্র যার দেব লম্বোদর ।

শনির দৃষ্টে গেল যুগ কুটি গজমাথা শুভ
নিজ নামে স্থাপিল কলেবর ॥

দশভুজা মহামায়া শিবমুখে নাম পায়
কালীরূপে বসিল অমর ।

মথুরাত জন্মিল হরি নিজ নাম জপ করি
বধ কৈল ছুটে কংসাসুর ॥

ইজ্ঞ স্বর্গ ভুবনে গৌতম মুনির স্থানে
নিজ নামে স্বর্গ-অধিকারী ।

নিজ নাম সাধিল মনে সাধন ভজন শুণে
শৃষ্টি কৈল অমরানগরী ॥

ব্র্যাস আদি সূর্যীর মুনি জপে নিজ নাম ধুনি
নামের প্রভাবে হৈল স্বর্গবাসী ।

নদিয়া নাম নগরে জগন্নাথ মিশ্রের ঘরে
নিজ নামে চৈতন্ত সন্ন্যাসী ॥ (৯ পৃ.)

এই সকল উক্তি কি একজন স্বধর্ম্মাঙ্ক মুসলমান কবির লেখা বলিয়া মনে হয় ?

গোরক্ষবিজয় বা গোর্ধবিজয় যে সেধ ফয়জুল্লার লেখা, তাহার অকাটা প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ এনায়েত হক । তিনি ২৪ পরগণার বারাসতের নিকটবর্তী এক গৃহস্থের বাড়ীতে কতকগুলি পুঁথির বিক্ষিপ্ত পাতা পান । তাহার একটির মধ্যে ছিল—

“গোর্ধবিজএ আভে মুনি সিদ্ধা কত
কহিলাম সভ কথা শুনিলাম যত ।
খোঁটাচুরের পীর ইসমাইল গাজী,
গাজীর বিজএ সেহ মোক হইল রাজি ।
এবে কহি সত্যপীর অপূর্ব কথন,
ধন বাড়ে শুনিলে পাতক খণ্ডন ।
মুনি-রস-বেদ-শশী শাকে কহি সন
শেখ ফয়জুল্লা ভনে ভাবি দেখ মন ।”

(মাসিক মোহম্মদী ১৩৪২, পৃ. ৫৩৬—৩৭, বাদশাহ সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২২৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত) ।

এই উদ্ধৃত অংশ হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, শেখ ফয়জুল্লা প্রথমে কাহারও নিকট শুনিয়া গোর্ধবিজয় বা গোরক্ষবিজয় রচনা করেন । তাহার পর তিনি গাজীবিজয় লেখেন । এই গাজীবিজয়ে রঙ্গপুরের খোঁটাচুরার পীর ইসমাইল গাজীর বিষয় লিখিত হইয়াছে । ইসমাইল গাজী ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শহীদ হন । তাঁহার তৃতীয় রচনা সত্যপীর সম্বন্ধে । ইহার রচনাকাল “মুনিসবেদশশী” শকাব্দ । রসকে ছয় ধরিলে আমরা ১৪৬৭ শকাব্দ বা ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পাই, আর রসকে নয় ধরিলে আমরা পাই ১৪২৭ শকাব্দ বা ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ । সুহৃদব ডক্টর শ্রীকুমার সেন “মুনিসবেদশশী” পাঠকে কেন যে “নিশ্চয়ই ভ্রান্ত” স্থির করিয়া “মুনিসবেদশশী” শুদ্ধ পাঠ মনে করিয়াছেন, বুঝিতে পারিলাম না (ঐ পুস্তক দ্রষ্টব্য) । উদ্ধৃত অংশে শেখ ফয়জুল্লা রচিত যে সত্যপীরের কথা বলা হইয়াছে, তাহা পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে । ইহার একটি ভণিতা এইরূপ—

“গাইল ফৈজুল্যা কবি সত্য পদে মন ।”

(ডক্টর সেনের ঐ পুস্তক, পৃ: ১০৪২-১০৪৪) ।

চেষ্টা করিলে হয় ত তাঁহার গাজীবিজয় পাওয়া যাইতে পারে ।

এখন আমরা বুঝিতে পারি যে, গোরক্ষবিজয় বা গোর্ধবিজয়ের বিভিন্ন পুঁথিতে যে ভীমদাস, ভীমসেন রায় বা শ্রীমদাস সেন ভণিতা দেখা যায়, তাহা প্রক্ষিপ্ত মাত্র । গোর্ধবিজয়ের দুই স্থানে (৮৭, ৮৮ পৃ:) জ্ঞাননাথেরও ভণিতা আছে, তাহাও প্রক্ষিপ্ত । শ্রীমদাস সেন ও ফয়জুল্লা সম্বন্ধে ডক্টর সেন বলেন যে, উভয়ের “রচনার মধ্যে ঐক্য এতটা গভীর যে, দুই জনকে স্বতন্ত্র কবি ভাবা দুষ্কর ।” (ঐ পুস্তক) । গোরক্ষবিজয়ে যে কবীন্দ্র বা কবীন্দ্র দাসের ভণিতা আছে, সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে । ডক্টর সেন কবীন্দ্র দাসের পৃথক্ অস্তিত্বে সন্দেহান্বিত । তিনি বলেন, “কবীন্দ্র দাস ভীমসেনের অথবা শ্রীমদাসের

নামান্তর হওয়া বিচিহ্ন নয় (ঐ পুস্তক, ৭৫২ পৃঃ)। আমরা ফয়জুল্লার উদ্ধৃত অংশে দেখিয়াছি—

গোর্থবিজ্ঞএ আন্তে মুনি সিদ্ধা কত

কহিলাম সন্ত কথা তুনিলাম যত ।”

আমি মনে করি, ফয়জুল্লা যে নাথগুরুর নিকট হইতে গোরক্ষকথা শুনিয়া গোরক্ষবিজয় (বা গোর্থবিজয়) রচনা করেন, তাঁহার নাম বা উপাধি ছিল কবীন্দ্র । ফয়জুল্লা তাঁহার শিষ্য বলিয়া কবীন্দ্র দাস ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন । স্বর্গীয় আবদুল করিম সাহেবের সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়ের মাত্র একখানি পুঁথিতে চারি স্থানে কবীন্দ্র ও কবীন্দ্র নামের নাম পাওয়া যায় ।

কহেন কবীন্দ্র আন্ত কথা অমুমানি ।

তুনিয়া বলিল তবে সিদ্ধার যে বাণী ॥ (পৃঃ ১০)

ইহার পাঠান্তরে তাঁহার ২য় ও ৩য় পুঁথিতে “কবীন্দ্র” স্থানে “ভীমদাস” এবং “বলিল” স্থানে “রচিল” আছে । তাঁহার ৭ম পুঁথিতে ভণিতা “ফজল্লা” এবং “রচিল” পাঠ আছে । “রচিল” পাঠই শুদ্ধ । ইহার কর্তা “আক্ষি” উহু । গোরক্ষবিজয়, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি পুস্তকে উত্তমপুস্তকের এই বিভক্তিহীন রূপ পাওয়া যায় । এখানে “ভীমদাস” প্রক্ষিপ্ত ; শুদ্ধ পাঠ কবীন্দ্র বটে । “আন্ত কথা” আন্ত পুরাণ, বাহা অবলম্বনে গোরক্ষবিজয় (বা গোর্থবিজয়) রচিত হইয়াছে । ফয়জুল্লা এই আন্ত পুরাণ কবীন্দ্রের মুখ হইতে শুনিয়া গোরক্ষবিজয় (বা গোর্থবিজয়) রচনা করেন । এখানে প্রসঙ্গ হিসাবে গোরক্ষবিজয় হইতে কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি ।

“আন্ত পুরাণ কথা এহিরূপে কহে ।

বুঝি চাহ পণ্ডিত হএ কি না হএ ॥

হইলে রাখএ পণ্ডিত যদি মনে লএ ।

এহি তত্ত্ব পুরাণে কহিছে গোর্থের বিজয় ॥

কহেন কবীন্দ্র আন্ত কথা অমুমানি ।

তুনিয়া রচিল তবে সিদ্ধার যে বাণী ॥”

(কুং গোরক্ষবিজয়, পৃঃ ৯, ১০ ; গোর্থবিজয়, পৃঃ ৫)

আর একটি ভণিতা হইতেছে—

“কবীন্দ্র-বচন শুনি ফজল্লাএ তাবিয়া

মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া ।” (গোরক্ষবিজয়, পৃঃ ১৩০)

এই ভণিতায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে যে, কবীন্দ্রের বচন শুনিয়া, ফয়জুল্লা তাবিয়া মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইলেন । এখানে “বুঝাইয়া” অতীত কালে প্রয়োগ । ইহা প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষার লক্ষণ । “ফজল্লাএ” কর্তায় এ । আবদুল করিম সাহেবের ২য় ও ৩য় পুঁথিতে ভণিতায় কবীন্দ্রের উল্লেখ নাই । তৃতীয় ভণিতাটি হইতেছে—

“গোর্খের বিজয় কথা কবীজ্ঞ রচিল।

সঙ্গীত পাচলা করি প্রচারিয়া দিল ॥” (ঐ, পৃ: ১৫৩)

এখানে মনে হয়, শুদ্ধ পাঠ “বলিল” স্থানে “রচিল” হইয়াছে। পূর্বে ১ম ভণিতায় যেমন দেখান হইয়াছে যে, শুদ্ধ পাঠ “রচিল” স্থানে “বলিল” হইয়াছে। “দিল” ক্রিয়ার কর্তা আদ্বি অর্থাৎ আমি ফয়জুল্লা। চতুর্থ ভণিতাটি হইতেছে কবীজ্ঞ দাসের নামে—

“কহেন কবীজ্ঞদাসে সুন নরগণ।

সিদ্ধার সঙ্গীত বাণী সুন বিবরণ ॥” (ঐ, পৃ: ১৫০)।

এখানে কবীজ্ঞ দাস স্বয়ং ফয়জুল্লা।

এ পর্যন্ত যতগুলি গোরক্ষবিজয়ের বা গোর্খবিজয়ের পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে মাত্র একটিতে এই কবীজ্ঞ বা কবীজ্ঞ দাসের ভণিতা আছে। স্মৃতরাং ভীমদাস, ভামদাস ইত্যাদির জায় ইহা যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাও কেহ বলিতে পারেন। ভণিতা বিচার করিলে আমরা দেখিব যে, পুঁথিতে ফয়জুল্লার ভণিতার বাহুল্য। মরহুম আবদুল করিম সাহেব আটখানি পুঁথির ভণিতাগুলি দিয়াছেন। তাহার প্রদত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম পুঁথির (৫৪৪ নং) পাঠ এইরূপ—

কহে সেক ফজোলাএ

সুন গুরু মীনরাএ

ভাবহ আপন চিন্ত সার।

কাম শাস্ত বুঝী পাইলা

বিবিধ কতুক কৈলা

গোরক্ষের বাক্য পিণ্ড রক্ষা কর ॥ (পৃ: ২৯)

কহে সেক ফজোলাএ মনেতে ভাবিয়া।

মীননাথ গুরুর জে চরিত্র বুজিআ ॥ (পৃ: ৩২)

কহে সেধ ফজোলাএ বিচারিয়া মন।

জির বিবম মায়ী অনুল্য রতন ॥ (পৃ: ৫৫ ক)

এই পুঁথিখানির লিপিকাল ১১৮১ মঘী।*

এই নয়খানি পুঁথির অতিরিক্ত মীনচেতন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি এবং বিশ্বভারতীর পুঁথি আছে। এ স্থলে এই বারখানি পুঁথির ভণিতার নির্ঘণ্ট দিতেছি।

আবদুল করিম সাহেবের নয়খানি পুঁথিতে—

১। কবীজ্ঞ, কবীজ্ঞ দাস, ফয়জুল্লা

২। ভীমদাস, ফয়জুল্লা

৩। ভীমদাস, ফয়জুল্লা

৪। ভীমদাস, ফয়জুল্লা

* ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সহায়ক (Research Assistant) জনাব আবদুল শরীফ এম্-এ এই পুঁথির বিবরণ দিয়াছেন।

৫। শ্রীমদাস, ফয়জুল্লা

৬। ফয়জুল্লা

৭। ফয়জুল্লা

৮। ফয়জুল্লা

৯। ফয়জুল্লা

১০। মীনচেতনে—শ্রীমদাস

* ১১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে—শ্রীমদাস, ফয়জুল্লা

১২। বিশ্বভারতীর পুঁথিতে—ভীমসেন রায়।

ইহাতে আমরা দেখিতেছি যে, বারখানির মধ্যে মাত্র তিনখানি পুঁথিতে ফয়জুল্লার ভণিতা নাই এবং চারিখানিতে কেবল ফয়জুল্লার ভণিতা আছে। ইহা হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে, ফয়জুল্লার নাম কাটিয়া ভীমদাস, ভীমসেন রায়, শ্রীমদাস ভণিতা বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। গৌরববিজয়ের আসল ভণিতাগুলি এই :—

(১) কহেন কবীন্দ্র আত্ম কথা অমুমানি।

শুনিয়া রচিল তবে সিদ্ধার যে বাণী ॥

(২) কহেন কবীন্দ্রদাসে শুন নরগণ।

সিদ্ধার সঙ্গীতবাণী শুন বিববণ ॥

(৩) কবীন্দ্র বচন শুন ফৈজুল্লাএ ভাবিয়া।

মীননাথ গুরু চরিত্র বুঝাইয়া ॥

(৪) গোবর্ধের বিজয় কথা কবীন্দ্র বলিল।

সঙ্গীত পাঁচালি করি প্রচারিয়া দিল ॥

(৫) কহে শেখ ফৈজুল্লাএ শুন গুরু মীন রাএ

এবে আপনা চিন্তা সার।

কামশাস্ত্র বুঝি পাইলা বিবিধ কৌতুক কৈলা

গোবর্ধবাক্যে পিশু রক্ষা কর ॥

(৬) কহে শেখ ফৈজুল্লাএ বিচারিয়া পাজি।

জীর বিষম মায়া বাদিয়ার বাজি ॥

ভীমদাস উপরের ১ নং ভণিতায় নিজের নাম ঢুকাইয়া দিয়াছেন। ২ এবং ৪ নং ভণিতা কেবল একখানি পুঁথিতে আছে। ৩ নং ভণিতায় ভীমসেন রাএ এবং সেন শ্রীমদাস প্রক্ষেপ করা হইয়াছে। এই ভণিতায় সকলগুলি নাম প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। যথা—

কহে সেক ফজলুল্লাএ মনেত্যা চিন্তিয়া।

মীননাথ সে জে গুরু চরিত্র বুঝিয়া।—(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)

কহে ভীমসেন রাএ মনেতে চিন্তিয়া।

মীননাথ গুরু যে চরিত্র বুঝিয়া।—(বিশ্বভারতী)

কহে সেন শ্রামদাসে প্রভুকে ভাবিয়া ।

কহেন যে গোৰ্খনাথে স্থিরতা করিয়া ॥—(মীনচৈতন)

৫নং ভণিতায় কোন প্রক্ষেপ নাই ।

৬নং ভণিতায় ভীমসেন রাএ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে । বিশ্বস্তারতীর পুঁথিতে ভীমসেন রায়ের একটি বিশিষ্ট ভণিতা আছে—

কহে ভীমসেন রাএ মনেতে ভাবিয়া ।

কহিল অপূৰ্ব কথা নাচাড়ি রচিয়া ॥ (পৃঃ ৩৭)

পূর্বের ৩টি ভণিতায় প্রক্ষেপের নজিরে আমরা বলিব, এই পাঠেও ভীমসেন রাএ প্রক্ষিপ্ত । আসল পাঠ ছিল—

কহে শেখ ফৈয়জুল্লাহ মনেতে ভাবিয়া ।

কহিল অপূৰ্ব কথা নাচাড়ি রচিয়া ॥

কিংবা আমরা ইহাতে বলিতে পারি যে, ইহা ষোল আনাই প্রক্ষিপ্ত ।

মীনচৈতনে শ্রামদাস সেনের ২টি ভণিতা আছে ।

১। কহে সেন শ্রামদাসে প্রভুকে ভাবিয়া ।

কহেন যে গোৰ্খনাথে স্থিরতা করিয়া ॥—(পৃঃ ২৪)

২। সেন সাম দাসে কহে গোৰ্খ মহাশয় ।

আনন্দে করিল তবে কদলি বিজয় ॥—(পৃঃ ৪৭)

প্রথম ভণিতাটি মূল গোরক্ষবিজয়ের ৩ নং ভণিতার প্রক্ষিপ্ত রূপ । দ্বিতীয় ভণিতাটিতে সম্ভবত 'শেখ ফৈয়জুল্লাহ' মূল পাঠ ছিল কিংবা এই দুই চরণই প্রক্ষিপ্ত । শ্রীপদানন মণ্ডল বলিতে বাধ্য হইয়াছেন—“বিভিন্ন গ্রন্থে একই স্থানে ভণিতাপ্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষণীয় ।...ভণিতাংশ আসিলে একই স্থানে প্রত্যেকের নাম চুকাইবার জন্ত কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছে ॥”—(গোৰ্খবিজয়, ভূমিকা) । কিন্তু তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—“ইহারা সকলেই প্রচলিত গোৰ্খ-ঐতিকার গায়ক ছিলেন”—তাহা শেখ ফয়জুল্লাহ সন্দেহ প্রযোজ্য হইতে পারে না । আমাদের সিদ্ধান্ত এই যে, সম্ভবতঃ কবীজ্ঞ উপাধিধারী কোনও নাথগুরু ছিলেন । শেখ ফয়জুল্লাহ তাঁহার নিকট হইতে বিষয়বস্তু শুনিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । কবীজ্ঞ ইহার রচয়িতা নহেন । “পোপীঠাদের সম্রাসে”র কবি আবদুল হকুর মহম্মদও এইরূপে হিন্দুর পুরাণ শুনিয়া তাঁহার গ্রন্থ রচনা করেন ।

“গুরু মহম্মদ ভণে

শুনিয়া হিন্দুর পুরাণে

মোছলমানের এই বাণি নয় ।

যে কিছু কিতাবে কয়

সে কথা অস্তথা নয়

হাদিছে জানহ মোছলমানি ॥”—(পৃঃ ২৬) ।

ফয়জুল্লাহ কাব্যখানির নাম কি ? একখানি পুঁথিতে আছে—“সমাপ্ত হইল জল মীনের চৈতন” । আর একখানিতে আছে—“গোৰ্খা বিজয়াএ পুস্তক সমাপ্ত ।” তৃতীয়

একখানির পুস্তিকা “ইতি মীননাথ চৈতন্ত গোর্ধবিজয় সমাপ্ত।” (গোরক্ষবিজয়, পৃ: ১১৯, ২০০)। ইহাতে বুঝি যে, গ্রন্থখানির পুরা নাম হইতেছে “মীননাথ চৈতন্ত গোরক্ষবিজয় ইহার সংক্ষেপে মীনচেতন এবং গোরক্ষবিজয় (গোর্ধবিজয়) নাম প্রচলিত হইয়াছে।

কতগুলি শব্দ হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, গোরক্ষবিজয় বা গোর্ধবিজয় একজন মুসলমানের রচনা।—

আমল—পবন আমলে করতারে রাখি বাছি। (গোর্ধবিজয়, পৃ: ১১০)

পবন আমল করি তারে কর সন্ধি। (ঐ, পৃ: ১১৭)।

পবন আমল তুমি যদি সে করিলা। (ঐ, পৃ: ১১৭)।

সম্পাদক এই দ্বিতীয় উদ্ধৃত চরণে ‘আমল’ স্থানে ‘আসন’ পাঠ শুদ্ধ মনে করিয়াছেন। প্রথম ও তৃতীয় উদ্ধৃত চরণ হইতে আমরা নিশ্চিত বুঝিতে পারি যে, “আমল” পাঠই শুদ্ধ। তুলনীয়,

পবন আমল কর বাউ কর বন্ধি। (ঐ, পৃ: ১৭৮)।

এই আমল শব্দটি আসলে আরবী ‘আমল’ শব্দ। ইহা বাঙ্গালী মুসলমানগণ অভ্যাস, বিশেষত সূফী মতের ‘দোআ’, ‘ইসম’ প্রভৃতি অভ্যাস সম্বন্ধে ব্যবহার করেন। কোনও হিন্দু লেখক ইহা ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানি না। মরহুম আবুল করিম সাহেবও বলিয়াছেন, “‘আমল’ শব্দের প্রয়োগে মুসলমানেরই হস্তচিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে।”—গোরক্ষবিজয় (পরিশিষ্ট, পৃ: ৫৮)।

গোরক্ষবিজয় ও মীনচেতন, উভয় পুস্তকে থাক, আগমান, জমিন এবং নূর শব্দগুলির প্রয়োগ দেখা যায়। আমি গোর্ধবিজয়ের (ক ২) পরিশিষ্ট হইতে পদগুলি উদ্ধৃত করিতেছি।

থাকেত (থাক্তেত) মিশিব থাক রৈব মাজ সার,

তম্ব ছালি হৈয়া বাইব দেহা আপনার। (পৃ: ১০৭)

পূর্বদিন হইল তার আসমান জমিন,

হাড়মাংস থাইল তার নিঠুর পবন। (পৃ: ১৪২)

চারিদিন থাকিতে নাসাএ না পায় নূরে,

তিনদিন থাকিতে যে হংসাংসী চরে। (পৃ: ১৪৫)

এইগুলি বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে সুপ্রচলিত। কোনও হিন্দু কবি এইগুলির প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া আমরা জানিতে পারি নাই। শ্রীনিরঞ্জন দেবনাথ বলিয়াছেন যে, মরহুম আবুল করিম-সম্পাদিত গোরক্ষবিজয়ের আরম্ভে আছে—

ও হরি। নমো গণেশায় নমঃ।

বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা।

আদৌপাশ্বে চ মধ্য চ হরিঃ সুব্রত গীয়তে।

ইহা ষাড়া বুঝা যায় যে, গোরক্ষবিজয় হিন্দুর রচিত। কিন্তু ইহা যে, হিন্দু লিপিকরের যোজনা, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কারণ, এই আরম্ভ গোরক্ষবিজয়ে বা গোর্ধবিজয়ের একখানি পুঁথি ভিন্ন অস্ত্র দেখা যায় না।

এ পর্যন্ত যাঁহা বলা হইল, তাহা হইতে নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, গোরক্ষ-বিজয় বা গোর্ধবিজয়ের কবি শেখ ফয়জুল্লা ভিন্ন অস্ত্র কেহ হইতে পারেন না।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানসুন্দর কাব্য

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

অধ্যাপক শ্রীত্রিবিদ্যনাথ রায়

(চ) সুন্দরের সহিত মালিনীর সাক্ষাৎ

এই প্রসঙ্গে গোবিন্দদাস লিখিতেছেন—কদম্বতরুতলে যখন সুন্দর বিশ্রাম করিতে-
ছিলেন, তখন সেই নগরের রক্তানাম্নী মালিনী রাজকন্যা বিজ্ঞানকে পুষ্প দিয়া গৃহে ফিরিবার
পথে লোকমুখে সুন্দরের কথা শুনিয়া হরিতপদে গিয়া তাহাকে দেখিল এবং

“শুনিল যতেক রূপ দেখিল নয়নে ।

একটুট হইয়া তার চাহে মুখ পানে ॥

শঙ্ক জননী হৈহার উদরে ধরিল ।

শঙ্ক শঙ্ক কুমার যে নয়নে দেখিল ॥”

সুন্দরকে দেখিয়া মালিনীর বাৎসল্য রসের উদয় হইল। সে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা
করিয়া গোপনে আপন গৃহে আশ্রয় দিল।

কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মালিনীও বিজ্ঞান গৃহে ফুল যোগাইয়া ফিরিবার পথে লোক-
মুখে রূপবান্ সুন্দরের কথা শুনিয়া, তাহাকে দেখিতে আসিল। সুতরাং এই সাক্ষাতের
সময় নিশ্চয়ই মধ্যাহ্নের পূর্বে। কিন্তু ভারতচন্দ্র স্পষ্ট বলিতেছেন—

“সূর্য যায় অস্তগিরি আইসে যামিনী ।

হেন কালে তথা এক আইল মালিনী ॥”

বিজ্ঞান রাধাকান্ত লিখিয়াছেন—সুন্দর যে পুষ্পোদ্ভানের সন্নিকটে সরোবরতীরে বসিয়া-
ছিলেন, সেই স্থানে পুষ্পচয়ন করিতে আসিয়া মালিনী সুন্দরের গীতে আকৃষ্ট হইয়া তাহার
নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাহাকে তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল।

“সরোবে রাজার স্নাত কহেন তখন ।

প্রবাসী পুরুষ কাছে নারী কি কারণ ॥

কোন্ প্রয়োজনে প্রমদারে পরিচয় ।

যাও গো ভবন ভাব ভঙ্গী ভাল নয় ॥”

মালিনী বলিল, “এই উজ্জান মহারাজা বীরসিংহের কন্যার।” এই বলিয়া সরাসরি
তাহার রূপ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলে—

“কপটে কুপিয়া তবে কহে কবিরশি ।

কে তোর রাজাধিরাজ কে তার নন্দিনী ॥

উত্তম মধ্যমাদম বিধি যে কর্যাছে ।

এ কথা আনিলা কেন সন্ন্যাসীর কাছে ॥ ”

তখন মালিনী স্নানের কপটী বাক্য বুঝিয়া বিজ্ঞার পণের কথা বলিল ও তাহাকে গৃহে লইয়া গেল। এখানে রাণাকান্ত অত্যন্ত তাড়াতাড়ি করিয়া প্রটটি কাঁচাইয়া ফেলিয়াছেন।

বলরাম লিখিয়াছেন,—সুন্দর নগর পরিত্রাণকালে

“নগবে পসারি সব আছে সারি সারি।

আপন ইংসায় সতে বেচাকিনি করি ॥

দেখিল মালিনী বৃক্ষতলে ফুল বেচে।

পুষ্প না বিক্রয় সেই একাকিনী আছে ॥

বীরে বীরে কুমার গেলেন বৃক্ষতলে।

কোত্থকে মালিনী মাল্য দিল তার গলে ॥”

তাহার পর মালিনী তাঁহাকে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল এবং সুন্দর আশ্রয় প্রদত্তেছেন জানিয়া তাহার গৃহে আশ্রয় দিতে চাহিল এবং কহিল—

“পতিগুহ্রহীনা

আমি ত দুদীন।

নাহি মোর অস্ত্র জন।

তুমি পুত্র সম

ইথে নাহি কম

চল মোর নিকেতন ॥”

কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ, বিজ্ঞ রাণাকান্ত ও বলরাম, কেহই মালিনীর রূপবর্ণনা করেন নাই। রামপ্রসাদ কিন্তু তাহার চরিত্রের আভাস দিয়াছেন, এই বিষয়ে এবং তাহার নাম ধার করিয়া তিনি ভারতচন্দ্রের কাছে শ্রবণপ্রাপ্ত হইয়াছেন। রামপ্রসাদ ও কৃষ্ণরামের সুন্দরমালিনীসাক্ষাৎ তুলনা করিলে রামপ্রসাদ যে কৃষ্ণরামের অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা সহজেই ধরা পড়ে।

ভারতচন্দ্র হীরাকে চোখের সম্মুখে অবস্থ করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মালিনীর স্বরূপ-বর্ণনা আর কেহই এরূপ করেন নাই—

“কথায় হীরার ধার হীরা তার নাম।

দাঁত ছোলা মাঝা দোলা হস্ত অবিরাম ॥

গালভরা গুয়াপান পাকিমাল গলে।

কানে কড়ি ক’ড়ে রাড়ি কত কথা ছলে ॥

চুড়াবাঁকা চুল পরিধান সাদা সাড়ী।

ফুলের চূপড়ী কাঁধে ফিরে বাড়ী বাড়ী ॥

আছিল বিস্তর ঠাই প্রথম বয়সে।

এবে বুড়া তবু কিছু শুঁড়া আছে শেষে ॥

ছিটাকোটা তন্ত্র মন্ত্র আছে কতগুলি।

চেলড়া ভুলিয়ে খায় চক্ষে দিয়া ঠুলি ॥

বাতাসে পাতিয়া কাঁদ কন্ডল ভেজায়।

পড়সী না থাকে কাছে কন্ডলের দায় ॥

মন্দ মন্দ গতি ঘন ঘন হাতনাড়া ।

তুলিতে বৈকালি ফুল যাইল সেই পাড়া ॥”

কঙ্করাম ও রামপ্রসাদের স্তম্ভর সেইখানে অকপটে মালিনীর নিকট আত্মপরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। গোবিন্দদাস লিখিতেছেন—মালিনী স্তম্ভরকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে কুমার বলিলেন—

“বিজ্ঞা হেতু ফিরি আমি দেশ দেশান্তর ।

তুমিয়া মালিনী তবে করিল উত্তর ॥

মাল্যানী কহেন কথা শুন যুবরাজ ।

আইস আমার গৃহে সিদ্ধি হবে কাজ ॥”

এখানে স্তম্ভরের উক্তিতে তাঁহার উদ্দেশ্য স্পষ্ট ব্যক্ত হয় নাই এবং তিনি যে কোন রাজপুত্র, তাহাও বলেন নাই। তবে মালিনী তাঁহাকে ‘যুবরাজ’ বলিয়া কেন সম্বোধন করিল, কবি তাহার কোন কৈফিয়ৎ দেন নাই।

ভারতচন্দ্রের স্তম্ভর নিজ পরিচয় না দিয়া ছলে আপন উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। মালিনী তাহা বুঝিতে পারে নাই—

“স্তম্ভর কহেন আমি বিজ্ঞাব্যবসাই ।

এসেছি নগরে আজি বাসা নাহি পাই ॥

ভরসা কালীর নাম বিজ্ঞালাভ আশা ।

ভাল ঠাই পাই যদি তবে করি বাসা ॥”

রামপ্রসাদের স্তম্ভর আপন পরিচয় দিয়া এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিবার পরও ভারতচন্দ্রের অসুস্থকরণে বলিতেছেন—

“কিন্তু বিজ্ঞাব্যবসাই, বিজ্ঞা অশেষণে বাই

বিজ্ঞাহেতু বিশেষে গমন ॥

অধিক কহিব কিবা বিজ্ঞা বিজ্ঞা রাতি দিবা

মনে মনে একান্ত ভাবনা ।

সেবি বিজ্ঞা বিজ্ঞা লাগি হইয়াছি দেশত্যাগী

যদি বিজ্ঞা পুরান কামনা ॥”

‘বিজ্ঞা’ শব্দের বিভিন্ন অর্থের উপর বাহ্যিক্রি দেখাইয়া রামপ্রসাদ কবিশ্বরের পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা যে ভারতচন্দ্রের অসুস্থকরণ, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বলরামের স্তম্ভর, মালিনীর গৃহে গিয়া আহালাদি সমাপনাতে বিশ্রামকালে আত্মপরিচয় দিয়াছেন। এইখানে স্তম্ভর বলিতেছেন—

“স্তম্ভর বলেন মাসি করি নিবেদন ।

বারে বারে জিজ্ঞাসহ কতক বচন ॥

মাম মোর স্নান জননী গুণবতী ।

বাপ মোর শ্রীগুণসাগর মহামতি ॥

বিংশতি দিনের পথ বটে মোর ঘর ।

উৎকল জাবিড় দেশ মালিকা নগর ॥*

স্নানর কিছু আপনার আসিবার আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেন নাই। কেবল বলিয়াছেন যে, পুড়িবার অল্প আসিয়াছেন। বলরাম মালিনার মুখ দিয়া রাজা বীরসিংহ ও তাঁহার রাজ্যের বর্ণনা করাইয়াছেন।

রাধাকান্তের স্নানর মালিনীর নিকট নিজ পরিচয় ব্যক্ত করেন নাই। মালিনী তাহাকে ছদ্মবেশী সন্ন্যাসী বলিয়া বুঝিতে পারিষাছিল। কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মালিনী আপনা হইতেই স্নানরের সহিত মাসী পাতাইয়াছে, গোবিন্দদাসের মালিনীও সম্ভবতঃ তাহাই করিয়াছে।* কিন্তু ভারতচন্দ্র লিখিতেছেন—

“কিন্তু মাসী একা থাকে দেখি নষ্টরীতি ।

ছবু ছিঁ খটায় পাছে হিতে বিপরীত ॥

মাসী বলি সঙ্ঘোধন আমি করি আগে ।

নাতি বলে পাছে মাসী দেখে ভয় লাগে ॥

রায় বলে বাসা দিলা হইলা হিতান্বী ।

আমি পুত্রসম তুমি মার সম মাসী ॥”

রামপ্রসাদ মালিনীকে হাটে প্রেরণ প্রসঙ্গে হীরার হাবভাবে স্নানরের যে ভীতির কথা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে ভারতচন্দ্রের এই উক্তির আভাস পাওয়া যায়।

রাধাকান্তের বিমলা স্নানরকে নাতি বলিয়া সঙ্ঘোধন করিতেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধ কে পাতাইল, কবি তাহা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। মধুসূদন চক্রবর্তীর খণ্ডিত পুথির প্রথমেই আরম্ভ হইয়াছে—

“কথা মোর শুন মাসী কহিল স্নানর।”

অতরাং মাসী সম্বন্ধ কে পাতাইয়াছে, তাহা বুঝিবার উপায় নাই। নেপালের কবি কাশীনাথও মালিনীর মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

“স্বামিনি হবে স্নান বোল হমার ।

জায়ন্ত সংদেহ আয় তোহার ॥

বহিনিক তনয় আয়ল মোর ॥

তলি রসিকে ফুল পাখি দেল তোরা ॥”

(১) মুদ্রিত পুস্তকে আছে, মালিনী বলিতেছে—“কহিল পুত্র তুমি এই যে সম্বন্ধ।” শব্দট ‘স্বহিনী’ (অর্থাৎ ভগিনী), ‘কহিল’ নহে। কারণ, অচ্য (৮ পৃঃ) আছে, স্নানর নামেতে মোর স্বহিনীসঙ্গ। অল্প আসিয়াছে সে আশ্রয় ভবন।

বলরামের মালিনী স্তম্ভরকে পুত্রসম বলিয়া তাহার গৃহে বাইতে বলিলে স্তম্ভরই মালিনীকে মাসী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন—

“বলেন স্তম্ভর কোনখানে ঘর
নামে হৈলে মোর মাসী ।
বলেন কুমার তুমি যে আমার
হৈলে বড় হিতাশী ॥”

৩। মালিনীর দোঁতা

(ক) স্তম্ভরের মালিনীর গৃহে গমন

ককরাম ও রামপ্রসাদের মালিনী স্তম্ভরের সহিত সাক্ষাতের পরই তাহাকে গৃহে লইয়া বাইতে বাইতে স্তম্ভরের অহুরোধে বিস্তার রূপবর্ণনা করিয়াছে। গোবিন্দদাসের ও বলরামের মালিনী বিস্তার রূপবর্ণনা মোটেই করে নাই। কিন্তু রাধাকান্ত স্তম্ভরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ-কালেই মালিনী কৰ্ত্তৃক বিস্তার সংক্ষেপে রূপবর্ণনা করাইয়াছেন। তারতচন্দ্রের স্তম্ভর কিন্তু মালিনীর সহিত সাক্ষাতের পরদিন অপরাহ্নে বিশ্রামকালে মালিনীকে রাজবাড়ীর পরিচয় ও বিস্তার রূপবর্ণনা করিতে বলিয়াছেন। ইহাতে কাব্যের ‘প্লট’ স্বাভাবিক হইয়াছে। মালিনী কৰ্ত্তৃক একজন নবাগত বিদেশীর নিকট সরাসরি সেই দেশের রাজকন্ডার রূপবর্ণনা করা কিংবা সেই বিদেশীর পক্ষে নব-পরিচিতা বর্ষীয়সী রমণীকে সহসা রাজকন্ডার রূপের কথা জিজ্ঞাসা করা যেমন অশোভন, তেমনই অস্বাভাবিক। আমরা পরে বিত্তিন্ন কবির “বিস্তার রূপবর্ণনা” প্রসঙ্গ আলোচনা করিব।

গোবিন্দদাস, ককরাম ও রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন—স্তম্ভর একরাত্রি মালিনীর গৃহে থাকিবার পর নদীতটে শিবপূজা করিতে গিয়া দেখিলেন, মালিনীর মালঞ্চ শুষ্ক তথায় ফুল নাই। পুষ্প বিনাই শিবপূজার উদ্ভোগ করিতেই শুষ্ক মালঞ্চ মঞ্জরিত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া মালিনী বিস্মিত হইয়া স্তম্ভরকে অসামান্য পুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারিল ও স্তুতি করিল। তারতচন্দ্র এইরূপ অলৌকিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন নাই। তাহার স্তম্ভর মালিনীর গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—

(২) পূর্বে উদ্ধৃত ভারতচন্দ্রের স্তম্ভরের মালিনীর প্রতি উক্তি সহিত এই উক্তির অভূত মিল হইতে ভারতচন্দ্রের প্রভাবেরই স্পষ্ট সূচনা করে না কি? এইরূপ উক্তি বলরামের স্তম্ভর আর একবার করিয়াছেন নিজ-পরিচয় দানকালে—

“তুমি মোর মাতা বুড়ী তুমি মোর মাসী ।
তুমি মোর বসুন্ধর তুমি সে হিতাশী ।”

(কালিকামঙ্গল, ২য় সর্গ, পৃঃ ১৭)

“চৌদিকে প্রাচীর উচা কাছে নাহি গলি শুচা
 পুষ্পবনে ঢাকে শশী রবি ॥
 নানাজ্ঞাতি ফুটে ফুল উড়ি বৈসে অলিকুল
 কুহু কুহু কুহরে কোকিল ।
 মন্দ মন্দ সমীরণ রসায় ঞ্জির মন
 বসন্ত না ছাড়ে এক তিল ॥”

বঙ্গদেশে মালিনীর, বিশেষতঃ যে মালিনী রাজবাটীতে ফুল সরবরাহ করে, তাহার মালঞ্চ ফুল থাকিবে না ও তাহা শুষ্ক হইয়া থাকিবে, ইহা যেন কল্পনাই করা যায় না। কালীভক্তের মহিমা ব্যক্ত করিতে গিয়া গোবিন্দদাসপ্রমুখ কবিগণ স্বভাবকে বিকৃত ও কাব্যের পরিকল্পনাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন।

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, সেই দিনই আহারাদির পর মালিনীকে কার্ঘ্যে সাহায্য করিবার জন্ত হুন্দর ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া দিলে মালিনী সাজিতে পুষ্প সাজাইয়া ও মালা লইয়া বাড়ী বাড়ী পুষ্প যোগান দিতে দিতে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিল। বিজ্ঞার সখীগণ পুষ্প দেখিয়া আশ্চর্য হইল ও মালাখানি লইয়া, তাহা কে গাঁথিয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে মালিনী বলিল, সে নিজেই গাঁথে—যখন যেরূপ তাহার মনে লয়—

“পতি পুত্র নাহি মোর তাই সহোদর ।

কেবা আছে কেবা গাঁথে কি দিব উত্তর ॥”

কৃষ্ণরাম মূলতঃ গোবিন্দদাসকেই অহুসরণ করিয়াছেন। তবে তাঁহার হুন্দর স্পষ্টই বলিয়াছে—

“শুন মাসি অস্ত্র বসি আমি গাঁথি মালা ।

তুই হৈয়া নেবে মালা নুপতির বালা ॥”

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, হুন্দর মালিনীর সহিত সাক্ষাতের পরদিন প্রভাতে স্নান করিয়া পুষ্পায় বসিলে—

তুলি ফুল গাঁথি মালা

সাজাইয়া সাজি ডালা

মালিনী রাজার বাড়ী যায় ॥

রাজা রাণী সম্ভাষিয়া

বিজ্ঞারে কুসুম দিয়া

মালিনী স্বরায় আইল ঘরে ।

হুন্দর বলেন মাসি

নাহি মোর দাস দাসী

বল হাট বাজায় কে করে ॥

(৩) বলরামের মালিনীর গৃহের বর্ণনা অনেকটা এইরূপ—

“প্রাচীর চৌদিকে

ঘর মধ্যভাগে

শোভয়ে ফুলের গাছে ।

বড় রম্য স্থল

নিকটেতে জল

পড়সী নাহিক কাছে ॥”

অন্তর্যং দ্বিতীয় দিনে অম্বর মালা গাঁথিয়া দেন নাই, বিজ্ঞারও কোন সন্দেহ হয় নাই। রামপ্রসাদের অম্বর কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই মালিনীকে রাজ্যারে পাঠাইয়া একেবারে সাংকেতিক লিখন সহ পরিচয়পত্র দিয়া মালা গাঁথিয়াছেন এবং মালিনী হাট হইতে ফিরিয়া সেই মালা সহ সাজি লইয়া রাজকল্পার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছে। রামপ্রসাদ লিখিতেছেন—

“বার দিয়া বলিল বিনোদবর পাশে।

বাসনা বলিতে নারে ফিক্ ফিক্ হাসে ॥

ভাবে কবি এ মাগী বয়সে দেখি পোড়া।

ভাবে দেখি এ প্রকার হয় নাই বুড়া ॥

কটির কাপড় গাটি কত বার খোলে।

ভূজপাশ উদাস, গা ভাজে হাই তোলে ॥

হেসে হেসে আরো এসে ঘনায় নিকটে।

কি জানি কপালে মোর কোনখান ঘটে ॥

কামাতুরা হইলে চৈতন্ত থাকে কার।

বিশেষতঃ নীচজাতি নীচ ব্যবহার ॥

তয়ে অতি হীরাবতী প্রতি কহে হাসি।

গোটাকত টাকা নিয়া হাটে বাও মাসী ॥

প্রমথ পতির প্রিয়া পূজা ইচ্ছা আছে।

এতো বলি বারো টাকা ফেলে দিল কাছে ॥

আমি আজি গাঁথি মালা তোমার বদলে।

দেখ দেখি নুপতিনন্দিনী কিবা বলে ॥”

যদুন্দন চক্রবর্তী রামপ্রসাদের ভ্রাতা দ্বিতীয় দিনেই (†) মালিনীকে হাটে পাঠাইয়া অম্বরকে দিয়া মালা গাঁথাইয়াছেন। কিন্তু অম্বর সে দিন কোন সাংকেতিক লিপি দেন নাই। মালা দেখিয়া রাজকল্পার সন্দেহ হইয়াছে এবং মালিনী তাহার ভগিনীপুত্র মালা গাঁথিয়াছে বলিলে রাজকল্পা ধমক দিয়া তাহার নাম জানিয়া লইয়াছেন এবং—

“বিজ্ঞা বলে হইয়া হরষিত।

তোর বোলে না যাব প্রতীত ॥

সে জন যে কহে তোর তরে।

তাহা আসি কহিবে আনারে।

(†) রামপ্রসাদ মালিনীকে একেবারে মিলজা ও নষ্টচরিত্রা করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; এরূপ আর কেহ করেন নাই। ভারতচন্দ্রের হীরাও অম্বরের দিকট কোমরূপ কামেদিত্ব করেন নাই।

(খ) মালিনীর হাটে গমন ও সুল্লরের সাংকেতিক পত্র সহ মাল্য গ্রহণ

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, প্রথম দিন রাজকন্যা মালা দেখিয়া সন্মোহিত হইয়া গিয়া মালিনী সুল্লরের নিকটে আসিয়া আপনা হইতেই সুল্লরের নিকট বিস্তার প্রতিক্ষার কথা বলিয়া বলিল—“তুমি ভিন্ন বিস্তার উপযুক্ত বর আর কেহ নাই। সুল্লর বিস্তার প্রতিক্ষার কথা শুনিয়া বলিলেন, বিধান হইলেই যে সে সুল্লাজ হইবে, তাহার প্রমাণ কি? বিধানদিগের মধ্যেও অনেক অসম্মত আছে। সুতরাং বিস্তা নিতান্ত অবোধের দ্বারা প্রতিক্ষা করিয়াছে। তাহার পরদিন সুল্লর বিনা সুল্লায় মালা গাঁথিয়া তাহার মধ্যে অঙ্গুরীয় পড়িয়া রাখিয়া দিলেন। তাহা হইতে সুল্লর দ্বারা কিরণ বিকীর্ণ হয়। গোবিন্দদাস মালিনীর হাটে যাওয়ার প্রসঙ্গ উত্থাপিত করেন নাই।

কৃষ্ণবাস, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র ও মধুসূদন চক্রবর্তী মালিনীর হাটে যাইবার কথা লিখিয়াছেন। মধুসূদন লিখিয়াছেন—সুল্লর মালিনীকে একটি টাকা দিয়া হাটে পাঠাইতে চাহিলে সে বলিল, তাহাকে রাজবাড়ীতে ফুল ঘোগাইতে হর; সে কিরূপে হাটে যাইবে? তখন সুল্লর মালা গাঁথিয়া দিবার প্রস্তাব করিলে প্রথমে মালিনী বিশ্বাস করতে পারিল না যে, সুল্লর মালা গাঁথিতে পারিবে। কিন্তু সুল্লরের দৃঢ় মতি দেখিয়া—

“এত বলি হরষিত হৃদয়ে মালিনী।

হাতে তড়া করি হাটে চলিলা মালিনী ॥

ভাঙ্গায় তহার মূল্য করিয়া বিচার।

মুপ দীপ আদি যত কিনে উপহার।

কিনিয়া পুজার দ্রব্য কিনিল বেসাতি।

শ্রমণ করিল হাটে হয়ে দৃষ্টমতি ॥”

পূর্বেই বলিয়াছি, মধুসূদনের সুল্লর এই দিন কোন সাংকেতিক পত্র দেন নাই। পরদিন পূর্ববৎ মালিনীকে হাটে পাঠাইয়া মাল্যের মধ্যে সাংকেতিক পত্র লিখিয়া দিলেন। মাল্য গ্রহণের বিশেষ বর্ণনা মধুসূদন করেন নাই। কৃষ্ণবাস সংক্ষেপে সুল্লরের মাল্য গ্রহণ বর্ণনা করিয়া কেতকী পুষ্পে সুল্লর কর্তৃক নিজ সমাচার লিখন বর্ণনা করিয়াছেন। রামপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত বিশদভাবে মাল্য গ্রহণ ও পরিচয় লিখন বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পদ্মদলে সুল্লর দ্বারা সুল্লর কর্তৃক নিজ পরিচয় লিখাইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের সুল্লর মালায় কারিগরী না করিয়া কেয়াপাতার কোটার মধ্যে পুষ্পময় রতি কাম গড়িয়া, কেয়াপাতার চিত্রকাব্যে শ্লোক লিখিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন। এরূপ ভাবে কোটা নির্মাণ হইল যে, কোটা খুলিলে মদনের ফুলবাণ বিস্তার বৃকে গিয়া লাগে। মধুসূদনও ভারতচন্দ্রের দ্বারা সাংকেতিক পত্রে এই শ্লোকই লিখিয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণবাস ও রামপ্রসাদ এই শ্লোকটি

(৫) “বহুনা বহুনা লোকে বন্দতে মন্দজাতিজন্ম।

কমভোক্তা মতিপ্রভে দ্বিতীয়ে পঞ্চমোপহব্ধ।

বিজ্ঞার সহিত বিচারপ্রসঙ্গে বিজ্ঞা কর্তৃক পরিচয় জিজ্ঞাসিত হইয়া স্তম্ভের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন ।

বলরাম মধুসূদনের স্তায় মালিনীকে একটি টাকা দিয়া বাজার হইতে তক্ষ্য দ্রব্য কিনিয়া আনিতে বলিলে, সে ঐ একই অক্ষুহাত দেখাইয়া বলিল, রাজকন্তাকে ফুল জোগাইয়া তাহার পর সে হাটে ঘাইতে পারে । তখন স্তম্ভর বলিলেন যে, তিনি নিজেই ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়াছেন । তখন মালিনী হাটে গেল । বলরাম বিশদভাবে স্তম্ভরের পুষ্পচয়ন ও মালা গ্রহণ বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার স্তম্ভর এবং ফুলের সাঁপুড়া ভৈরৱি করিয়া সাফল্যের সঙ্গে তালপাতে দীর্ঘ লিখন লিখিয়া পাঠাইয়াছেন ।

ভারতচন্দ্র হীরার হাটে গমন ও দোকানীদের তাহাকে দেখিয়া আতঙ্ক অতি স্তম্ভরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন ; ইহা আর কোন বিজ্ঞাস্তম্ভরে নাই । ভারতচন্দ্র সম্ভবতঃ মুকুন্দরামের চণ্ডী হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছেন । মুকুন্দরামের দ্বর্ভলার হাটের হিসাব পরবর্তী কবিগণের মালিনীর বেসাতির হিসাবের আদর্শ হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ।

ভারতচন্দ্রের কাব্যে স্তম্ভর মালিনীকে পুজার দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে পাঠান নাই, তক্ষ্য দ্রব্য কিনিতে পাঠাইয়াছিলেন । স্তম্ভর তাহাকে বাজারের অল্প দশ টাকা ও পারিশ্রমিক স্বরূপ দুই টাকা, মোট বারো টাকা দিয়াছিলেন, এ বিষয়েও রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের নিকট শ্রুতি ।

মালিনীর বেসাতির হিসাবে কৃষ্ণরামের যথেষ্ট মৌলিকত্ব আছে এবং ভারতচন্দ্র তাঁহার নিকট বিশেষ শ্রুতি । আমরা নিম্নে উভয় কবির মালিনীর বেসাতির হিসাব দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি—

কৃষ্ণরাম

হেন কালে মাল্যানী আইল নিজ পুরী ।

বোকা তুলাইয়া কহে বচন চাতুরী ॥

পাছে বুঝ মাসি কিছু করিয়াছে চাপা ।

কোথায় এমন টাকা পাইয়াছিল বাপা ॥

মোহরে গণিয়া দশ দিলে বটে তুমি ।

সিঁকা সিঁকা কাটিল মণত (১) বাট্টা কমি ॥

বদলিয়া পুরাপিট হইল সাড়ে সাত ।

ধোকে ছয় তঞ্চার বণিক দিয়া জ্বাত ॥

কপূর কিনিলু আগে আর আর এড়্যা ।

তিন টাকা ছিল তোলা আজি তার দেড়্যা ॥

অগৌর চন্দন চুয়া আছে কি পাইতে ।

চক্ষু ঠেকরিয়া গেল চাহিতে চাহিতে ॥

জয়কল লবঙ্গ প্রসঙ্গ হাটে নাঞি ।

কিছু কিছু আনিলাম আমি বুঝি তেঞি ॥

তবে থাকে টাকা দেড় ভাঙ্গাইতে চাই ।

আপ্তন লাগিল কড়ি কম দর পাই ॥

আতিবিত্তি লইলাম বেসাতি ফুরায় ।

চাহিতে চাহিতে যেন চরকি ঘুরায় ॥

স্বতের দোকানে দেখি এত কেন চোক ।

ঠেলাঠেলি গণ্ডগোল গায়ে গায়ে লোক ॥

কিনিতে চিকন চিনি কত ছড়াছড়ি ।

প্রায় পড়িল পোয়া সাড়ে সাত বুড়ি ॥

বিবাহ অনেক ঠাঞি কর্ণবেধ কারো ।

এ জন্ত দ্রব্যের দর বাড়িআছে আরো ॥*

(৬) ইহার পরে এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিতে অতিরিক্ত পাঠ আছে—

*পশিতে মারিলাম গুয়া পবনের বাড়া ।

পোণেকে ছুই পোন পান সেহ মছে সাড়া ॥

যেন তেন হাঁচের আহরে একশুণ ।

সন্তে মাজ বাজারে খুজত আছে চুপ ॥

লিখিয়া খুঁজুরা ত্রব্য বুঝ যতগুলি ।
আমার খরচ এই ছয় বুড়ির তুলা ॥
গণ্ডা দশ বারো কড়ি পড়িয়াছে তুল ।
বিকালে সকল দিব বিকাইলে ফুল ॥

মুখে বড় দড়বড়ি দিলেক বুঝান ।
দশের অর্ধেক তঙ্কা তার জলপান ॥
সুন্দর শুনিয়া হাসে বড় কুতূহলে ।
চোরের উপরে চুরি কঙ্করাম বলে ॥”

ভারতচন্দ্র

“বেসান্তিকড়ির লেখা বুঝ রে বাছনি ।
মাসী ভাল মন্দ কিবা করহ বাছনি ॥
পাছে বল বুনিপোরে মাসী দেই খোঁটা ।
যটি টাকা দিয়াছিল সবগুলি খোঁটা ॥
বে লাঞ্ছ পেয়েছি হাতে কৈতে লাঞ্ছ পায় ।
এ টাকা মাসীরে কেন মাসী তোর পায় ॥
তবে হবে প্রত্যয় সাক্ষাতে যদি ভাদি ।
ভাদাইছ হু কাহনে ভাগ্যে বেণে ভাদি ॥
সেয়ের কাহন দরে কিনিছ সন্দেশ ।
আনিয়াছি আধ সের পাইতে সন্দেশ ॥
আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি ।
অল্প লোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি ॥
হুর্লভ চন্দন চুরা লজ জায়কল ।
জলভ দেখিছ হাতে নাহি যায় ফল ॥
কত কষ্টে ঘৃত পামু সারা হাট ফিরা ।
যেটি কয় সেটি লয় নাহি লয় ফিরা ॥

ছই পণে এক পণ আনিয়াছি পান ।
আমি যেই ঠেই পামু অস্ত্রে নাহি পান ॥
অবাক হইছ হাতে দেখিয়া শুবাক ।
নাহি বিনা দোকানির না সরে শুবাক ॥
হুঃখেতে আনিছ হুঙ্ক গিয়া নদীপারে ।
আমা বিনা কার সাধ্য আনিবারে পারে ॥
আট পণে আনিয়াছি কাঠ আট আটি ।
নষ্ট লোকে কাঠ বেচে তারে নাহি আটি ॥
খুন হয়েছিছ বাছা চুন চেয়ে চেয়ে ।
শেষে না কুলায় কড়ি আনিলাম চেয়ে ॥
লেখা করি বুঝ বাছা ভুমে পাতি খড়ি ।
শেষে পাছে বল মাসী খায়াইল খড়ি ॥
মহার্য দেখিয়া ত্রব্য না সরে উত্তর ।
যে বুঝি বাড়িবে দর উত্তর উত্তর ॥
শুনি স্নরে মহাকবি ভারত ভারত ।
এমন না দেখি আর চাহিয়া ভারত ॥

বিষয় বর্ণনায় ভারতচন্দ্র মৌলিকত্ব দেখান নাই বটে, তবে কাব্যে অন্ত্যযমকের দ্বারা শব্দ-সম্পদের প্রাচুর্য দেখাইয়াছেন ।

(গ) বিভার রূপবর্ণনা

মালিনী বাজার করিয়া আনিলে সুন্দর রতন কুরিয়া আহারাধি করিলেন । ভারতচন্দ্র তাহার পরেই মালিনীর সহিত কথোপকথন প্রসঙ্গে রাজবাড়ীর পরিচয় ও বিভার রূপবর্ণনা করিয়াছেন । বলরাম প্রথম দিনেই এই পরিচয়াদি প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন । তবে বিভার রূপবর্ণনা করেন নাই । আমরা এইবার অস্ফুট কবির রূপবর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া তাহার তুলনা-মূলক সমালোচনা করিব ।

কৃষ্ণরাম

“রামা রমা সমা স্ত্রীমা সেবার কারণে ।
জ্বিনল জ্বাবকবিজ্ঞা দশন-বসনে ॥
উচ্চ হয় কুচ ছুটি বিবাদ করিয়া ।
দাড়িষ বিদরে বেন শোভা না ধরিয়া ॥
দিখল লোচন জোর কি বলিব তায় ।
হরিণী হারিল আর উপমা কোথায় ॥
নহে নিরমল চাঁদ বদনের তুল ।
কি আর গরব করে কমলের ফুল ॥
কষিল কষিল সোণা কলেবর মাঝে ।
হারিয়া স্তবর্ণ নাম হারাইল লাঞ্জে ॥
বিশেষ সংসারে তার না হয় তুলনা ।
ভুরু মদনের ধনু ধরিল ললনা ॥
বাহু হেরি পাতাল পশিতে চায় বিস ।
গমনে যেমন পজ মরালের ইষ ॥

সভায় মুকতি আশা নাশায় শিশির ।
লীলায় লইল স্ত্রী হরিয়া শশীর ॥
জ্বিনিয়া রক্তার স্তম্ভ উরুযুগ লাঞ্জে ।
অধোমুখ করিবর করিলেক লাঞ্জে ॥
খেয়াতি ক্ষিতির নাম বটে সর্বগহা ।
নিভেধের ভরে এবে ঘুচাইল তাহা ॥
পায়র করিল কেশ চামরের চয়ে ।
কৃপাবস্ত্র জ্বলদ বিবাদবস্ত্র হয়ে ॥
জ্বিনি মুগরাঙ্ক মাজা অতিশয় থিনি ।
কিসের ঈশের আর ডুবুঝ বাখানি ॥
মহাযোদ্ধা অশনি সহিতে পারে বুকে ।
তাহার কটাক্ষবাণ-বিদ্ধে এক টুকে ॥

রামপ্রসাদ

“চাঁচর চিকুরজাল জলধর জ্বিনি ।
ঐতিবৃগে পরাভব পাইল গীর্ধিনী ॥
ভুবিল কুরঙ্গশিঙ মুখেদু স্তবায় ।
লুপ্ত গাত্র তজ মাত্র নেত্র দেখা যায় ॥
নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার ভরে ।
অত্মাপি ধ্বজন নিত্য কর্মভোগ করে ॥
অমিয়া জড়িত ভাষা নাসা তিলফুল ।
বিষাধর দশনে মুকুতা নহে তুল ॥
পুশ্ণধনু ধনু অণু কি ভুরু ভজিয়া ।
বাহু তুল নহে বিসে কিসের গরিমা ॥
যৌবন জলধি মধ্যে মন্দ মন্ত গজ ।
উরে দৃষ্ট কুস্তস্থল সে নহে উরজ ॥
নাভিপদ্ম পরিহারি মন্ত মধুপান ॥
ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণ কুস্তস্থান ॥
কিছা লোমরাঞ্জি ছলে বিধি বিচক্ষণ ।
যৌবন কৈশোরে বন্দ করিল ভঞ্জন ॥

কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্ত ।
কেহ বলে দেবদৃষ্টি থাকিবে অবস্ত ॥
হৃদয় বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ ।
বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ ॥
নিবিড় বিপুল চারু বৃগল নিতম্ব ।
কাম পারাবার পার সার অবলম্ব ॥
যতপি অচিরপ্রভা চিরস্থিরা হয় ।
তবে বুঝি তহু শোভা হয় কি বা নয় ॥
মন্দ মন্দ গমনে যতপি বঁকা চায় ।
ননোত্তর পরাভব লইয়া পলায় ॥
কোন্ বা বড়াই তার পঙ্কশর কুণে ।
কত কোটি ধর শর সে নয়ন কোণে ॥
পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্রবহর ।
তাহার অসহ্য বালা হানে দৃষ্টিশর ॥

ভারতচন্দ্র

“বিনানিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায় ।
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকার ॥
কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা ।
পদনখে পড়ি তার মাখে কতগুল ॥

কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে ।
ভুরু সমান কোথা ভুরুভঞ্জে ভুলে ॥
কাড়ি নিল মুগমদ নয়নহিল্লোলে ।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ-মুগ লয়ে কোলে ॥

কেবা করে কারশরে কটাক্ষের সহ ।
 কটুতায় কোটি কোটি কালকূট কম ॥
 কি কাজ সিন্দূরে মাঝি মুক্ততার হার ।
 তুলায় তর্কের পীতি হস্তপীতি তাব ॥
 দেবাসুরের সদা দ্বন্দ্ব সুধার লাগিয়া ।
 ভয়ে বিধি তার মুখে ধুইলা লুকাইয়া ॥
 পদ্মবোশি পদ্মনালে ভাল গড়েছিল ।
 তুচ্ছ দেখি কীট দিয়া জলে ডুবাইল ॥
 কুচ হইতে কত উচ মেরু চূড়া ধরে ।
 শিহরে কদম্বফুল দাড়িধ বিদরে ॥
 নাভিকূপে যাইতে কাম কুচশব্দ বলে ।
 ধরেছে কুন্তল তার রোমাবলি ছলে ॥
 কত সঙ্গ ভয়ঙ্কর কেশরিমধ্যস্থান ।
 হরগৌরী করপদে আছে পরিমাণ ॥
 কে বলে অনঙ্গ অঙ্গ দেখা নাহি যায় ।
 দেখুক যে আঁখি ধরে বিভার মাজায় ॥

যেদিনী হইল মাটি নিতম্ব দেখিয়া ।
 অজ্ঞাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া ॥
 করিকর রামরক্তা দেখি তার উরু ।
 জুবলনি শিখিবারে মানিলেক গুরু ॥
 যে জন না দেখিয়াছে বিভার চলন ।
 সেই বলে ভাল চলে মরাল বারণ ॥
 জিনিয়া হরিদ্রাচাঁপা সোনার বরণ ।
 অনলে পুড়িছে করি তার দরশন ॥
 রূপের সমতা দিতে আছিল তড়িত ।
 কি বলিব ভয়ে হির নহে কদাচিত ॥
 বসন ভূষণ পরি বধি বেশ করে ।
 রতি সহ কত কোটি কাম বুঝে মরে ॥
 প্রমর ঝড়ার শিখে কঙ্কণ বৃত্তারে ।
 পড়ায় পঙ্কম স্রব ভাবে কোকিলারে ॥

অজ্ঞাত বিজ্ঞানসন্দের কাব্যের কবিদিগের মধ্যে কেবল দ্বিজ রাধাকান্তের কাব্যে বিক্ষিপ্ত ভাবে বিভার রূপবর্ণনা পাই। যথা—(১) মালিনীর সহিত স্নানের সাক্ষাৎকালে মালিনী কর্তৃক রূপবর্ণনা, (২) অশোকবনে মদনপুত্রার্থিনী বিভার বর্ণনা ও (৩) বিভা ও স্নানরের রহস্তালাপ প্রসঙ্গে। কিন্তু পূর্বোক্ত কবিদ্বয়ের কাহারও সহিত সে বর্ণনার তুলনা করা যায় না।

কৃত্যরাম এই রূপবর্ণনায় অল্পপ্রাস অতিশয়োক্তি ও ব্যতিরেক অলঙ্কার যথেষ্ট ব্যবহার করিলেও অলঙ্কারভারে তাঁহার ভাষা ভারাক্রান্ত হয় নাই। তাঁহার বর্ণনার মধ্যে একটা সহজ ভাব রহিয়াছে। রামপ্রসাদের বর্ণনায় সেই সহজ ভাব নাই এবং ভাষা অলঙ্কারপ্রধান হইয়া পড়িয়াছে। ভারতচন্দ্রের বর্ণনা শব্দলালিত্যে ও সুবিস্তৃত অলঙ্কারসংযোগে অপরূপ। এই তিনটি বর্ণনার মধ্যে তাঁহার বর্ণনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। কৃত্যরাম নারীর রূপ-বর্ণনার সাধারণ নিয়ম, অর্থাৎ মস্তক হইতে পদতল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বর্ণনা, ঠিক অহুসরণ করেন নাই; কিন্তু অপর দুই জন তাহা যথাযথ করিয়াছেন।

(ঘ) মালিনী ও বিভার কথোপকথন

মালিনী স্নানরের পাঁখা মালা ও পদ্মাদি লইয়া বিভার ভবনে গেলে, বিলম্ব দেখিয়া রাজকন্যা মালিনীকে তিরস্কার করিলেন। গোবিন্দদাসের স্নানর কেবল বিনি স্ত্রীতায় মালা পাঁখিয়া দিয়াছিলেন, কোন পদ্মাদি দেন নাই। কিন্তু নিজ অসুখী তাহার মধ্যে রাখিয়া-ছিলেন। স্ত্রীতায় তাঁহার মালিনীকে বিভার নিকট তিরস্কৃত হইতে হয় নাই। গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন—

“বলিতে বলিতে বাণী রজ্জা যে মালায়ানী
 হরষিত করিলা গমন ।
 পুষ্পসাজি লৈয়া করে হরষিত অন্তরে
 গেলা রাজকন্টার সদন ॥
 নেতের দিব্য বসন করিয়া যে পিঙ্কন
 করেতে লইয়া গুয়াপান ।
 পলিত হুচ যুগ সদায় হস্ত মুখ
 হরষিতে করিলা গমন ॥”

তাহার পর মালিনী রাজবাটীতে সকলকে পুষ্প দিয়া সজ্জা করিয়া বিজ্ঞার নিকটে গেল ।
 বিজ্ঞা শিবপূজা করিতেছিল । মালিনী গিয়া সখী চিত্তরেখার হাতে মালা দিলে

“জল স্পর্শ দিয়া মালা লইল করে ।
 সূর্যের কিরণ মেখে মালায় ভিতরে ॥
 হরগৌরী পাদপদ্মে দিল পুষ্পহার ।
 নৈবেদ্য রচনা দিয়া কৈল নমস্কার ॥
 দণ্ডবৎ করি কস্তা রহিল ঐ মনে ।
 লজ্জায় উঠিয়া বৈসে চাহে সখি পানে ॥”

এইখানে মনে হয়, বিজ্ঞা সম্ভবতঃ দৈবপ্রভাবে স্তম্ভর যে মালা গাঁথিয়াছেন, তাহা যেন
 বুঝিতে পারিয়াছেন । তাহার পরেই মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কে মালা গাঁথিয়াছে ?
 মালিনী সরাসরি উত্তর দিল যে, স্তম্ভর নামে তাহার ‘বুহিনীনন্দন’ গেই মালা গাঁথিয়াছে ।
 কিন্তু রাজকস্তা সে কথা বিশ্বাস না করিয়া চাপাচাপি করিতেই মালিনী বলিল—

“মালায়ানী বলেন কস্তা যোর কিবা ডর ।
 সার্থক পূজিলা তুমি ভবানী শঙ্কর ॥
 কতকাল ছিল কস্তা তোমার আরাধনা ।
 যে কারণে পাইলা বর মনের বাসনা ॥”

ইহার পরেই মালিনীর সহিত বিজ্ঞা স্তম্ভরকে দেখিবার পরামর্শ করিয়াছেন ।

কৃষ্ণরামের মালিনী বিলম্বে ফুল লইয়া গেলে—

সমুখে বিমলা দেখি বিমল কমলমুখী
 বলে বিজ্ঞা ঘুরায় লোচন ।
 মুখে থাক নিজালয় আমারে না করে ভয়
 ফুল আন যখন তখন ॥
 প্রায় কর অবহেলা তৃতীয় প্রহর বেলা
 কবে আর পূজিব ভবানী ।
 যেমত তোমার কাজ অভাগ্য চক্ষের লাজ
 নহে পারি শিখাইতে এখনি ॥”

মালিনী কমা চাহিয়া বিদায় হইলে বিজ্ঞা বিনা স্নতে পীথা মালা দেখিয়া ও লিখন পড়িয়া ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন, পূজার ধ্যান ঘুরিয়া গেল। মালিনী তিরস্কৃত হইয়া হৃৎপিণ্ড-চিন্তে গৃহে গমন করিল।

বলরাম লিখিয়াছেন, মালিনীর বিলম্বে বিজ্ঞা উদ্বিগ্ন হইয়া—

গজাজলে করি স্নানে আছয়ে পূজার স্থানে

মালিনী আসিব কতক্ষণে।

করিয়া পূজার সাজে আছয়ে পুষ্পের ব্যাজে

ঘন আদেশয়ে সখীগণে ॥

সখীগণ বলে বাণী অহি আইল মালিনী

বলে বিজ্ঞা নুপতিনন্দিনী।

হইল উজ্জ্বর বেলা মোর কাষে কর হেলা

কবে আমি পূজিব রন্ধিনী ॥

মালিনী পুষ্প অধেষণে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া ওজর দেখাইল, বিজ্ঞা সাঁপুড়া দেখিয়া ধূম্বী হইল ও কে সেই সাঁপুড়া চিত্রিত করিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে করিতে মালিনীর সম্মুখেই তাহা ধূলিয়া ফেলিল। সাঁপুড়া মধ্যে পত্র পাইয়া তাহা পাঠ করিয়া মালিনীকে হৃদয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া অশ্রুনয় করিতে লাগিল।

রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের পদাংক অমুসরণ করিয়াছেন। মালিনী বিলম্বে ফুল লইয়া গেলে

দাঁড়াইল আগে সতী কহে রাগে

হেদে বা কোথায় ছিল।

সকল যোগান করি সমাধান

কি ভাগ্য যে দেখা দিলা ॥

ভুলিলা সে কাল এবে ঠাকুরাল

গরবে উলসে গা।

কানে দোলে গঁটে পথে যাও হেঁটে

ঠাহরে না পড়ে পা ॥

তোরে বৃথা কই নিজে ভাল নই

এ পাপ চক্ষের লাজ।

মতুবা ইহার জানি প্রতিকার

যেমন তোমার কাজ ॥

হীরা ভূমিতে সাজি রাখিয়া কমা ভিক্ষা করিয়া সম্মলনেত্র গৃহে চলিয়া গেল। তাহার পর মালা দেখিয়া বিজ্ঞা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

ভারতচন্দ্রের বিজ্ঞা হীরার বিলম্ব দেখিয়া ঘূর্ণিতলোচনে তাহাকে তিরস্কার করিলেন—

কুম লো মালিনী কি তোর রীতি ।
 কিঞ্চিৎ হৃদয়ে না হয় ভীতি ॥
 এত বেলা হৈল পূজা না করি ।
 কুধায় তুফায় অলিয়া মরি ॥
 বুক বাড়িয়াছে কার সোহাগে ।
 কাল শিখাইব মায়ের আগে ॥
 বুড়া হলি তবু না গেল ঠাট ।
 রাঁড় হয়ে যেন বাঁড়ের নাট ॥
 রাঙে ছিল বুঝি বধুর শুম ।
 এতক্ষণে তেঁই ভাঙ্গিল শুম ॥
 দেখ দেখি চেয়ে কতেক বেলা ।
 মেয়ে পেয়ে বুঝি করিস হেলা ॥
 কি করিবে তোরে আমার গালি ।
 বাপারে কহিয়া শিখাব কালি ॥”

মালিনী বিনয় করিয়া কহা চাহিলে বিজ্ঞার রোষ চলিয়া গেল, রসিকতা করিয়া—

বিজ্ঞা কহে দেখি চিকণ হার ।
 এ পাঁথনি আই নহে তোবার ॥
 পুন কি যৌবন ফিরি আইল ।
 কিবা কোন বধু শিখারে দিল ॥

এইবার হীরার অভিমানের পালা—

হীরা কহে ভিত্তি আঁখির নীরে ।
 যৌবন জীবন গেলে কি ফিরে ॥
 নহে কীণ মাজা কুচ কঠোর ।
 কি দেখিয়া বদ্ধ আসিবে মোর ॥
 ছাড়ি আই বলা জানি সকল ।
 গোড়ায় কাঁটিয়া মাথায় জল ॥
 বড়র পিরীতি বালির বাধ ।
 ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ ॥

তাহার পর কৌটা খুলিয়া দেখিতে বলিলে, বিজ্ঞা যেই কৌটা খুলিলেন, অমনি হাত হইতে পুষ্পময় মননের ফুলশর তাঁহার বক্ষে বিদ্ধ হইল। শ্লোক পড়িয়া বিজ্ঞা আরও বিকল হইলেন।

বধুব্রতের ক্ষম্বর প্রথম দিন মালিনীকে হাটে পাঠাইয়া যে মালা পাঁথিয়া দিয়াছিলেন বিজ্ঞা সেই মালা দেখিয়া মালিনীকে, কে মালা পাঁথিয়াছে জানিতে চাহিল —

কহে তবে মালিনী সম্ভয় ।
 যোর এক ভগিনীভনয় ॥
 আইল আমার দেখিবারে ।
 সে ফুল গাঁথিয়া দিল যোরে ॥
 শিশু নাহি জানয়ে গাঁথনি ।
 অপরাধ খেম ঠাকুরানি ॥

• বিজ্ঞা তাহার কথা বিশ্বাস না করিয়া স্তম্ভের পরিত্যক্ত জানিয়া আসিতে বলিলে, দ্বিতীয় দিন মালিনী স্তম্ভের সাংকেতিক পত্র সহ মালা লইয়া বিজ্ঞাকে দিল। এই পত্রে স্তম্ভের আপনাকে রত্নাবতী পুরীর অবীথর গুণসিদ্ধর পুত্র বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং ইহা হইতে জানা যায় যে, মধুসূদনের বিজ্ঞার পিতৃভ্রাতৃ কাঞ্চী। মধুসূদন গোবিন্দদাসের জ্ঞান মালা-মধ্যে স্তম্ভকে দিয়া অজুরী পাঠাইয়াছেন। তাহার স্তম্ভ মালিনীর অগোচরে ফুলের মধ্যে পত্র রাখিয়াছেন। এই পত্র পড়িয়া বিজ্ঞা কামশরে জরজর হইলেন। বিজ্ঞা রাধাকান্তের স্তম্ভের পত্রাদি না পাঠাইয়া দেবীদত্ত মায়াবজ্রলে অদৃষ্ট হইয়া বিজ্ঞাকে দর্শন করিলেন।

উপরোক্ত বর্ণনাগুলির মধ্যে ভারতচন্দ্র হীরা ও বিজ্ঞার মধ্যে যে কথোপকথন রচনা করিয়াছেন তাহাতে কাব্য সরস হইয়া উঠিয়াছে, এই অংশ এত জনপ্রিয় হইয়াছিল যে তাহার দু-একটি অংশ আত্মও প্রবাদে পরিণত হইয়া আছে।

(ক্রমশঃ)

ষষ্ঠী ও সিনি ঠাকুর

শ্রীমাণিকলাল সিংহ এম. এ.

বাংলার সকল গ্রামে, সকল গৃহেই ষষ্ঠীপূজার রীতি আছে। কিন্তু সিনি ঠাকুরের ছড়াছড়ি বিশেষভাবে বাঁকুড়া জেলায়—খাতড়া, ওলদা, পাঁচাল, ছাতনা অঞ্চলে খুব বেশী, অস্ত্র মাঝামাঝি। বাঁকুড়া বীরভূমের প্রান্তসীমায় যে সব আদিবাসী কাঁসাই-বারকেখরের প্রবাহ ধরে ছোটনাগপুরের পাহাড়ে অঞ্চল ছেড়ে নেমে এল, তারাই এই দুটি ঠাকুরের প্রবর্তন করেছে। তাই কাঁসাই-সত্যতার এক বিশেষ অংশ গ্রহণ করেছে এদের পূজা। ঠাকুর দুটি fertility বা উর্বরতার প্রতীক। আদিবাসীরা fertility চাইত দুটো জিনিষ থেকে—মাটি ও মেয়ে।

জমির উর্বরতার জন্ত চাইত জল আর বংশবৃদ্ধির জন্ত চাইত ছেলেমেয়ে। অগতের অস্ত্রাস্ত্র আদিবাসীদের মধ্যেও এই জাতীয় পূজার প্রচলন রয়েছে। মেক্সিকোর Zunitribes-দের মধ্যে এর রীতি আছে। ওদের মধ্যে—“Rain, however, is only one aspect of fertility for which prayers are constantly made in Zuni. Increase in the gardens and increase in the tribe are thought of together. They desire to be blessed with happy women.” (Patterns of Culture)

প্রজননের দেবতা ষষ্ঠীপূজা আমাদের দেশে বিভিন্ন সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল চারটি—

- (১) জামাই ষষ্ঠী—জ্যৈষ্ঠ মাস।
- (২) মন্থন বা মাধান ষষ্ঠী—ভাদ্র মাস।
- (৩) জিতা ষষ্ঠী—ভাদ্র বা আশ্বিন।
- (৪) নলডাকা ষষ্ঠী—৩০শে আশ্বিন।

জামাই ষষ্ঠী ও মন্থন ষষ্ঠী প্রজনন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। জিতা ষষ্ঠী বংশ-সংরক্ষণের জন্ত পূজা, আর নলডাকা ষষ্ঠী বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হয় শত্রুবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। ষষ্ঠীপূজায় শিল-নোড়া পূজার রীতি বাংলার সর্বত্র প্রচলিত। হালুদে ভুবানো টুকরো কাপড় বা কানি দিয়ে শিলকে ঢেকে বেওরা হয়। পূজায় শামুক, বাঁশপাতা, কলাই ইত্যাদি বেওয়ার রীতি আছে। এর মধ্যে আদি অষ্টিকজাতীয় পুরুষপুত্রের প্রভাব যে কতখানি তা সহজেই বোঝা যায়।

ষষ্ঠীপূজার মতই অহরহর রাঢ় অঞ্চলে বৃষ্টি এবং শত্রুবৃদ্ধির জন্ত সিনি ঠাকুরের পূজা বেওয়া হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সিনি ঠাকুর রয়েছেন, যেমন নাগাসিনি, তেহুয়াসিনি, পরশাসিনি, ভাঁড়াসিনি, করমাসিনি, রাজবাঁশসিনি, কেপড়াইসিনি, কুর্দাসিনি, কটুডাসিনি

ইত্যাদি। সিনি ঠাকুরগুলি এক একটি অমসৃণ পাথর। বাগদী, মেটে, মাঝি, লোহার, খয়রা ইত্যাদি অল্পমত জাতির লোকেরাই বিশেষ ভাবে এই সিনি দেবতার পূজা করে। গ্রামে বা অঞ্চলে বৃষ্টি না হইলেই সিনি ঠাকুরের থানে জাতাল বা খেঁচুড়ী ভোগ দেওয়া হয়। সিনি ঠাকুরগুলি ক্ষেত্রদেবতা হিসাবেও পরিগণিত হন। তাই ক্ষেতের খান উঠার সময় কাটা ধানের প্রথম আটিটি সিনি ঠাকুরের থানে দেওয়া হয়।

সিনি ঠাকুরের নামের সঙ্গে মাথনা শব্দটির যোগও কোন কোন জায়গায় আছে। সিউল্লি করে খেতে জল দেওয়া হয়, আরক্তের জায়গাটিকে বলা হয় সিনি মাথনা। এই সিনি মাথনার সঙ্গে যে মাথনা সিনির কোন সংযোগ নাই, তা কে বলতে পারে? সব ক্ষেত্রেই দেখা যায়, হয় তো বৃষ্টির জন্ত, নয় জল পাওনোর বা জল সেচনের জন্ত সিনি দেবতার উদ্দেশ্যে পূজা দেওয়া হচ্ছে। মকরসংক্রান্তি ধরে উৎসব Winter Solstice আদিবাসীদের সুপ্রাচীন অনুষ্ঠান। ষষ্ঠী ও সিনি ঠাকুরের পূজার প্রস্তরপূজার এই রীতি প্রস্তর যুগের সভ্যতার নিদর্শন।

রাধিকার বারমাস্তা

শ্রীমদনোরঞ্জন গুপ্ত বি, এস-সি

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পুথিশালার বাংলা পুথির তালিকায় ১২৬৫ সং পুথির নাম 'রাধিকার বারমাস' ; প্রত্নাতার নাম নাই। পুথিখানি খুলিয়া দেখিলাম, ইহা একখানি বড় তুলট কাগজ—আকার ১০ ইঞ্চি × ১৩.৭ ইঞ্চি। পুথিতে তারিখ—১লা জ্যৈষ্ঠ, ১২৩৯ সাল। নিম্নে পুথিখানি মুদ্রিত হইল ; ইহার ভাব ও ছন্দ দেখিয়া মনে হয় যে, ইহা গীত হইতে পু্যরে। এবং ইহাকে 'রাধিকার বারমাস্তা' বলিলে ভাল হয়।

উদ্ধব হইলেন কৃষ্ণসখা। দেহভাগের পূর্বে কৃষ্ণ ইহাকে দ্বারকায় আশ্রয়িত করিয়া দিয়াছিলেন। কৃষ্ণা হইলেন মথুরার রাজা কংসের সৈরিছী। কিন্তু ইহার কৃষ্ণপ্রীতি এতই প্রবল ছিল যে, কৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়া ইহার পদে পদ দিয়া চিবুক ধরিয়া তুলিয়া তাঁহাকে সহজ স্তম্ভরী করিয়া দিয়াছিলেন। বাল্য ও কৈশোর গোতুল ও বৃন্দাবনে কাটাইয়া, কৃষ্ণ পরে মথুরায় গিয়াছিলেন। আর গোতুল বা বৃন্দাবনে ফিরেন নাই। ইহাই লইয়া তাহার সখা ও গোপীগণের বিস্তর খেলোক্তি আমরা বিবিধ প্রাচীন সাহিত্যে দেখিয়াছি।

কৃষ্ণর বারমাস্তার সহিত এই বারমাস্তার সামঞ্জস্য নাই। কালিদাসের এক ক্ষতুবর্ণন আছে। তাহার গন্ধও ইহাতে নাই। ইহা কতকটা বিলাপের মত—'উদ্ধব কহে বারে বার—মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর,' এই কথাটিই 'ধূয়া'।

এই বারমাস্তার আরম্ভ হইয়াছে মাঘ মাস হইতে। ইহার কারণ কি? কৃষ্ণ মাঘ মাসে বৃন্দাবন ছাড়িয়াছিলেন কি? তাই কি সেই মাস হইতে ইহা স্রুত? একদা এদেশে অগ্রহায়ণে [অগ্র + হায়ণ (বৎসর)] বৎসরের প্রথম স্মৃতিত হইত। শুষ্ঠানেরা পৌষের মধ্যভাগ হইতে বৎসর গণনা করেন। সবই শীতকাল।

এই পুথির রচয়িতা কে? পুথির পৃষ্ঠে দুই লাইন ফার্সি লেখা আছে। আচার্য্য বহুনাথ উহা পাঠ করিয়া যাহা বলেন, তাহার অর্থ এই যে, কেহ তাহার মনিবকে পত্রে লিখিতেছিল—“সেরাইকেদা জমিদারীর অন্তর্গত হুনি (বা হুর্নি) টপ্পা(তহশিলে)র গৌরীপুর মহাল গাড়ী (মাটির কেলা) সমেত, যাহার মালিক ডবুয়া মোকামের গৌরীপ্রসাদ খোণ্ড, তাহা অনেক দিন হইতে রাজমোহন খোণ্ডের নামে ইজারা...” এই পর্য্যন্ত লিখিয়া আর লেখা হয় নাই। সেই কাগজেরই অপর পৃষ্ঠায় এই 'রাধিকার বারমাস্তা'। এই ফার্সিভাষার পত্রলেখক ও বাংলাভাষায় 'বারমাস্তা' লেখক এক ব্যক্তি কি-না বলিতে পারি না।

৮ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণচরণ শরণঃ ॥

মাঘে মাঘব কৈল মথুরা গমন।
শুভ হইল দশ দিগু শুল্ল বৃন্দাবন।
তাহে মরমে গৌরী হৈ গেল দুখ।
গমন সময়ে না দেখিলাম চান্দমুখ ॥

উদ্ধব কহ বারে বার।
মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥
কান্দনে হৃদয় হুখ চিতে উঠে বহল।
গোতুলে গোবিন্দ নাহি কে করিবেক হোল ॥

আগর চন্দন চুয়া দিব কার অঙ্গে ।

ফাগুয়া আবির খেলা খেলিব কার সঙ্গে ॥

ফাগু হেরি ফাগু খেলি ফাগু দিলাম তার

গায় ।

চতুর্দিকে ব্রজবধু মধ্যে শ্রামরায় ॥

উদ্ধব কহ বারে বার ।

মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥

চৈত্রে চাতক পক্ষী নিভৃত মন্দিরে ।

পিয় পিয় রব করি ডাকে উচ্চস্বরে ॥

মোর পিয়া মধুপুরে অধিক সন্তাপ ।

হুগুন দগধে হিয়া শুনি কোকিল আলাপ ॥

উদ্ধব কহ বারে বার ।

মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥

বৈশাখে বিদেশে গেলা পিয়া গুণমন্ত ।

অহনিশি কান্দে প্রাণ হুঃখে নাহি অন্ত ॥

উদ্ধব কহ বারে বার ।

মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥

জ্যৈষ্ঠে যমুনা জলে খেলে বনমালি ।

শ্রাম অঙ্গে দিখাম জল অঞ্জলি অঞ্জলি ॥

চতুর্দিকে ব্রজবধু মধ্যে দামোদর ।

কুটিল কমল যেন শোভিত ভ্রমর ॥

উদ্ধব কহ বারে বার ।

মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥

আবাচে অধিক ছুঃখ বাড়িল অন্তরে ।

কালিয়াবরণ দেখি নব জলধরে ॥

নব জলধর দেখি ফাটে মোর হিয়া ।

না জানি কি করি গেল শ্রাম বিনোদিয়া ॥

উদ্ধব কহ বারে বার ।

মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥

শ্রাবণে সপনে উদ্ধব শ্রামের সঙ্গীত ।

নিভৃত মন্দিরে বসি গাহিবে..... ॥

... .. হিয়া পাশে ।

সেই রাজি শুনি আমি বিরল হতাশে ॥

উদ্ধব কহ বারে বার ।

মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥

... .. যমুনা পাশে ।

গতান্নাত নাহি যাব [মথুরার পাড়] ॥

পাখী হয়ে উড়ে যাই পাখা না দেয় বিধি ।

মারিয়া প্রেমের শেল গেল গুণনিধি ॥

উদ্ধব কহ বারে বার ।

মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥

আশ্বিনে অধিকাপূজা প্রেতি ঘরে ঘরে ।

অধিকা উৎসব দিনে আসিবেন বৃন্দাবনে ॥

আজি কালি করি দিবস গোষ্ঠাই হরি

দিবস দিবস করি মাসা ।

মাসা মাসা করি বছর গোষ্ঠাই হরি

হরি হরি কি মোর জীবন আশা ॥

উদ্ধব কহ বারে বার ।

মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥

কার্তিকে করিলা হরি কালীয় দমন ।

কুসুমের ফুল ও বে অঙ্গের ভূষণ ॥

কালিয়া কুসুম তুলি গলে বনমালা ।

না জানি কি করে গেল বিনোদিয়া গলা ॥

উদ্ধব কহ বারে বার ।

মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥

অত্রাণে শুনেছি এক অশ্রু কথ্য ।

মথুরাতে মাধব দণ্ডধারী ছাতা ॥

সেই সঙ্গে এক কথা শুনি ভাগ্য মানি ।

শুনেছি কুবজা নাকি হইছে পাটের রাশি ॥

উদ্ধব কহ বারে বার ।

মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥

পোয়ে লিখিলাম পত্র প্রিয়সখীর হাথে ।

মথুরা যাইব বলি এলাম এই পথে ॥

ভাল হইল এলে উদ্ধব হোলো দরশন ।

কি বোল বলিবেন মোরে শ্রীমধুসূদন ॥

উদ্ধব কহ বারে বার ।

মথুরা হইতে কৃষ্ণ না আসিবেন আর ॥

ইতি সন ১২৩৯ সাল তারিখ ১ পহিলা জ্যৈষ্ঠ ।

মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাম্বুলীমঙ্গল

[পত সংখ্যায় এই 'বাম্বুলীমঙ্গল' কাব্য পুথিকে যথাযথ অঙ্কসরণ করিয়া মুদ্রিত হইয়াছিল । তাহাতে নানা বর্ণাঙ্কিতর অঙ্ক অর্থ গ্রহণের বিশেষ অঙ্কবিধা দেখিয়া যথাসম্ভব সংশোধন করিয়া এইবার হইতে প্রকাশ করা হইতেছে ।—সংকলক]

[১০] দেখিয়া প্রভাত কালে হরগৌরীর মুখ ।
সুবর্ণ কঙ্কণ কেহ দিলেক যৌতুক ॥
স্বপ্নরচরণে হর করিয়া বিদায় ।
বিদায় হইয়া হর নিজ গৃহে যায় ॥
কথ দিন ভগবতী মহেশ সহিত ।
প্রসবিলা ছুই পুত্র দেবতার হিত ॥
কেহ স্তন পান করে কেহ বৈসে কোলে ।
হাসি হাসি চুমু দেই বদনকমলে ॥
হাসে নাচে ধরে বুলে ছাওয়ায় যুগল ।
ধরে ভাত নাহি গৌরী আরম্ভে কন্দল ॥
স্তন লো বিজয়া জয়া বল ত্রিলোচনে ।
কোথাহ না যায় বুঢ়া বস্তা থাকে কোণে ॥
প্রভাতে ভাতে কালে কালে যুগল ছাওয়ায় ।
প্রতিদিন কত আমি করিব উদার ॥
উদার করিলে সখি শোধ নাহি যায় ।
কি করিব কহ সখি বল না উপায় ॥
গৌরীর বচনে বলে দেব অরহর ।
আজিকার মত প্রিয়ে করহ সখল ॥
উপরে গীযুষকণা যেন সুধাকর ।
প্রভাতে আনিঞা আমি শুবিব সকল ॥
মহেশবচনে গৌরী রন্ধনে দিল মন ।
ইন্দিতে রাঙ্কিল অন্ন অমৃত ব্যঞ্জন ॥
ভোজন করিয়া শোএ শয়নের গৃহে ।
রজনী হইল শেষ কবিচন্দ্র কহে ॥১॥

॥ মালসী ॥
বাঘছাল পরি কুণ্ডল কাল ।
পূর্ণ সুধাকর ভরলি ভাল ॥
শূন্যনাথ গলে ত্রিশূল হাথ ।
ভিক্ষে চলে নগনন্দিনীকাত ॥
দিমি দিমি দিমি ডমরু বায় ।
বুধে চাপি হর ময়ুর আয় ॥
পাকিল বিধু মধুর হাসি ।
ললাট মাঝে উয়ে নব শশী ॥
জাগে যেন হইল প্রভাত কাল ।
তুণ্ডলপাত্র লগে চলে খাল ॥
যার ধরে শিব পুরে শূন্যনাথ ।
অর্গে নাচে তার পুরুষ সাত ॥
ভিক্ষা দেই কেহ [১১ক] শিবের খালে ।
যমের দায় নাহি কোন কালে ॥
ভিক্ষা কৈল দেব বলদকেতু ।
যুগল নন্দন সম্ভোষ হেতু ॥
সম্বর চলিলা আপন গৃহে ।
ত্রিশূরচরণে মুকুন্দ কহে ॥১॥
॥ মঙ্গার রাগ ॥
স্তন গো জননি বাজে ডমরু ।
আমার বাপ আইসে তব গুরু ॥
ছুই ভাই গণ ময়ুরনাথ ।
করতালি দেই বাঁজায় হাত ॥

অহুনি দেখায় ঘুচার হুঃখ ।

হাসি হাসি পেখে যারের মুখ ॥

গৌরীপতি নব চন্দ্র ললাটে ।

উপনীত হইল গৃহ নিকটে ॥

পঞ্চস্বরহর ডমরু হাথ ।

তেজিল বলদ বলদনাথ ॥

জীবননাথেরে দেখিয়া গৌরী ।

সঙ্কমে উঠে হাথে জলঝারি ॥

চরণের ধূলি বিনাশিল জলে ।

আসন আনি দিল বসিবারে ॥

আমোদিত কৈল গায়ের বাসে ।

বসিল শঙ্কর গৌরীর পাশে ॥

মুকুন্দ কহে ঝুলি এড়ি কাছে ।

দেখি দেখি বাপু কি আনিঞাছে ॥১৥

॥ গৌরী রাগ ॥

দেখ মাই মোরে কিছু নাই ঘেই ।

একেলা গণেশ সকলি লেই ॥

সর্প শ্রুতিমুখ সঙ্গে সেনানী ।

ঝুলি ঝাড়ি হাসে পিনাকপাশি ॥

তিলের মোদক রস্তার ফল ।

কাড়াকাড়ি ছুই হাসি বিকল ॥

হাথ পাঁচ কায় দেখিতে খর্ব্ব ।

চারি ভুজ লোটে না ছাড়ে দর্প ॥

অহুজে বুকে অপর ভুজে ঝায় ।

বড়মুখ দেব ঘন ডাকে মায় ॥

অচলনন্দিনী গগনকেশ ।

হুঁহে বলি পুজ্ঞ শুন অরেশ ॥

ইন্দুরছন্দুরনাথ গণেশ ।

অহুজ ভাইরে কিছু দেহ শেষ ॥

তগুল দেখি অধাকরমুখী ।

হাসি গালে হাথ চকোর আঁখি ॥

কবিচন্দ্র কহে শুনু হে নাথ ।

যতনে হয়ে আজিকার ভাত ॥

[১১] ॥ পঠমঞ্জরি রাগ ॥

লোকে বলে ভাল ঘোবন উজ্জল

পরম সুন্দরী গৌরী ।

আত্মকর্ম্মফলে সুস্বামী পাগলে

বুঢ়া জনমতিধারী ॥

চল রে নন্দি যাইব নাইব

কি মোর বরকরণে ।

অন্নহীন জনে শাস্তি নাই মনে

কন্দল রজনী দিনে ॥

কেশরী শাদুল ইন্দুর ময়ূর

বলদ আমার গৃহে ।

আর ফণিবর সন্তে স্বতন্ত্রর-

কার বশ কেহ নহে ॥

মুগল নন্দন এক ষড়ানন

আওর কুঞ্জরমুখ ।

পঞ্চমুখ প্রভু মীনকেতুরিপু

সকল বিরূপ হুঃখ ॥

নন্দী কহে বাণী শুন নারায়ণি

না যাইহ পিতৃঘরে ।

অচলনন্দিনী হরের ঘরগী

কে তোমা চিনিতে পারে ॥

জনপদ যত হইব এমত

আসা তেজ পিতৃবাসে ।

অজিলে সংসার যত চরাচর

অনিঞা চণ্ডিকা হাসে ॥

বে সহে সে বড় অভিযোগ ছাড়

ভক্তজনে কর দয়া ।

প্রীযুত মুকুন্দ রচিলা প্রবন্ধ

• সকলি তোমার মায়া ॥১৥

॥ মল্লার রাগ ॥

নারদ আসিয়া খণ্ডায় হুঃখ ।

পুরিজন মেলি হাত্ত কৌতুক ॥

নাটকী ভেজান আইল য়নি ।

উপনীত যথা হর ভবানী ॥

হাসিতে হাসিতে বলে নারদ ।
 বাপে থিয়ে আজি কেন বিরোধ ॥
 লজ্জায় অধিক গেলেন ঘর ।
 নারদ ষড়্ভুজ নাটকী শর ॥
 মহেশ্বরে বলে নারদ মুনি ।
 ছুই জনে আজি কন্দল কেনি ॥
 নিবেদন করি শুন হে বোল ।
 অন্নের তরেতে কেন কন্দল ॥
 তুমি নাহি জ্ঞান অচলয়ি ।
 ও হি থাকিতে বা অন্নের কি ॥
 নানা রত্ন আছে শুঁহার অঙ্গে ।
 পাশা খেলাইয়া জিনিহ রঙ্গে ॥
 একত্র বা মাত্র জিনিঞা লবে ।
 কত কাল অন্ন বসিয়া থাকে ॥
 [১২ক] মুনিবর কহে তবু বিশেষ ।

বড় প্রতিআশে যায় মহেশ ॥
 ছুই জনে শুন হান্ত কন্দল ।
 মুকুন্দ কহে বাস্তবিকমূল ॥১১

॥ গৌরী রাগ ॥

নিবেদন করি শুন লো গৌরি ।
 রোষ না করিলে বলিতে পারি ॥
 অনেক দিবস মনের আশা ।
 আজি ছুই জনে খেলিব পাশা ॥
 প্রভুর বচনে বলে জিপুরা ।
 নিশ্চয় বিজয়া ধরিল পারা ॥
 চরণে পড়ছ' চল ভাঙ্গড়া ।
 কাটা যায় কত লোন ছোবড়া ॥
 আল আল জয়া হেদে লো শুন ।
 ঘরে ভাত নাহি রন্ধেতে মন ॥
 ছি ছি লাজ নাহি তোমার মুখে ।
 পাশা খেলাইবে কেমন স্নেহে ॥
 দিনের সন্ধ্যা মিলাইতে নার ।
 পাশা খেলাবারে ভাল সে পার ॥

নাহি হও বাম শুন লো প্রিয়ে ।
 অবশ্য পাশা খেলাব ছুই ॥
 হাসিতে হাসিতে বলিলা গৌরী ।
 যদি হার তবে তোমার কি করি ॥
 হারিবে প্রভু না ছাড় মায়া ।
 টটিকারি দিব জয়া বিজয়া ॥
 গিরিজাবচনে গিরিশ বলে ।
 হারি জিনি আছে খেলার কালে ॥
 দেখিব চাতুরি আমার ঠাঞি ।
 আমি গ খেলা জানি গ নাঞি ॥
 পণ কর ছুই পাতিব খেলা ।
 মনে মনে হাসি সর্বমঙ্গলা ॥
 জিপুরাচরণে মুকুন্দ ভাবে ।
 জয়া বিজয়া রহে দাহুড়ি আশে ॥১২

॥ কামোদ রাগ ॥

বলে ত্রিলোচনী যদি হারি আমি
 গানের ভূষণ দি ।
 যতপি খেলিবে শুন সদাশিবে
 হারিলে তোমার কি ॥
 কহে ত্রিলোচন যদি তুমি জিন
 আজি ছুই করি কেলি ।
 শুন মোর পণ ডমক বাজন
 সিলা শূল কাঁথা ঝুলি ॥
 মহেশ শ[১২]করী ছুই খেলে সারি
 রচিবা হীরার পাটী ।
 নন্দী মহাকাল দশদিগপাল
 সাক্ষী আর যত চেটী ॥
 দশ দশ দশ ডাকে ভবকেশ
 বারচর গোঞ্জে খেলে ।
 মানসের স্নেহে পাটী ঘব বুকে
 পাঁচনি চোবক পেলে ॥
 হাথে করি সারি বলে জিপুরারি
 আজি এক ছুই কাট ।

ছুই চারি করি ডাকে শিবনারী

॥ সুই রাগ ॥

ছুয়া চারি হৈল নাট ॥

সাতা ছুয়া চারি ডাকে ত্রিপুরারি

ত্রিপুরা পেলিল বিহু ।

পড়িল ছুতিয়া শুখাইল ছিয়া

হারিল বলদকেতু ॥

ঐশি ঠার দিয়া সখারে পাঁচিয়া

• শিখীর ঈশ্বর মাতা ।

বাজন ডমরু সিঙ্গা আর ত্রিশূল

কাড়ি নিল কুলি কীথা ॥

বুদ্ধি হইল লোপ শিবে বাঢ়ে কোপ

বলে পাশ আর চাল ।

ভিক্ষার কারণ চলিব সকাল

জিনি লহ বাধছাল ॥

পাশা কর দুর তনু হে ঠাকুর

সভাকার আছে কাজ ।

ভূমি ভূতনাথ তনু মোর বাত

হারিলে পাইবে লাজ ॥

চাল পাতি ভূবি পাটি ঘষে দেবী

ক্রমে মশ ছুই চারি ।

সাতা বিহুবিহু পেলো ভগবতি

পাঁচনি করিলা সারি ॥

বারে বারে পেলো বামরু ছুতিয়া

হারিলা লাকন মৌলি ।

আছাড়িয়া পাটী ছাড়ে মহেশ্বর

মুচকি হাসিল গৌরী ॥

আশ্রুকু দিবস আছে গৃহদোষ

পশ্চাত্ত নিবসে কাল ।

হারিয়া শঙ্কর দেব দিগধর

ছাড়িল বাঘের ছাল ॥

পাশা ছাড়ি যান করিল ভোজন

ভিন্ন কভু হুই নহে ।

ক্রিয়ুত মুকুন্দ রচিলা প্রবন্ধ

চণ্ডিকার দোষ সহে ॥৩৥

অমৃত সমান ভাষ শিবচূর্ণা পবিহাস

কুতূহলে তনু সর্বজন ।

[১৩ক] শঙ্কর হারিয়া পাশা ছাড়িল সকল ভূষা

দিগধর হইল ততক্ষণ ॥

দিগধর প্রাণপতি আনন্দিত ভগবতী

জিজ্ঞাসিতে করে অনুবন্ধ ।

আনয়ে বিবিধ কলা চকুর বিজয়ামালা

বচনে পাতিয়া যায় ছন্দ ॥

কেবা ভুমি কহ মোরে কিবা কাজে হেথাকারে

পরিচয় দেহ দিগধর ।

বলে শিব আমি শূলী তনু গো তোমারে বলি

পরিচয় করিছ গোচর ॥

বলে দেবী শুলোচনী চিকিৎসক নহি আমি

চলি বাহ ভিষক আগার ।

আছে যদি শূলব্যামি ঔষধ করহ বিধি

যাহাতে পাইবে প্রতিকার ॥

তনু গো অবলা বালা মধুতে মধুতা তোলা

হাগু আমি ভুমি নাহি জান ।

অধিকা করিল আত্মা হাগু পদে বৃক্ষ সংজ্ঞা

গৃহমাঝে বুঢ়া গাছ কেন ॥

তনু গো প্রমুখ কান্তা মনে না করিহ চিন্তা

নীলকণ্ঠ আমার খেয়াতি ।

চণ্ডী প্রকাশিল তুণ্ড শিখিপদে নীলকণ্ঠ

কেকাবাণী ডাক স্তম্ভরতী ॥

হিমালয় স্তম্ভর তোমারে কি বলিব আর

পশুপতি কহিল নিদান ।

শুনিঞা প্রভুর বোল চণ্ডী হাসি উত্তরোল

এত ভুমি পাইলে সন্ধান ॥

যদি ভুমি বুঝেখর তুণাহারী বনচর

শৃঙ্গ গুচ্ছ চারি চরণ ।

তবে কেন হেন গতি কোথা আছে নিজাকৃতি

কহ মোরে ইহার কারণ ॥ ১০ ॥

হারিয়া চণ্ডীর ঠাক্রি পূর্বপক্ষ আর নাঞি
 লজ্জায় মলিন তোলানাথ ।
 বলিয়া চণ্ডীর পাশে জয়া বিজয়া হাঙ্গে
 চাকু কাঁপি বদনেতে হাথ ॥
 অনঙ্গ ভরল সঙ্গ সধরিতে নায়ে অঙ্গ
 ভঙ্গ দিয়া যায় পঞ্চজনে ।
 অধিকা আঁখির ঠারে কহিল সখীর তরে
 প্রভুরে রাখিছ দুইজনে ॥
 দেবীর আদেশে সখী শিবেরে ধরিয়া[১৩]রাখি
 শিব তবে হুজিল উপায় ।
 ধরিয়া দুর্গার হাথে সংযোগ করিয়া মাথে
 বলে ব্রীড়া সনে বরদায় ॥
 পরিহার করোঁ তোরে বাঘছাল দিবে মোরে
 স্তন বড়াননের জননি ।
 চণ্ডিকা বলেন প্রভু এ কথা না কহ কহু
 ছাড়িয়া না দিব ছালখানি ॥
 বুঝত ডমরু খাল কাঁথা কুলি অস্থিমাল
 শেষ শিলা শূল আভরণ ।
 এ সব অবধি দিল অবিচারে লৈয়া চল
 বাঘছাল আমার জীবন ॥
 স্তম্ভাকুর বড়ানন আইল নিজ নিকেতন
 জননীর কোলে স্তন পিয়ে ।
 দিগম্বর দেখি পিতা কহিতে লাগিল কথা
 জিজ্ঞাসা পড়িল মায়ে পোঞ ॥
 কোলে করি তারকারি পরিহাস হরগৌরী
 এইরূপে পাল ভক্তজনে ।
 অধিকাচরণপদ্ম অস্তর শরণ সঙ্গ
 শ্রীযুত মুকুন্দ সুরচনে ॥০॥

॥ একাবলি ছন্দ ॥

একাসনে হরগৌরী ।
 দিগম্বর ত্রিপুরারি ॥
 স্তন পিয়ে হেন কালে ।
 কুমার মায়ের কোলে ॥

লাজট দেখিয়া হয়ে ।
 প্রসন্ন করে কুতুহলে ॥
 স্তন হিমালয়সুতা ।
 কহিবে না মোরে মিথ্যা ॥
 বাপার মস্তকে আজি ।
 কি দেখি ধবল ক্রটি ॥
 না ধর আঁচল তেজ ।
 পুত্র বাপে জিজ্ঞাসিয়া বুঝ ॥
 চরণে পড়ছ মাঞি ।
 কখিল চাঁদ গোসাঞি ॥
 কি আন লজাটের মাঝে ।
 কখিলে থাকিব কাছে ॥
 নাছে গিয়া তুমি খেল ।
 গত করি মাই বল ॥
 আঁচল না ধর পুত্র ।
 কখিল তৃতীয় নেত্র ॥
 কি আর কণ্ঠপ্রদেশে ।
 জলধ প্রতিমা ভাসে ॥
 বুদ্ধি নাহি মোর পোয়ে ।
 মাই পড়েঁ তোরে দুই পোয়ে ॥
 কোলে থাকি পুত্র উঠ ।
 খ্যাতি বিব কালকূট ॥
 ধরিল অধরপুটে ।
 কি নায়ে নাতির হেটে ॥
 স্বরূপ করিয়া বল ।
 চণ্ডী হাসে ধলধল ॥
 কাঁথে করি মহাসেমে ।
 চণ্ডী গেলা নিকেতনে ॥
 [১৪ক] শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ।
 রক্ষ দেবী নিজজনে ॥০॥

॥ পরায় ॥

প্রভুরে বিদায় করি স্তম্ভীর সংহতি ।
 পর্যটন করিল সকল বহুমতী ॥

নিদেশ প্রমিঞা সিংহাসনে সুরলোকে ।
 ত্রিপুরা অমরাবতী বসিলা কোতুকে ॥
 উপকথা কহে কেহ শুনে ভগবতী ।
 শরৎকালে পুষ্প দুর্গা করিয়া ভকতি ॥
 মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করে জীপুত্রবে ।
 মহেশ্বর সেবা কেহ করে মধুমাংসে ॥
 চণ্ডীর অর্চনা করে পতিপুত্রবতী ।
 কেহ লক্ষ্মী পূজে কেহ পূজে সরস্বতী ॥
 ব্রহ্মার অর্চনা কেহ করে যজ্ঞ দান ।
 অনন্ত মানসে কেহ পূজে ভগবান ॥
 ভুজগজমনী জ্যৈষ্ঠ মাসে অবতরে ।
 যত দেবতার দাস দাসী ক্ষিতিলে ॥
 সেবক নাহিক ত্তনি হাসিল চণ্ডিকা ।
 পুণিয়ার চক্রে যেন প্রকাশে চন্দ্রিকা ॥
 অযোনিমন্তবা কহে বিশাললোচনী ।
 হুজিয়া সেবক দাসী লব পুষ্পপাণি ॥
 শনি কুজ বারে মোরে বিবিধ প্রকারে ।
 পুজিব সেবক লোক করিয়া প্রচারে ॥
 কিন্নরা কিন্নরী গায় নাচে বিজ্ঞাধর ।
 দেবগণ সঙ্গে যথা দেব পুরন্দর ॥
 মন্দ মন্দ চলে দেবী আপনার কাজে ।
 সখী সঙ্গে উপনীত দেবতা সমাজে ॥
 পদ্মযোনি সুরপতি হর বনমালী ।
 দাগাইল দেবগণ দেখিয়া রক্ষিণী ॥
 অর্চনা পাইয়া দেবী বৈসে নিজাসনে ।
 হেন কালে সুখাসীন বলে মুনিগণে ॥
 জিজ্ঞাসে ক্রৌঞ্চিক মুনি মুকুন্দনন্দনে ।
 মন্তরকথা কহ কি হৈল অষ্টমে ॥
 মুকুন্দনন্দন বলে ক্রৌঞ্চিক বচনে ।
 আজন্ম প্রভৃতি আমি আছি তপোবনে ॥
 দেবকার্য যত কথা কহিতে না পারি ।
 আমার নিদেশে তুমি চল বিজ্ঞাপরি ॥
 পিতৃক বিবাদ আর সুরস্তুি সমুখে ।
 পক্ষ চারিজন তথা নিবসয়ে হুখে ॥

উলুক কুরণ কাক বক তপোবন ।
 সানন্দে নিবসে তথা পক্ষ চারিজন ॥
 আমার নিদেশে তুমি নিবেদিছ তাঁরে ।
 মন্তরকথা জানে হ্রোণ মূনিবরে ॥
 [১৪] কথিব বিচিহ্ন কথা পয়ার রচিয়া ।
 মূনির নন্দন শুন সাবধান হৈয়া ॥
 বিপ্রকুলে জন্ম পিতামহ দেবরাজ ।
 পিতা বিকর্ষন মিশ্র বিদিত সমাজ ॥
 শ্রীযুত মুকুন্দ হারাণবতীর নন্দন ।
 পাঁচালি প্রবন্ধে করে ত্রিপুরাস্বরণ ॥০॥

মুনি চলিল মূনির নিদেশনে ।
 যথা বিদ্যা নামে নগ উলুককুলে কাক
 বক পক্ষ রথ চারি জনে ॥
 এড়াইয়া নগ নদী বিষম কানন ক্ষিতি
 তপোবনে করিয়া বিদ্যার ।
 গজ সিংহ শাহুল মহিষ ভলুক গৌল
 শশ যুগ হুখে তৃণ খায় ॥
 বিহগনন্দন পেধি বলে মুনি ক্রৌঞ্চিক
 আইলাঙ তোমার সন্নিধানে ।
 কহিবে অষ্টম মন্তর বিবরিয়া ধগতম
 মুকুন্দনন্দন নিদেশনে ॥
 বলে পক্ষ শুন মুনি আমরা তিথ্যক্যোনি
 তোমায়ে উচিত গুরু নহি ।
 মুকুন্দের তনয় কহিলেন মুনয়
 পক্ষের বচনে সেই ঠাঞি ॥
 মুনয় মূনির পদ কমল পুজিয়া ব্রত
 কথা শুনিবারে পক্ষের ঠাঞি ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ তনে চণ্ডী স্তবস্রব জনে
 রমানাথে রক্ষিহ সদাই ॥০॥
 ॥ বারাড়ি ॥

শুন মুনি মহাশয় সূর্যের তনয়
 সাবর্ণি জঠরে যার জন্ম ।

স্বারোচিষাঙ্কর বর পূর্ব মমন্তর
চৈত্র বংশ নৃপমণি ।

সকল ধরণীতলে নৃপ হইল পুণ্যবলে
স্বরূপ স্বরূপ নামখানি ॥

অকাতর হয়ে দানে রূপে কামদেব জিনে
রণভূমি বিপরীত সম ।

ঔরস নন্দন ঘরে যেন প্রজাপতি পালে
কি কহিব তাহার মহত্ত্ব ॥

অশেষ বিদিত কলা প্রজা জুললিত বোলা
পুরিতে হইল পরিপন্থী ।

আছিল সেবক যত হরিল পশ্চিক রথ
গৃহদোষে হয়বর দস্তী ॥

স্বরূপ অনেক সৈন্ত লোকে তারে ঘোষে ধস্ত
বলহীন পুরিজন বৈরী ।

তা সনে করিয়া মুক্ত হা[১৫ক]রিল আপন রাজ্য
নিজপুরে হত অধিকারী ॥

বিপক্ষে বেটিল পুরি রাজা মনে মনে করি
হয়াক্ষত যুগ্মার ছলে ।

তোজিলা যতেক ধন নিজদারানন্দন
একেলা চলিলা বনস্থলে ॥

যন উলটিয়া চায়ে বিপক্ষের প্রতি ভয়ে
রাজ্য হইয়া জীবনে কাতর ।

চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ গৌরীরাগ ॥

মহিপাল স্বরূপ শঙ্করদাস ।

নগর ত্যোজিয়া প্রাণের ভয়
করিল কাননবাস ॥

বনের ভিতর মেধসের ঘর
বথা বৈসে শিষ্য মুনি ।

সফল দিবস দেখিয়া তাপস
ধায় বেদধ্বনি শুনি ॥

দেখিয়া অতিথি করিয়া ভকতি
মুনি মহাশয় মেধা ।

স্বাপদ মিলনে হরিণ দেখিয়া
নৃপ কণোদিনি তথা ॥

মুনির আশ্রমে ঠাঞি ঠাঞি ভ্রমে
মমত বিকল মনা ।

শ্রীযুত মুকুন্দ রচিত প্রবন্ধ
নৃপতি চিন্তয়ে নানা ॥০॥

॥ পয়ার ॥

পূর্বপুরুষ মোর পালি নিজ পুরি ।

রক্ষিতে নারিল আমি কেন নাহি মরি ॥

আমার কিঙ্কর যত ছুট মহাশয় ।

পালে বা না পালে রাজ্য ধর্ম প্রতি ভয় ॥

ময়গল হস্তী মোর মহা বলবান ।

না জানি কি খায় কিবা শুখায় পরাণ ॥

অচুপত জন মোর খাইত নানা সুখে ।

বিপক্ষের সেবে মনে পাইয়া মনঃস্থখে ॥

অনেক যতনে ধন করিল সঞ্চয় ।

ছুট রিপু জনে তাহা করিলেক ব্যয় ॥

সরসা সঞ্চিত যধু যেন থাকে বনে ।

প্রতিপালে আগুনি বিনাশে ছুর্জনে ॥

এই কথা ভাবি মনে পাঁচ সাত করে ।

মেধস মুনির কাছে বসি তরুতলে ॥

আসিয়া মিলিল হেন কালে এক নর ।

হুই জনে দরশন জীবন সফল ॥

প্রফুল্ল বদনে কহে নৃপতিপ্রধান ।

কে তুমি বলহ মোরে আপনার নাম ॥

শোকাকুল মন দেখি বিরস বদন ।

কি হেতু কানন মাঝে করিলা গমন ॥

প্রণয় বচন নৃপতির মুখে শুনি ।

অবনত পশিক কখিল ত[১৫]ব্রবান্তি ॥

সমাধি আমার নাম জন্ম বৈশুকুলে ।

আমি ধনবান সুখে আছিলাম ঘরে ॥

না লংঘে বচন গুণ করিত সন্তোষ ।

হরিলেক সেই ধন করি মহারোষ ॥

প্রহমোবে হইল মোর যুবতী কুমতি ।
 ধনলোভে খেদিলেক নাঞি বলে পতি ॥
 বজ্রজন সহিত কন্দল প্রতিনিধি ।
 ধনপুত্রহীন আমি প্রবেশিলু বনে ॥
 পুত্র মিত্র বজ্রজন যুবতীর তরে ।
 ভাল মন্দ তার ভাবি মন মোর সুরে ॥
 তেজুল সকল স্থখ শয়নমন্দির ।
 শোকহেতু হুজিল বিধি আমার শরীর ॥
 কানন ভিতরে বসি করি অহুতাপ ।
 না জানি কেমনে মোরে হৈল ব্রহ্মপাণ ॥
 সুপথে কুপথে কিবা পুত্রবধু ঘরে ।
 না জানি মঙ্গলে কিবা আছে অমঙ্গলে ॥
 সুরথ নৃপতি বলে বৈশ্ণব বচনে ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥

বিষবহি দিয়া মোরে প্রমদা যে জন হরে
 যেই জন অজ্ঞ ধরি বধে ।
 আততায়ী করি বধ তাতে নাহি পাতক
 এই কথা কথিল ভারতে ॥
 তনু আমি তোমাতে বুঝাই ।
 তনু বৈশ্ণব নন্দন যে হরে পরের ধন
 ছয় বেদে করে আততাই ॥
 অবধ্য জনেরে বধ করিলে পাতক যত
 বহ্যের রক্ষণে সেই ফল ।
 তুমি তারে কর দয়া না বুঝি তোমার মায়ী
 মন মোর করয়ে চঞ্চল ॥
 ইষ্টবান্ধব পুত্র কলত্র যতেক মিত্র
 ধন লৈয়া খেদিল আমারে ।
 তারে অহুরাগ বাঢ়ে যেন বহি ঘর পোড়ে
 তেন মত না দেখি বিচারে ॥
 তনু নৃপ মহাশয় তুমি যে কথিলে হয়
 সেইরূপ আমার হৃদয় ।
 হুরাচার মোর মন নাঞি জানি কি কারণ
 নির্ভরতা তবু নাহি হয় ॥

ধন প্রাণ যেই লয় কহু সে বান্ধব নয়
 জানি আমি গুরুর প্রসাদে ।
 কি বলিব তনু তাই চল যাই মূনির ঠাঞি
 বিরচিল মুকুন্দ পণ্ডিতে ॥০॥

॥ কৌরাগ ॥

নৃপ চলিল মূনির সম্মিথানে ।
 বৈশ্ণব সঙ্কতি সমাধি সংহতি
 করিয়া প্রবেশিলা বনে ॥
 [১৬ক] শশ যুগ কুঞ্জর ভজুক বানর
 শার্দূল সিংহ বিশালে ।
 নবসে ষাণ্ড যত কারে কেহ নহে ভীত
 কেবল মূনির তপবলে ॥
 সকল পাতক হরে আপন তেজস্বী হুরে
 যতদূর যায় বেদধ্বনি ।
 জানিল মূনির ঘর কাননের ভিতর
 হরষিত বৈষ্ণব নৃপমণি ॥
 মুনিপদে উপনীত হই জনে অবনত
 বসিল মূনির আদেশে ।
 নৃপ বৈষ্ণব নিঃশব্দ কোন কথা প্রসঙ্গ
 করিয়া রহিলা পরিতোষে ॥
 হুঃখে পীড়িত মন চিরদিন হুই জন
 সমাধি সুরথ নরপতি ।
 চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ বিজে
 বিরচয়ে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥

কলত্র বান্ধব পুত্র পুরিজন ইষ্ট মিত্র
 কুটুম্ব সকল হুঃখদাতা ।
 ক্রি কহিব বিশেষ ছাড়িল আপন দেশ
 তখি কেন আমার মমতা ॥
 জ্ঞান থাকিতে জানি আপুনি পণ্ডিত মানি
 সুখের সদৃশ হৃদয় ।
 এই বৈষ্ণবনন্দন ইহার যতেক ধন
 হরিলেক প্রমদাতনয় ॥

স্তন মূনি মহাশয় নিবেদি তোমার পায়
 কেন বশ নহে মন মেরা ।
 বসিয়া মূনির পাশে নৃপতি মধুর ভাষে
 হিমকর নিকটে চকোরা ।
 খেদিয়া হরিল ধন আশ্রয়ে পরিজন
 অশ্রুতে করিল বনবাস ।
 জ্ঞান ভূমি চারি বেদ এইরূপ মোর খেদ
 তব পদে করিল প্রকাশ ।
 দেখিল বিশেষ দোষ হৃদয়ে নাহিক তোমার
 নয়নের অল খসে মোহে ।
 ছুই নহি অজ্ঞান স্তন মূনি তপোধন
 এত হুঃখ কেনি প্রাণে সহে ॥
 ময়গল যত রথ তুরগ পশ্চিক যত
 গোধন ছিল নাহি লেখা ।
 সে সব হরিল পরে বিধি বিড়ছিল মোরে
 বড় পুণ্যে বৈষ্ণব সনে দেখা ।
 ছুই প্রাণী এই জ্ঞানী নয়ান থাকিতে নাহি
 মূৰ্খতা দেখিতে সকল ।
 চণ্ডীপদ সরসিজে ত্রিযুক্ত মুকুন্দ বিজে
 বিরচয়ে সরস [১৬] মঙ্গল ॥০॥

। পয়ার ॥

নৃপতির বচনে বলে মূনির প্রধান ।
 বিষয় গোচরে যত অশ্রু জ্ঞানান ।
 পৃথক বিষয় যত প্রাণীর নিবন্ধ ।
 কেহ রাজ্যে দেখে কেহ দিবসেতে অন্ধ ॥
 রাজি দিবা নাহি দেখে ক্ষিত্তিতলে বৈসে ।
 একরূপ দেখে কেহ রজনী দিবসে ॥
 কেবল মহাশয় জ্ঞানী হেন বোল নহে ।
 পশু পক্ষ শূণ্য আদি জীবন যে বহে ॥
 তুরগ বারিহ মূপ পক্ষ সফল ।
 নরতুল্য নহে জ্ঞানী যত জীবনর ॥
 দেখে রে নৃপতিসুত পক্ষ থাকে বনে ।
 তুণে ঘর বাড়িয়া আপন পর জানে ॥

প্রসবিনা ডিম নিরবধি দেই তা ।
 অনেক বতনে তবে ছুই করে ছা ॥
 যদি জ্ঞান নাহি তবে পাশে কেন চাকে ।
 কেহ জানি খায়ে পুত্রে শীত পাছে লাগে ॥
 কুবানলে আপনার তত্ত্ব প্রাণ দহে ।
 শিশুমুখে কণা দেই পক্ষগণ মোহে ॥
 স্তনহ শূন্য অহে বৈষ্ণব পো ।
 যত দেখে ছাওয়ায় সভার মায়া মোহ ॥
 নিজ পর জ্ঞান হয় মহামোহরূপে ।
 জুখ হুঃখ যত তত্ত্ব পড়িল বরূপে ॥
 কেহ জুখ ভুঞ্জে কেহ করে অমুতাপ ।
 যত সব দেখে মহামায়ার প্রভাব ॥
 যোগনিদ্রাশেষে বিষ্ণু মানসে বিশ্বয় ।
 যাহার মায়ার সৃষ্টি কথিল নিশ্চয় ॥
 কারে ভাল মন্দ করে করে কারে দয়া ।
 জ্ঞানী জনেরে মোহ দেই মহামায়া ॥
 মহামায়া রূপে বিরাজিল চরাচর ।
 যাহার রূপায় মুক্তি পায় দেব নর ॥
 অগতপালন হেতু নির্বাণ কারণ ।
 সকল পরমবিজ্ঞা সেই ত্রিভুবন ॥
 স্তনিয়া মূনির বাক্য বলে নরপতি ।
 ত্রিযুক্ত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরা ভারতী ॥০॥
 ॥ ইতি দ্বিতীয় পালা সমাপ্ত ॥

। রাগ গৌরী ॥

ভগবন কথিলে সে কে মহামায়া ।
 হাম নাহি জানো জনম তাহার
 কো হেতু উৎপন্ন কায় ॥
 বামন তপস্বী যো তুই কহলি
 সেই সব সত্য হোই ।
 চকুরবেদ তব মুখ ফুকরই
 তুই বিধি আন নাহি কোই ॥
 বিরূপ হস্ত চরণ মুখমণ্ডল
 [১৭ক] লোচন তারক ক্রহি ।

কে তার জনক জননী কো হয়
কোন কৰ্ম করে সোই ।
দেবীর তত্ত্ব শুনি হামু সকল
তো ঠাই গীষু ভাসি ।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনই বামন
ভবপন্নীপদ অভিলারী ॥ ০ ॥

আজ্ঞা প্রকাশে দেবী দেবতার কাজে ।
উৎপন্ন বলিয়া তাঁরে জগজনে পুঞ্জে ॥
যোগনিজ্ঞা শেষে বিষ্ণু প্রলয়ের জলে ।
জন্মিল কৈটভ মধু তাঁর কৰ্ম্মলে ॥
নৃজিল পৃথিবী যেই শত্ৰুবতী সতী ।
আমা হৈতে শুভ নৃপ তাঁহার উৎপত্তি ॥
জন্মিল কৈটভ মধু দেখিল চুর্ম্মতি ।
হরিনাভিপদ্মে আসে লুকাইল বিধি ॥
বাইল অস্তুর ছুই আপনার বলে ।
না দেখি পুরুষবর লুকাইল জলে ॥
দেখিয়া অস্তুর উগ্র হরির শয়ন ।
যোগনিজ্ঞায় স্তুতি করে সরসিআসন ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুকুমতি ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥ ০ ॥

॥ পাহিড়া রাগ ॥

হরির নয়ন তেজ ডর লাগে বুকে ।
তোমার মহিমা কি বলিষ চারি মুখে ॥
তুমি স্বাহা তুমি স্বাধা সকল বধট ।
চারিদশলোকে তুমি করিলে কপট ॥
খড়্গা ত্রিশূল গদা শঙ্খ চক্রিণী ।
বিশাললোচনী জয়া নৃমুণ্ডমালিনী ॥
অর্দ্ধমাত্রা ত্রিমাাত্রা ত্রিগুণ বিভাবিনী ।
নৃজন পালন ক্ষম তৃতীয় রূপিণী ॥
তুমি ক্ষিত্তি নৃজ পাল তুমি কর অস্ত ।
বধিলে অমরে যত অস্তুর ছুরস্ত ॥
অলক্ষ্মী কমলা তুমি ত্রিজগদীশ্বরী ।
মহামোহ মহামায়া জননী শঙ্করী ॥

কোদণ্ডধারিণী ক্ষেমা সতী তপস্বিনী ।
তুমি তুষ্টি তুমি গুষ্টি মো[১৭]হিনী শঙ্খিনী ।
কাল তপস্বিনী মহাজননী খেচরী ।
তুমি মন্ত্রময়ী লজ্জা পরম স্তম্ভরী ॥
স্বাহা মেধা মহাবিত্তা শাস্তি স্বরূপিণী ।
অচিন্ত্যরূপিণী জয়া হরের গৃহিণী ॥
স্বজ্ঞে পালে সংহার করয়ে চক্রপাণি ।
তাঁরে নিজাবশ তুমি করিলে আপনি ॥
তোমার প্রসাদে আমি বিধি হরি হর ।
তুমি দেবী নরসুরাসুরে অগোচর ॥
আপনা আপনি কাল ত্রিলোক্য মণ্ডলে ।
কোটা মুখে তব স্তুতি কে করিতে পারে ॥
মরুত কৈটভ মধু মহা মোহজালে ।
হরিরে প্রবেশ যেন জিনে রণস্থলে ॥
সমুখে কৈটভ দেখে মহাসুর মধু ।
বিষ্ণুর শরীর তেজ দেবতার রিপু ॥
বধিলে কৈটভ মধু ভয় হয় দূর ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥ ০ ॥

প্রলয়ের জলে হরি ভুজগ খট্টায় ।
অনেক দিবস প্রভু স্থখে নিজা বায় ॥
নয়নে ছাড়িল নিম্ন উঠে ভগবান ।
দেখিল অস্তুর ছুই অচল সমান ॥
বাইল রে ছুই মধু কৈটভ মুখে ।
জগদীশ সহিত কেবল ভুজ্ঞে ভুজ্ঞে ॥
ব্রহ্মা পলায় ডরে নাহি ঘরে বাস ।
হংস উড়িল পাখে ঠেকিল আকাশ ॥
•আশ্রাস লাগিল দেহে গলে বর্ষজল ।
নিরস্তর যুঝে পাঁচ সহস্র বৎসর ॥
ধন উঠে পড়ে কেহ নহে হীনবল ।
ক্রোধে নয়ন করে অরুণ মণ্ডল ॥
দশনে চাপিয়া ওষ্ঠ পৌঁকে দেই পাক ।
মুঠকিতে ভাজে বুক ছাড়ে বীরডাক ॥

অস্তুর মোহিল দেবী কোপে মহাবল ।
 দাণ্ডাইয়া রহে যেন ছুই মহীধর ॥
 স্তন রে পুরুষ মাগ মোর ঠাঞি বর ।
 রণে তোরে পরিতোষ পাইল [১৮ক] নির্ভর ॥
 অস্তুরের বচনে সন্তোষ ভগবান ।
 বর মাগি তুমি যদি নাঞি কর আন ॥
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুক মতি ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥ ৩ ॥
 কি কহিব মহাস্তুর তোর বড় বুক ।
 যুঝিয়া অনেক দিন পাইলাঙ স্তম্ব ॥
 তোমরা আমার যদি ছুই ছুই ভাই ।
 বর মাগি ছুই জনে বধিব এখাই ॥
 এ বোল শুনিয়াস্তুর চারি দিগে চায় ।
 আকাশ ভাদিয়া যেন পড়িল মাথায় ॥
 মহামায়া বঞ্চিল অস্তুর ছুই বল ।
 কাটির আমার মাথা বধা নাহি জল ॥
 এই বচন সত্য অস্তুর না করি ।
 মিলিলা ছুই ভাই যথা দেব শ্রীহরি ॥
 স্তম্ভর্শন কমল ধরিয়া শঙ্খ গদা ।
 অধনে কাটিল মধু কৈটভের মাথা ॥
 ত্রিপুরা সহায় জিনে মধু কৈটভ রিপু ।
 দেবীর প্রভাব এই হল শূন্য বপু ॥
 অপর দেবীর কথা স্তন ছুই জন ।
 যাহার প্রসাদে হরি দেব ত্রিময়ন ॥
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুকমতি ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥
 ॥ তৃতীয় পালা সমাপ্ত ॥

॥ কামোদ ॥

অস্তুর দহুদহুত আছিল নিরাপদ
 রাজ্য করিল চিরদিন ।
 মহত্ত্ব ধন বল সকল বিকল
 জীবন সম্ভতিহীন ॥
 শয়ন আগরণে বসিয়া ভাবে মনে
 কুরঙ্গ গজ দোলায়িত ॥

সকল জন কহে তনয় অস্তুর নহে
 সেবিলে বিনি শশিচূড় ॥
 চলে তপোবনে শিব আরাধনে
 সেবক দিয়া নিজ পুরে ।
 বিমল বহে নীর মকর কুন্তীর
 জলু তনয়ার তীরে ॥
 বাদশ বৎসর করিয়া নিরাশ্রয়
 পু[১৮]জিল বিধিমত দেশে ॥ ১০ ॥
 সন্তোষ হইয়া হর ত্যজিয়া স্তনপর
 উড়িলা জন্তু যথা বৈসে ॥
 ডমরু সিঙ্গানাদ বলদে ভূতনাথ
 দেখিয়া গুটহাথে ভাবে ।
 আমার বীর্ঘ্যে পুত্র জিনিব শতমথ
 নিবেশ কর পরিতোষে ॥
 তোমার অভিমত করিব আমি সিদ্ধ
 বলিয়া শিব গেলা ঘরে ।
 নারদ মহামুনি শুনিঞা বত বাণী
 কথিল পিয়া পুরন্দরে ॥
 বিকুর তুমি জেঠ উপায় চিন্ত ঝাট
 ত্রিদেব যেন নঠ নহে ।
 ত্রিপুরাপদস্থল কমল মধুকর
 মুকুন্দ কবিচন্দ্র কহে ॥ ১১ ॥

॥ ছন্দ ॥

স্তন ইন্দ্র বাক্য মোর দেবতার রাজ্য ।
 জন্তু করিল তপ বলে মহারাজ্য ॥
 সেই তপে বশ হৈল দেব পশুপতি ।
 বর দিল তার তরে হইব সম্ভতি ॥
 তোর পুত্র হব রাজ্য ত্রিভুবনেশ্বর ।
 জিনিব সকল দেব ইন্দ্রের নগর ॥
 বর দিয়া পশুপতি গেলা নিজ ঘর ।
 দেশেয়ে চলিলা অস্তুর পাইয়া পুত্রবর ॥
 দেখিল স্তনিল কথা কহিল তোমারে ।
 হিতাহিত বিচারিয়া চিন্ত প্রতিকারে ॥

নারদবচনে ভয় পাইল ইন্দ্র মনে ।
জিজ্ঞাসিল কি করিব কহ তপোধনে ॥
বলিলেন উপায় নারদ মহাশুবি ।
ষাটশ বৎসর জন্ত আছে উপবাসী ॥
ঐরাবত চড়ি চল বজ্র লইয়া হাথে ।
সংগ্রাম করিয়া মার অশুরের নাথে ॥
নারদবচনে চাপে ঐরাবত হাথী ।
শ্রীমুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

। পয়ার ॥

নারদের বচনে হৃদয়ে লাগে ভর ।
মাকুলি আনিঞা পান দিলেক সম্বর ॥
ঝাটো রথ সাজি আন নাই কর হেলা ।
প্রসাদ চন্দন দিল পারিজাত মালা ॥
ইন্দ্রপদে মাকুলি সম্বোধে করে সেবা ।
সাজিয়া আনিল ঐরাবত উচ্চৈঃশ্রবা ॥
সযোভ পা[১২ক]ধর পিঠে কনকের জিন ।
হস্তিষ আতর বহে নহে গুণহীন ॥
বজ্র হাথে করি ইন্দ্র ঐরাবতে চাপে ।
ধনুকে টঙ্কার দেই ত্রিভুবন কাঁপে ॥
ইন্দ্রের আজ্ঞায় গজ ছাড়িল সম্বর ।
আগলে জন্তের পথ বাধু করি ভর ॥
ইন্দ্র কহে শুন জন্ত কোথা রে গমন ।
ইংসা বড় বাড়ে তোমা সঙ্গে করি রণ ॥
ইন্দ্রের বচনে জন্ত মনে মনে হাসি ।
ষাটশ বৎসর আমি আছি উপবাসী ॥
ঐরাবতারূচ শচীনাথ পুরন্দর ।
আমারে সংগ্রাম চাহে দেখিয়া নির্বল ॥
সংগ্রাম চাহিলে যদি নাহি হয় সঙ্ক ।
মরণে মুকতি নাহি বিখ্যাত বীরস্ব ॥
জীবন যৌবন ধন সকল বিফল ।
এতেক তাবিয়া জন্ত দিলেক উত্তর ॥
জ্ঞান করিয়া আমি কুরি জলপান ।
ক্ষেণেক বিলম্ব কর শুন মরুদান ॥

বীরে বীরে যায় জন্ত জঙ্ঘু নদীতটে ।
রূপসী মহিষী দেখে কানন নিকটে ॥
দিবা অবসানে জন্ত যায় তার পাশে ।
ঋতুবতী মহিষী দেখিয়া পরিতোষে ॥
অরশর জর জর বিধির ঘটনে ।
পরিতোষে আলিঙ্গন হইল দুই জনে ॥
মহিষা সহিত জন্ত বক্ষিল সুরতি ।
কোন কালে নহে মিথ্যা মহেশভারতী ॥
মহিষীর পর্বে রহে জন্তের তনয় ।
মহেশের বরেতে জন্মিলা মহাশয় ॥
জ্ঞান করিবারে জন্ত মজিলেক জলে ।
জলপান করি উঠে জঙ্ঘু নদীকূলে ॥
জন্ত বাসবে যুদ্ধ হয় রাজি দিনে ।
মহিষী মহিষা নামে প্রসবিলা বনে ॥
পরিজন দিয়া জন্ত পুত্র নিল ঘরে ।
অবিরত যুঝে অন্ন নাহিক জঠরে ॥
বৃহত্তমালিনী দেবী হয়সহচরী ।
শ্রীমুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া দ্বন্দ্বরী ॥০॥

। পঠমঞ্জরি ॥

ক্ষেণে ক্ষেণে চমকিত অদ্বিতিনন্দন যত
মহিষাসুর অবতীর্ণে ।
সকল জলদধর শিরে শশিমণ্ডল
মকর কুণ্ডল দুই কর্ণে ॥
মুরজ পট্টহ বেষ্টী অরপিত শঙ্খধনি
কার কথা কেহ নাহি শুনে ।
[১২] অনেক দৈত্যের মালা কুন্তল চন্দন খেলা
কর্পূর তাশুল অরবনে ॥
জয় জয় কোলাহল হরষিত দৈত্য বল
অর নর ভূবি রসাতলে ।
পূর্বে ধূপ দীপ ছিল অনল উজ্জল হইল
প্রতিপক্ষ হৃদয়ে বিশালে ॥
কম্পিত বজ্রযন্তী দিনেশ বিবর গতি
প্রতিকূল বহে সযীরণ ॥

যেব ডাকে উৎপাত ঘন হয় বজ্রাঘাত
 অসমীহ জলে হত্যাশন ।
 অমর নগর প্রভু বাচিল বিষম রিপু
 দেবগণে করে অহুমান ।
 অলঙ্কিত রূপ বল বিপরীত কলেবর
 চূর্ণকর দহুজপ্রধান ।
 ভুগু বুনির স্তম্ভ অহরের পুরোহিত
 সরস মঙ্গল বেদগানে ।
 করিলেক আশীর্বাদ তুমি ত্রিভুবন নাথ
 কামরূপ মঙ্গ দিল কানে ।
 চামর চিকুর বীর প্রভৃতি যতেক সুর
 গতায়ান্তে মহিষচরণে ।
 ত্রিপুরাচরণবর সরোজক মধুকর
 কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভনে ॥০।

॥ সিদ্ধিডা ॥

মহিষ অস্ত্রের পুত্র করে অহুমান ।
 ত্রিভুবনে নাহি ধর্ম কর্ণের সমান ।
 দেবতা দানব যক্ষ রাক্ষস মাছুষ ।
 পিশাচ কিম্বদন্ত নর জর্য মধ্যাহ্নজ ।
 গুণ্যের প্রতাপে ইহ ত্রিদশের নাথ ।
 ধর্মহীন জন করে সন্তত বিবাদ ।
 অবশ্য জনমে মৃত্যু মরণে অনম ।
 ক্ষতি ক্ষতি অধঃপথের কারণ ।
 পূর্বকর্ম ভুজে মৃত বিশ্বের আপনা ।
 জলে পদ্ম বিকশে বিনাশে হিমকণা ।
 ধর্মের কারণে বীর সুরনদীতে ।
 প্রবেশিলা নিরাহারে তপস্বী নিকটে ।
 আঁখি মুখ নাসা শ্রুতি নিবারণ করি ।
 ব্রহ্মজ্ঞান মুখে রহে ব্রহ্মে দিয়া তালি ।
 দ্বাদশ বৎসর পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে ।
 মন দিয়া রহে ক্ষুধা তৃষা নাহি জানে ।
 মহিষতপের বলে টলটল ক্ষতি ।
 জানিঞা সাক্ষাতে হইল অনাদি যুগপতি ॥

চারি বেদ পঢ়ে ব্রহ্মা প্রশবে নাহি টুটে ।
 সমাধি ভাঙ্গিল বীর চাহে কোপদিঠে ।
 বর মাগ মহাসুর ঋগাইব হুঃখ ।
 [২০ক] ভদ্রি করিয়া নাচে হংসে চারি মুখ ।
 প্রশতি করিয়া বীর বলে সবিনয় ।
 ত্রিভুবনের নরপতি করিবে অক্ষয় ।
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুকুমতি ।
 শ্রীমুখ মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০।

। পরার ॥

মহিষ বচনে বলে বিধি বেদানন ।
 আমি যুগপতি জন্ম মরণ কারণ ।
 কোম কালে নহে মিথ্যা আমার বচন ।
 জন্মিলে মরণ স্তন অস্ত্রের নন্দন ।
 ব্রহ্মার বচন শুনি নিশ্চয় নির্ভর ।
 চরণ কমল যুগে ধরে মহাসুর ।
 ভক্তিভাবে ব্রহ্মার মানসে উঠে দ্বার ।
 জানিঞা দৈত্যের মুখে বৈসে মহামায়া ।
 মিথ্যা আমি সেবিল তোমার পাদপদ্ম ।
 বর দিতে আমারে পাতিলে নানা ছন্দ ।
 গুরাণপুরুষ ব্রহ্ম জানিল ধেনানে ।
 বিষ্ণুমাত্রা দয়াবতী দৈত্যের বদনে ।
 খল খল হাসে ব্রহ্মা দেবের প্রধান ।
 পুনর্বার মাগে বর করি পূর্ণকাম ।
 ক্ষেম অপরাধ গোসাঞি যে কথিল রোষে ।
 সর্বদা সেবকে পরিপূর্ণ গুণদোষে ।
 স্বর্গ মর্ত রসাতলে বাহার অনম ।
 তার হাথে কছু মোর নহি মরণ ।
 সত্য সত্য বলে ব্রহ্মা হংসের ঠাকুর ।
 মরাল মঙ্গল ধ্বনি চরণে নুপুর ।
 আজি তোরে দিল আমি চারি মুখে বর ।
 সানন্দে নিবস গিয়া ত্রিভুবনেশ্বর ।
 বর দিয়া বিধি অস্ত্রজ্ঞানুসেইখানে ।
 অস্ত্রের মরণ স্তন কবিচন্দ্র ভনে ॥০।

॥ কাঁপা ॥

॥ বারাচে ॥

মুঠকী চাপড় চড় অঙ্গ নাহি হাথে ।
 এক ঘায়ে মুর্ছিত করয়ে সুরনাথে ।
 উদরে নাহিক অন্ন না ভাবে অস্থখ ।
 পরশিল নহে যেন তপে হতভুজ ॥
 ইন্দ্ৰের সাহিত যুঝে মহাসুর জন্ত ।
 সমরপুণ্ডিত সুর নাহি [২০] ছাড়ে দন্ত ॥
 ঘোরতর করে যুদ্ধ অসুর দাক্ষণ ।
 রথাক ফিরায় যেন ক্রোধিত অরুণ ॥
 দেখিয়া দেবতাপণ করয়ে করুণ ।
 বিপরীত ধবল পাষাণে বিদ্ধে যুগ ॥
 রথহীন অসুর বাসব গজকন্ধে ।
 ওলানি উঠানি রণ নানা পরিবন্ধে ॥
 নৃমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া দৈবরী ॥০॥

। ছন্দ ॥

অনেক দিবস অন্ন নাহি খায় জল ।
 হাথাহাণি ছুই জনে বুঝে বলাবল ॥
 হাথ ছাড়াইয়া বজ্র পেলে হরি হয় ।
 জন্ত বধিল রণে দিল জয় জয় ॥
 জন্ত বধিয়া ইন্দ্ৰ গেল নিজ ঘর ।
 নারদে আসিয়া কহে হরিষ অন্তর ॥
 জন্ত বধিল আমি আর নাহি ভয় ।
 আশীর্ব্বাদ করহ নারদ মহাশয় ॥
 বাসবের কথা শুনি হাসে মহামুনি ।
 কোন কালে নহে মিথ্যা মহেশ্বের বাণী ॥
 জগিয়া জন্তের পুত্র গিয়াছে তপোবনে ।
 মহিষ হইব ইন্দ্ৰ তনু মথবানে ॥
 নারদের বচনে বাসব কাঁপে ভয়ে ।
 সুরপুরি রাখিতে উপায় বল মোরে ॥
 করিব মহিষ বধ বিশাললোচনী ।
 কবিচন্দ্র মুকুন্দ রচিল শুদ্ধ বাণী ॥০॥

না জানি মহিষাসুর আছে কোন কাজে ।
 ষাদশ বৎসর করিয়া নিরাহার
 তপ করে তপস্বীর মাঝে ॥
 সম্ভাষ জননী যতেক ভগিনী
 বনিতা সনে সরসতা ।
 বিকশিত পুরীজন সহোদর বজ্রগণ
 অন্ন দিল নাহি আর কথা ॥
 সম্ভাষ মানসে 'রজনী দিবসে
 দেবতা অসুরে নাহি ভেদ ।
 মহিষাসুর সনে 'দরশ কত দিনে
 খণ্ডিব মনের খেদ ॥
 বিজিতা[২১ক]ধণ্ডল কিরীটী কুণ্ডল
 দণ্ড কমণ্ডলুগারি ।
 ত্রৈত্যাসুর সর্জন জয় বীর গর্জন
 সতে উপনীত নিজপুরি ॥
 মহিষ বিপুল বল গুরু করে মঙ্গল
 হরষিত হইল যত প্রজা ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে দ্বিপুরাচরণে
 অসুরে মেলিয়া কৈল রাজা ॥০॥
 ॥ সিদ্ধুড়া ॥
 আনন্দে বিভোল লোক নাচে উর্দ্ধভূজে ।
 নগর নাগরী আইল ধাওয়াধাই
 বসন না বেই কুচে ॥
 কৃতজ্ঞ নির্ম্মল পৌরপুরিজন
 নিছিয়া কেহ পেলে পান ।
 প্রণবপূর্ব্বক বেদ পড়য়ে মঙ্গল
 মুনিজন করয়ে কল্যাণ ॥
 শান্ত পুরি জল পূর্ণিত কলসে
 বদনে নব চূতডাল ।
 তৎকর্থে লবিত গন্ধামোদিত
 সুরতরুপুষ্পের মাল ॥
 প্রতি জন নাছে অখণ্ড রোপিত
 কদলি ক্ষিতিক্রহতলে ।

দুর্ভিক্ষিত যব কাঞ্চন পাঞ্জে
যুতের মশাল জলে ॥
অম্বর মহোৎসব শুনিঞা দেবতা
ত্রাসে নিশ্চিন্তিতা ।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে
না জানি রজনী দিবা ॥
॥ গুঞ্জরি রাগ ॥

অমর্যব বাজে ভেরী মুদল মাদল ।
যুবতী সহিত লোক আনন্দে বিভোল ॥
বিজয় মঙ্গল গজ তুরঙ্গম লেখা ।
রথ পদাতিক অম্বর ধবল পতাকা ॥
দামা দড়মসা কাড়া দগড় কাঁসর ।
চাক ঢোল বাজে অম্বর অম্বর কোলাহল ॥
হরষিত হইল ইষ্টকুটুধ সকল ।
রবির কিরণে যেন বিকশে কমল ॥
প্রতিপক্ষ টুটে যেন দিবসে দিবসে ।
শিরীষ কুম্বয় যেন হস্তাশন পাশে ॥
দান পুণ্য করে রাজা না করে বিচার ।
অদ্বিতিনন্দনগণে লাগে চমৎকার ॥
আনন্দে নিবসে লোক আপন ভবনে ।
[২১] শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে ॥০॥

॥ পয়ার ॥

অদ্বিতি দিতির পূজ ছুই দণ্ডবারী ।
কার কেহ নহে বশ বৈসে অরপুри ॥
আলাআলি গালাগালি করে অরাজুর ।
রড়ারড়ি ছুই জনে নহে অতি দূর ॥
হস্তী ঘোড়া রথ পদাতিক ছুই মলে ।
ঠেলাঠেলি করে ছুই আপনায় বলে ॥
নানা বাজ বাজে উল্লসিত হইল ঠাট ।
কোপে কাট কাট বলে অরাজুরাট ॥
অতি কোপে কাণ্ডাকাণ্ডি সময় প্রচণ্ড ।
হানাহানি করি কেহ হয় খণ্ড খণ্ড ॥
দোয়াড় বিচ্ছিন্ন করে সাক্ষিতলে যায় ।
ডাঙসের ঘারে কেহ ধরশী লোটায়ে ॥

মাহত পেলাইয়া হস্তী লোটাইল ক্ষিতি ।
রথে মহারথী যুখে পড়িল সারথি ॥
দাবাসিনি পড়ে ঘন বজ্র সমান ।
ঘোড়ার রাউত কেহ হয় চুইধান ॥
পড়িল দেবতাসুর বহে রক্তনদী ।
ভাসে গণ্ডি মুণ্ডি পত্তি রথ ঘোড়া হাথি ॥
অম্বর অম্বর কোলাহল নাহি অবসাদ ।
দেবতা দানবগণে হইল বিবাদ ॥
ঘন শিল দগড়ে তেঘাই ভেরিচয় ।
ক্ষেণে ক্ষেণে রণভূমি অম্বর পরাজয় ॥
দেবতা দানবে যুদ্ধ হয় নিরন্তর ।
সম রণ দেখে লোক শতেক বৎসর ॥
শূল শক্তি শেল কেহ মারে চক্র বাণ ।
ঐরাবতাক্রম বজ্র পেলে মরুদান ॥
কোপে মহাসুর হয় মহিষশরীর ।
বিশাল কাপয়ে দেবগণ নহে স্থির ॥
যুদ্ধে ইন্দ্র মহিষ দেবতা দৈত্যপ্রভু ।
দেবসৈন্য জিনিলেক দেবতার রিপু ॥
জিনিল দেবতাগণ দিতির তনয় ।
মহিষ হইল ইন্দ্র দেবতানিলয় ॥
[২২ক] দ্বিতীয়পরাঞ্জিত দেবতা সকল ।
পালাইয়া যায় সন্তে না পরে অঘর ॥
অবল দেবতা দৈত্য মহাবলধর ।
গৃহস্থ দেখিয়া যেন চোরে লাগে ভয় ॥
অম্বর বৃহৎপ্রভু দেব নারায়ণ ।
দেবতার প্রাণ পরিভ্রাণ কারণ ॥
ঐরাবতগানে পিয়া রাথ নিজ প্রাণ ।
মঙ্গলা করিল বিধি মঙ্গলনিধান ॥
শুনিঞা মঙ্গলা হরষিত দেবগণ ।
কাকুবাদ করি ধরে ব্রহ্মার চরণ ॥
অনন্তাদি মধ্য চতুর্ভুজ যুগপতি ।
অশেষ মঙ্গলা প্রভু দেবতার পতি ॥
যতনে সৃজিলে দেব দেবতানগর ।
আপুনি করিলে দেবরাজ গুরন্দর ॥

দানবে লইল রাজ্য স্বর্গভূমিতল ।
 দেবতা সকলে কিছু নাহি বুজিবল ॥
 তুমি দেবপিতামহ পুরাণপুরুষ ।
 স্বজন পালন নাশ হেতু নিকৃষ্ট ॥
 তুমি যদি চল যথা হর নারায়ণ ।
 সবে গিয়া করি নিজ হুঃখ নিবেদন ॥
 দেবতার বচনে হৃদয়ে লাগে ব্যথা ।
 ভাল ভীল করি উঠে তিনলোকপিতা ॥
 আগে ব্রহ্মা পাছে যত দেবতাতনয় ।
 যাত্রা করিল সতে দিয়া অন্ন অন্ন ॥
 মনের অধিক গতি দেবতা সকল ।
 উপনীত হইল যথা দেব দামোদর ॥
 একে একে মহাশয় অধিতিনন্দন ।
 প্রণাম করিয়া করে হুঃখ নিবেদন ॥
 অলদহুন্দর দেহ গুরুভবাহন ।
 অলবিশয়ন প্রভু অলজনয়ন ॥
 বহুমতী ধবল কন্ঠ রূপধর ।
 ধবল ভুজগপতি তাহার উপর ॥
 পৃথিবীমণ্ডল মাঝে স্থজিলে মাধুস্বয় ।
 অষ্ট লোকপাল দেব একেলা পুরুষ ॥
 স্থজিলে দেবতাগয় হেম হিমগিরি ।
 দেবতার নাথ ইচ্ছ করিলে শ্রীহরি ॥
 দোষগুণবিরহিত [২২] সদয় হৃদয় ।
 জিনিল বিবুধরিপু কমলানিলয় ॥
 স্থলশূন্ত পুরুষ নিক্রপ দামোদর ।
 স্বাবর অক্ষয় নদ নদীর দৈব ॥
 পালন প্রায় ভব তমু সনাতন ।
 জনম যৌবন জরা মরণ কারণ ॥
 চারি ভুজ গদা পদ্ম শঙ্খ সূদর্শন ।
 অবল সকল দেব বিপক্ষ গর্জন ॥
 নরায়ণ শশিশিরোমণি ত্রিলোচন ।
 ত্রিশূল ডম্বর করে বলহ বাহন ॥
 ভুবনবিখ্যাত প্রভু হাড়মালা গলে ।
 ভঙ্গপূর্ণ শরীর বাহুকি বক্ষঃস্থলে ॥

অনেক যতনে প্রভু মথিলে সাগর ।
 সিতাসিত শরীর অভেদ হরিহর ॥
 তুমি দেব স্থজিলে ভুবন চারি দশ ।
 অস্তুরে লইল রাজ্য হইল অপযশ ॥
 ত্রিদিবে মহিষাসুর হইল শচীনাম ॥
 চন্দ্র স্বর্ঘ্য শমন বরুণ বহি বাত ॥
 আর যত দেবতার করে অধিকার ।
 সহিতে না পারি কেহ যুদ্ধ তাহার ॥
 ত্যোজিয়া ত্রিদিব দেব মহিষের ভরে ।
 মহুঘ্য সমান স্রমি বহুমতীভলে ॥
 অনাথের নাথ তুমি অবলের বল ।
 অস্তুরে জিনিল দেব জীবন বিফল ॥
 তোমার চরণে হইল প্রণত দেবতা ।
 অস্তুরের বধ চিন্ত না করিহ বিধা ॥
 শুনিঞা দেবের সরস করুণ বাণী ।
 ক্রোধে পূর্ণ দেহ দেব শূল চক্রপাণি ॥
 উন্নত বেশ হইল হর দামোদর ।
 অকুটিকুটিল মুখে ক্ষুরে কোপানল ॥
 কুমুদবান্ধব স্বর্ঘ্য বহু বিলোচন ।
 মহুঘ্যবাহন বহুমতী হত্যাশন ॥
 বরুণ পবন ষম বিধি পুরন্দর ।
 সত্যাকার বদনে নির্গত কোপানল ॥
 দেবতাগণের তেজ কীরোদের কূলে ।
 অস্তুরে অস্তুরে ক্রমে ধক ধক জলে ॥
 নিদাঘে সকল দেব নামে সিদ্ধজলে ।
 একত্র হইল তেজ পবনের ঠেলে ॥
 [২৩ক] স্তম্ভের পর্বত যেন দেবকোপানল ।
 উজ্জল করিল স্বর্গ মর্ত্ত রসাতল ॥
 শক্তিরূপিণী জয়া অনন্ত রূপিণী ।
 দেবকোপানলে দেবী বিশাললোচনী ॥
 অমোনিমন্তবা দেবী শূভ্রে অবতারে ।
 মহিষমর্দিনী জয়া নিজ রূপ ধরে ॥
 প্রথমে জম্বিল মুখ মহেশের বরে ।
 শরীর রহিত শশী ষোল কলা ধরে ॥

শবনের তেজে তাঁর হৈল কেশপাশ ।
 কাদহিনী জিনি যেন করিল প্রকাশ ।
 ভূজপণ হৈল তাঁর মাধবের বরে ।
 প্রবল তরঙ্গ যেন জলনিধি জলে ॥
 চন্দ্রিমার তেজে ছুই কুচ অবিরল ।
 স্তম্ভিত দশবান কনক শ্রীকল ।
 বাসবের তেজে তাঁর হইল মধ্যখান ।
 চন্দ্র শিরোমণি হর ডমরু বাজান ॥
 বরুণের তেজে স্তম্ভিত জজ্বা উরু ।
 ক্ষিতিতেজে তাঁহার নিতম্ব হইল গুরু ॥
 পিতামহ তেজে তাঁর হইল ছুই পদ ।
 অলিহীন বিকসিত নব কোকনদ ॥
 অরুণের তেজে চরণের দশাঙ্গুলি ।
 অতি অশোভিত যেন চাঁপার পাখড়ি ॥
 বাহুতেজে করাঙ্গুলি হইল সমতুল ।
 কুবেরের তেজে হইল নাসা তিলকুল ॥
 প্রজাপতিতেজে হইল দশন তাঁহার ।
 সিন্দূরে নির্মিত যেন মুকুতার হার ॥
 অনলের তেজে তাঁর হইল ত্রিনয়ন ।
 কনক দর্পণে যেন বসিল থলন ॥
 উভয় সঙ্ঘার তেজে অয়ুগ স্তম্বর ।
 মধুপান করে যেন চপল ভ্রমর ॥
 পবনের তেজে হইল শ্রবণ স্তম্ভিত ।
 বিহগকণ্টক যেন আঁকটির কাঁদ ॥
 দেখিল দেবতাশক্তিধুবকলেবরা ।
 ত্রিগুণজননী দেবী ত্রিমূর্তি ত্রিপুরা ॥
 জয় জয় শব্দ করে গগনবাসিনী ।
 দেবতেজোময়ী দেবী জৈলোক্যনোহিনী ॥
 দেখিয়া হরিষ হইল যত দেব[ব]ৎগণ ।
 চুর্জয় মহিষাসুর ভয়াঙ্কুল মন ।
 অত্মমান করে যুক্তি রণের কারণ ।
 দেবতা মেলিয়া দেই অস্ত্র অভরণ ॥
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুজুকমতি ।
 ত্রীমুখ মুকুম্ভ কহে মধুর ভারতী ॥০॥
 ॥ চতুর্থ পালা সমাপ্ত ॥

॥ পাহিড়া রাগ ॥

নিজশূল ভবশূল শবহর দামোদর
 চক্রে সৃজিয়া চক্রবাণ ।
 বরুণ বাজন শঙ্খ শক্তি দিল হতাশন
 ধনু তুণ শর পরমাণ ॥
 ঐরাবত গজঘণ্টা কনকনির্মিত কুণ্ডা
 কুলিশজ বজ্র সুরেশ ।
 কালদণ্ড দিল যম সৃজিয়া আপন সম
 নাগপাশ জলধি বিশেষ ॥
 দেখি সুরতরঙ্গতলে ত্রিপুরা স্ত্রীরোদকূলে
 বিবসনা শক্তিরপিনী ।
 ভূষি অস্ত্র অভরণে মেলিয়া দেবতাগণে
 হরষিত দৈত্যদলনী ॥
 দেবীর লোমকূপ মাঝে প্রবল আপন তেজে
 ধরিলেক সহস্রকিরণ ।
 কমণ্ডলু অক্ষমালা প্রজাপতি খাণ্ডাকলা
 অনন্ত ফণা দিল সুশোভন ॥
 স্ত্রীরোদ আপন সার সৃজিয়া রক্তের হার
 অরুণ যুগল বজ্রখানি ।
 কেশুর নুপুর শঙ্খ অর্দ্ধচন্দ্র নিকলক
 বলয়া কুণ্ডল চূড়ামণি ॥
 অঙ্গুরি পাণ্ডুলী টাঙি বিশ্বকর্মা দিল রজি
 নানারূপ অস্ত্র সকল ।
 জলধি পঙ্কজমালা শিরে দিল অবিশাল
 শিরে দিল আপার কমল ॥
 সিংহ দিল হিমবান্ তখি চণ্ডী অধিষ্ঠান
 নানা রক্তে ভূষে ভববধু ।
 কুবের ধনের পতি যার সখা বুধপতি
 কনকরচিত পাত্র মধু ॥
 অনন্ত নাগের পতি পিঠে যার বজ্রমতী
 নাগহার দিল তনি সঙ্গে ।
 আর যত দেবগণ দিলেক বিবিধ বাণ
 রক্তে ভূষিত অতি রঙ্গে ॥

বিধি পড়ে স্তুতি বেদ খণ্ডিতে দেবের খেদ
ভগবন্তী হাসে ধল ধল।

চণ্ডীপদসরসিঙ্গে শ্রীযুত মুকুন্দ বিজে

[২৪ ক] বিরচিত সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ মালসী ॥

চণ্ডীর অট্ট অট্ট হাস্য পুরিল অন্তরীক্ষ।

প্রস্তুত শবে চমকে ত্রৈলোক্য দশ দিগ ॥

উৎকলিল সিদ্ধ টলটল বসুমতী।

সকল পর্বত নড়ে কাঁপে কপিপতি ॥

সিংহবাহিনী দেবী তুমি ভগবতী।

কহে দেবগণ জয় জয় পার্শ্বতী ॥

ছুটিল সূর্য্যের ঘোড়া শূন্ত হইল রথ।

শচীপতি এড়িয়া পালাইল ঐরাবত ॥

বৃষত ছুটিল পেলাইয়া শশিচূড়।

পেলিয়া কমলাপতি উড়িল গরুড় ॥

ব্রহ্মার বাহন হংস চক্রাবর্তে ফিরে।

জায়ে না দেখে নীর সমুদ্রের তীরে ॥

সিদ্ধার খেয়ান ভাঙ্গে কর্ণে লাগে তালি।

সকলিতে নারে হস্ত রক্ষিনী বাণ্ডলী ॥

স্তুতি করে দেবগণ মুখে যার বেদ।

স্মিত পরিহারি দেবী দেবতার খেদ ॥

সুধু সকল লোক দেখে দৈত্যপতি।

ভনই মুকুন্দ আঃ কিমিতি কিমিতি ॥০॥

॥ ঝাপা ॥

বীর সাজিল রে মহিষাসুর পতি

দেবতার স্তুতিঞা নিশান।

ক্রোধে দন্তে ওষ্ঠ চাপে গগনে মুকুট লাগে

কলেবরে ছুটে কাল যাম ॥

কামান কুপাণ ফরি তব করে নখ ছুরি

করতলে ডাবুস দোয়াড়।

লোহার মুদগর টাড়ি শেল শক্তি শূল সাজি

হলকা কাছিল জম দড় ॥

চিনিলা বিষম সুর নেজাপঞ্জি বট সর

মথিয়া চেয়াড় চক্র বাণ।

গদাঙ্ক কি জাঠে পাশ জয়ঘণ্টা রিপুনাশ

দাবাগিনী বজ্র সমান ॥

নানা অস্ত্র বহে রথি ঘোটকের পবন গতি

রক্তত কাঞ্চনে শোভে রথ।

ধর ধর মার মার ঘোরতর অন্ধকার

সারথি সমরে বিশারদ ॥

শিলা দড় মসি কাড়া চাক ঢোল বাজে পড়া

ঘন ভেরি বরজ তে [২৪] ঘাই।

মহিষ পয়ানকালে স্বর্গ মর্ত্ত রসাতলে

স্বরে লেগিল বাণ্ডাঘাই ॥

হানিয়া লোহার গুণ্ডা পেলাইয়া লোকে খাণ্ডা

লাক দিয়া মারে মালসাট।

হুঙ্কর হুঙ্কর ধায় বিবরজক ধায়

সমরে যুড়িতে মহাকাট ॥

কোটা কোটা ঘোড়া হাথি টল টল করে ক্রিতি

অসুরে বেটিল চারি দিগ।

আছিল অমরপুরে সূখে নিজ ঘরে ডরে

দেবতা পলায় অন্তরীক্ষে ॥

আকাশে পাতালে তহু হেন বীর মহাহু

বিষম উজ্জত আসলোমা।

দেবতার করে চুর সময় পণ্ডিত সুর

দ্বিতির নন্দন যারে ক্ষেমা ॥

নূপ চাহে কোপদ্বিটে উঠিয়া ঘোড়ার পিঠে

ক্ষটিক ধবল পক্ষরাজে।

অঙ্গে দিয়া আঙ্গরেখি রবি শশী করে লাকী

চামর চিকুর বার গাজে ॥

উগ্রাস্ত উগ্র বীৰ্য্য করাল নৈত্যের পূজ্য

উদগ্ধায় ধায় অবিচারে।

কোটা নিযুত রথ হস্তী ঘোড়া অগণিত

ব্রহ্মা পলায় যার ডরে ॥

প্রাতে উদিত রবি নয়ন কমল ছবি

তাত্র বাঙ্কল মহাবল।

বড়াল বিষম বীর হরি হর নহে স্থির

যারে ডরায় শচীর দ্বন্দ্ব ॥

ডরে মুনি ছাড়ে ধর্ম ত্রাসিত হইল কুর্ম
 দেখিয়া যুদ্ধের পরিপাটী ।
 উদয়াস্ত গিরিমূলে চতুরঙ্গ দলে চলে
 অস্ত্র নিযুক্ত কোটী কোটী ॥
 কুবের বরুণ হিম- কিরণ তরুণ যম
 মঙ্গ দক্ষি কাঁপে ধর ধর ।
 চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ বিজে
 বিরচিল সরস বদল ॥০॥

॥ মালসী ॥

সাজিল মহিষ চণ্ডী ভাবে মনে মন ।
 কেমতে রাখিব আজি অধিতিনন্দন ॥
 সহস্রেক ভূজে পূর্ব আগলে পশ্চিম ।
 ধনুকে টঙ্কার দেই কুলিশ প্রবীণ ॥
 চরণকমলতরে অলস্র ধরণী ।
 [২৫ক] মাথার মুকুট আংসাধিল মুনি ॥
 বেদমুখ হৃষীকেশ জিলোচন বন ।
 হংস গরুড় বৃষ মহিষবাহন ॥
 ধরিত্রী আপন অস্ত্র যুঝিবার আশে ।
 রজনী দিবস ঝড় বহিল আকাশে ॥
 বহু সন্ধ্যা বহুযতী হৃদয় চঞ্চল ।
 ফণিপতি জানিল একত্র বলাবল ॥
 কুবেরাশ্রি বরুণ পবন শচীনাথ ।
 রহিল সকল দেব দেবীর পশ্চাত ॥
 চতুরঙ্গ দলে দৈত্য উত্তম রূপাণ ।
 পাশাপাশি ঘোড়া হাথি করিয়া সন্ধান ॥
 সেনাপতি চলে আগে চিহ্নর চামর ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিকর ॥০॥

॥ বাপী ॥

ঝক ঝক খড়গ বিকৈছে ।
 বীর মাহল দগড় বাজে ॥
 কোপে মহিষাসুর সাজে ।
 জ্বাসে কম্পহ সর্পরাজে ॥
 ঘোচধুর পুটজাত শূলি ।
 ছয় দিনকর কিরণমাণি ॥

রত্নমিখিত হারশালী ।
 মত্ত কুঞ্জর বিষম গাজে ॥
 লেঙ্গা খরতর ডাঙশ কাছে ।
 চমক পড়িল অস্ত্রর মাঝে ॥
 সর্ব দানব চৌদিকে ধায় ।
 চণ্ডী কাঁপিল কমল পায় ॥
 শ্রীযুত মুকুন্দ বামন গায় ॥০॥
 ॥ ছন্দ ॥

হাথি ঘোড়া কোটী কোটী অগণিত রথ ।
 নানা বাস্ত্র বাজে বিরোধিল কর্পপথ ॥
 দগড় কাঁসর তেরি মুদ্রা মাদল ।
 দণ্ডি মোহরি ডম্ব বাজে অবিরল ॥
 দামা দড়মসা কাড়া বাজে ঠাঞি ঠাঞি ।
 ঘন ঘন পড়ে শিলা বিরল তেঘাই ॥
 জয় বীরচাক কাড়া বাজে অবিশাল ।
 বিজয় চন্দ্রভি বাজে ফুরে কাহাল ॥
 বীরঘণ্টা তেরি বাজে বরদো বিশাল ।
 তোলাপাড় করে স্বর্গ মর্ত পাতাল ॥
 কোটী কোটী সহস্র কুঞ্জর অশ্ব রথ ।
 মহিষ দৈত্যের নাথ তথি মহাসত্ত ॥
 আপে পাছে ধায় দৈত্য যথা মহাশয় ।
 [২৫] দেখিয়া অস্ত্ররণ দেবগণ জঙ্ক ॥
 কীরোদ সিংহুর কূলে দেখে দৈত্যপতি ।
 তেজে জিভূবন ব্যাপে একেলা যুবতী ॥
 আনন্দ ধরণী করে পদসরসিজে ।
 আগলিল ছুই দিগ দশ শত ভূজে ॥
 মাথার মুকুট লাগে গগন মণ্ডলে ।
 ধনুকেটকারে সর্প কাঁপে রসাতলে ॥
 তন লো স্তম্ভী কত পড়িল বিপাকে ।
 হান হান কাট কাট দৈত্যগণ ডাকে ॥
 মথিয়া তবকসিনি দাবা সিংহনাদ ।
 প্রলয় সময় যেন হয় বজ্রাঘাত ॥
 তোমর পেলাইয়া কেহ মাঝে ভিন্দিপাল ।
 কেহ শক্তি মাঝে কেহ তবক বিশাল ॥

ত্রিপুরা সহিত যুঝে লইয়া শেল সাজি ।
 কেহ হানে রূপাণে পেলিয়া মারে টাঙ্গি ॥
 কেহ খোঁচ বিক্ষে কেহ লোহার চেয়াড় ।
 কেহ লেজা মারে কেহ বিষম ঘোয়াড় ॥
 সহজে ত্রিপুরাদেবী বল বুদ্ধিমতী ।
 টানিল দৈত্যের বাণ দেবতার প্রতি ॥
 অঙ্গুলি ক্লেপে দেবী কোপে কীপে তহু ।
 পড়িল অনেক দৈত্য হত রথ বহু ॥
 দেবীর খড়্গপ্রহারে ক্রমিল দৈত্যগণ ।
 চণ্ডীরে হানিতে যায় করিয়া বিক্রম ॥
 নানা অস্ত্র বরিষণ করে দৈত্যগণ ।
 সেই ভগবতী দেবী হাসে মনে মন ॥
 অস্ত্র বরিষণে দেখে আপন বিভব ।
 নিরস্ত্র করিল চণ্ডী ষতেক দানব ॥
 সমরে ক্রমিলা স্বরহরগহচরী ।
 জ্বতি করে দেব ঋষি দেখিয়া ঈশ্বরী ॥
 নিজ শস্ত্র ক্লেপে ভগবতী নাহি সহে ।
 ফুটিল অনেক বাণ অস্ত্রের দেহে ॥
 কেশরী কীপায় সটা কোপে বাড়ে বল ।
 লাফ দিয়া পড়ে দৈত্য সহিত্ত ভিতর ॥
 কার শুল্ল ছিণ্ডে কার বিদরে কঠর ।
 কাননের মাঝে যেন জ্বলিল অনল ॥
 [২৬ক] যুঝে ভগবতী ক্রোধে ছাড়িয়া নিশ্বাস ।
 শতেক সহস্র দেবীগণের প্রকাশ ॥
 রণে নামে দেবীগণ দেখে দৈত্যপতি ।
 ভিন্ধিপাল টাঙ্গি শক্তি পটিগ সংহতি ॥
 নানারূপে যুঝে লাগে অস্ত্রের চমক ।
 মুদল বাজায় কেহ কেহ গুরে শব্দ ॥
 পট্টহ বাজায় কেহ কাড়ার লেখা ।
 সিংহনাদ গুরে কেহ চোলে দৈবধা ॥
 দামা দড়মসা কাড়া দগড় কীসর ।
 রাউতে মাছতে যুঝে রথী হইল জড় ॥
 গদাবাড়ি মারে কারো বৃকে শঙ্কিল ॥
 ত্রিপুরা হানিল খড়্গে শত শত অস্ত্র ॥

দিত্তির নন্দনে দেবী বাঞ্ছে নাগপাশে ।
 খণ্টার শব্দে কেহ পড়িল তরাসে ॥
 কারো পাণ্ডে যুগে হানে কারো হানে কঙ্ক ।
 ঝন ঝন রণভূমি বাঢ়িল আনন্দ ॥
 দেবীগণ কোপে কারো বৃকে মারে শেল ।
 সহিতে না পারে দৈত্য দেবতার তৈল ॥
 বোড়া ছাড়ে রাউত মাছত ছাড়ে হাধি ।
 খান খান বোড়া হাধি সারথি বিরতি ॥
 কার বাম হাথে হানে কারো বাম পদ ।
 খান খান হইয়া পড়ে নাহি ছাড়ে সম ॥
 বাহ বন্ধ চরণ নয়নে নিম্ন যায় ।
 অর্ধধান ঘেহ কার শরণী লোটার ॥
 রণের ভিতর উঠে ধরি বয়স্ক ।
 নানা যুদ্ধ করে কেহ বড়ই প্রমদ ॥
 কেহ করতালি দেই কার কঙ্ক নাচে ।
 কার কঙ্ক রড় দেই কার কঙ্ক যুঝে ॥
 হাথে খড়্গ কবন্ধ চণ্ডীরে দেই গালি ।
 না পালা না পালা রহ রক্ষিণী বাণ্ডুলী ॥
 নানা অস্ত্র হাথে করি উঠিল কবন্ধ ।
 চণ্ডীর সহিত যুঝে করিয়া প্রবন্ধ ॥
 পড়িল তুরগ সেনা রথ[২৬] দণ্ডাবল ।
 দেবতাদানবগম্য নহে রণস্থল ॥
 শোণিতের নদী বহে ভাসে গাণ্ডিযুগ্ধি ।
 দেখিয়া বাণ্ডুলী হাসে মজলচণ্ডী ॥
 কাষ্ঠনিচয় যেন জলে ছুতাশনে ।
 দেবীগণ বিনাশিল দিত্তির নন্দনে ॥
 দেবীর বাহন সিংহ করে মহারব ।
 জীবন তেজিয়া কত পড়িল দানব ॥
 জ্বতি করে দেবগণ দেবীর বিজয় ।
 অসংখ্য দানব পড়ে মহিব নির্ভয় ॥
 শূল্য বরিষণ করে দেবীর উপর ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কবে ত্রিপুরাকিঙ্কব ॥

॥ পঠমঙ্গরী ॥

বিষম সময় সুর ধায় বীর চিন্ময়
 চামর ধাইল তার পাছে ।
 হান হান কাট কাট নিনাদে পাগল ঠাট
 একেলা রহিয়া চণ্ডী যুঝে ॥

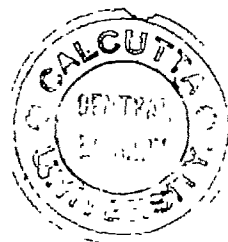
নেত্রা খাণ্ডা করতল ব্যাপিল রণস্থল
অঞ্জের কিরণ দশদিগ ।
দেবতা পালায় ডরে বলে দৈত্য উচ্চস্বরে
অবলার সাহস অধিক ॥
আগল সকল দিগে শেল শক্তি মার বুকে
ঘুচে যেন যুবভীষ্মনয় ।
বলে দেবী মধু ভাষা জীবনের তেজ আশা
অকারণে দৈত্যের বিক্রম ॥
বাটী সহস্র রথি উদগ্রন্থ সংহতি
অবিরত করে শরবৃষ্টি ।
ধর ধর মার মার ঘোরতর অঙ্ককার
অধিক প্রসরে নাঞ্চি দৃষ্টি ॥
অসিলোমা দিতিসুত পঞ্চাশ নিযুত রথ
মহাহু লৈয়া শত কোটী ।
বান্ধল মহিষ পক্ষ কোটীধিক বাটী লক্ষ
রথ হয় গজ পরিপাটী ॥
বিড়াল দিতির সূত কোটী নিযুত রথ
গজ বাজি পদাতি বিস্তর ।
আর যত মহান্নর তার সৈন্য প্রচুর
দেবতা মনুষ্যে অগোচর ॥
হস্তী ষোড়া চরণালি গগনে উড়িল খুলি
কঙ্করে গগনমণ্ডল ।
চণ্ডীপদসর[২৭ক]সিঞ্জে শ্রীযুত মুকুন্দ বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥ ০ ॥
॥ ধানশী ॥
দেখিয়া চণ্ডীর বল পড়ে চকুরল হল
হৃদয়ে বিশাল বাড়ে কোপ ।
বলে দৈত্য চিকুর নাশিব অমরপুর
দেবতা করিব আজি লোপ ॥
রণে নামে মহান্নর ঘন বাজে রণতুর
চণ্ডীর উপর মহারণ ।
অশেষ বিশেষ শর বেগে সমীরণ জল
যেন মেঘশিখরে জলদ ॥
যাহার যতেক বাণ কৈল চণ্ডী খান খান
নিজ বাণে তাহার তুরল ।
কাটিল ধনুক ধ্বজ সারথি বিষম গজ
বাণে বিধে অস্ত্র বিলম্ব ॥
ছিন্নধরা মহাসদ্র হতাশ অগণিত রথ
অবিসাথে অবিচারে ধায় ।
খড়্গা চর্ম ধরি হাথে লাক দেই শূন্য পথে
ত্রিপুরা নিকটে দৈত্য যায় ॥

ধরধার খড়্গা খানে সিংহের মস্তকে হানে
চণ্ডীর হানিল বাম ভুজে ।
পাইয়া দেবীর হাথ খড়্গা হইল খান সাত
ক্ষিণুল ধরিয়া বীর বুকে ॥
শূল পেলি লোকে ভুজে পৃথিবী ব্যাপিল তেজে
শূন্তে যেন সহস্র কিরণ ।
চণ্ডীর উদ্দেশে পোলে স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে
অতি কোপে অরুণলোচন ॥ ০ ॥
দেখিয়া দৈত্যের বাণ চঞ্চল দেবীর প্রাণ
নিজ শূল ক্ষেপিল তরাসে ।
সেই শূলে দৈত্যের অস্ত্র গেল চিকুর
মুকুন্দ রচিল চণ্ডী হাসে ॥ ০ ॥
॥ শ্রীরাগ ॥
চিকুর পড়িল রণে হরষিত হইল মনে
দেবতা সকলে দিল জয় ।
আপনা আপুনি নিন্দে চামর গজের কঙ্কে
দেবতা কটক মহাশয় ॥
নানা অস্ত্র ধরি ভুজে উরিল। সময় মাঝে
চণ্ডীর উদ্দেশে শক্তি এড়ে ।
[২৭]চড়িকা ছকার ছাড়ে যাবদ পৃথিবীতলে
নিশ্লেষ হইয়া শক্তি পড়ে ॥
ব্যর্থ হইল শক্তিখান কোপে বীর কম্পমান
শূল মারে ত্রিপুরার গায় ।
বাড়বানলের তুল দেখি দেবী সেই শূল
নিজ বাণে কাটিয়া পেলায় ॥
ধনুকে টকার দেই বলে বীর মোর ঠাঞি
রণভূমি আজি যাবে কোথা ।
করে বাণ বরিষণ বিমুখ দেবীগণ
দেখিয়া কাটিল তার মাথা ॥
কোপে দেবী খড়্গালোকে সিংহ লাফে অতিকোপে
উঠিল গজের কুন্তস্থলে ।
টানাটানি ভুজে ভুজে চামর কেশরি যুঝে
হুজনে পড়িল মহীতলে ॥
ঘটকী চাপড় চড়ে কারে কেহ নাহি ছাড়ে
শ্রোত বহে শোণিত কিঙ্করী ।
চামর উন্মাস পায় হানিল সিংহের গায়
কোপে দেবী দীর্ঘরঘরঙ্গী ॥
দস্তে শুস্ত নাহি টুটে গগনমণ্ডলে উঠে
চামর উপরে পড়ে লাকৈ ।
শ্রীযুত মুকুন্দ তনে হাথে কাতি মুক্ত হানে
চামর পড়িল দৈত্য কাঁপে ॥ ০ ॥

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

(ত্রৈমাসিক)

১০ ভাগ, চতুর্থ সংখ্যা



পত্রিকাধ্যক্ষ

শ্রীত্রিদিবনাথ রায়



২৪৩১, আপার মারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ অফিস

হইতে শ্রীমদেবকুমার গুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের ৬০ বর্ষের কৰ্ম্মাধ্যক্ষগণ

সভাপতি
শ্রীসজনীকান্ত দাস

সহকারী সভাপতি

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ
শ্রীগণপতি সরকার	শ্রীষোগেন্দ্রনাথ ঙ্গু
শ্রীতারশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীমুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
রাজা শ্রীধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়	শ্রীমুনীলকুমার দে

সম্পাদক
শ্রীনির্মলকুমার বসু

সহকারী সম্পাদক
শ্রীমু বলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীদীনেশচন্দ্র তপাদার শ্রীমনোমোহন ঘোষ

পত্রিকাধ্যক্ষ : শ্রীত্রিদিবনাথ রায়
কোষাধ্যক্ষ : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঙ্গু রায়
পুথিশালাধ্যক্ষ : শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
গ্রন্থাধ্যক্ষ : শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
চিত্রশালাধ্যক্ষ : শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষাল

কার্য্য-নির্বাহক-সমিতির সভ্যগণ

- ১। শ্রীশান্ততোষ ভট্টাচার্য, ২। শ্রীকামিনীকুমার কর রায়, ৩। শ্রীকুমারেশ ঘোষ,
৪। শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৫। শ্রীজগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ৬। শ্রীজগন্নাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
৭। শ্রীজ্যোতিঃপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৮। শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, ৯। রেভাঃ কাদার এ.
দৌতেন, ১০। শ্রীনরেন্দ্রনাথ সরকার, ১১। শ্রীপুলিনবিহারী সেন, ১২। শ্রীপ্রবোধকুমার
ঘোষ, ১৩। শ্রীপ্রভাতময়ী দেবী, ১৪। শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৫। শ্রীবিনয়বিহারী
ভট্টাচার্য, ১৬। শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ মজুমদার, ১৭। শ্রীমনোরঞ্জন ঙ্গু, ১৮। শ্রীষোগেন্দ্রচন্দ্র
বাগল, ১৯। শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা, ২০। শ্রীমুর্শেশচন্দ্র দাস, ২১। শ্রীচিন্তরঞ্জন রায়,
২২। শ্রীপ্রভাসচন্দ্র রায়, ২৩। শ্রীমাণিকলাল সিংহ, ২৪। শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা

৬০ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা

সূচি

১। গদা-ভাঙ্গিরধীর প্রবাহপথ	—অধ্যক্ষ শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ ...	১৬৩
২। বাংলা ভাষার বিজ্ঞানসম্মত কাব্য	—অধ্যাপক শ্রীজিহ্বিনাথ রায়...	১৭৫
৩। আধুনিক বৈষ্ণব গীতকার	—শ্রীঅমলেন্দু মিত্র ...	১৯৫
৪। গিজ	—শ্রীনীলগোপাল দাশশর্মা ...	২০২
৫। মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত—সক° শ্রীশুভেন্দু সিংহ রায় ও	শ্রীসুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...	২০৬



পশ্চিমবঙ্গ সরকার-প্রদত্ত বহুসম্মানিত ১৯৫১-৫২ সনের রবীন্দ্র-স্মারক-পুরস্কারপ্রাপ্ত

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্রন্থাবলী

সংবাদপত্রে সেকালের কথা ১ম-২য় খণ্ড : মূল্য ১০/- + ১২।০

সেকালের বাংলা সংবাদপত্রে (১৮১৮-৪০) বাদালী-জীবন

সম্বন্ধে যে-সকল অমূল্য তথ্য পাওয়া যায়, তাহারই সঙ্কলন।

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস : (৩য় সংস্করণ) ৪/-

১৭৯৫ হইতে ১৮৭৬ সাল পর্যন্ত বাংলা দেশের

দেশের ও সাধারণ মঞ্চালয়ের গ্রামাণ্য ইতিহাস।

বাংলা সাময়িক-পত্র ১ম-২য় ভাগ ৫/- + ২।০

১৮১৮ সালে বাংলা সাময়িক-পত্রের জন্মাবধি বর্তমান

পর্যন্ত পূর্ণ পর্যন্ত সকল সাময়িক-পত্রের পরিচয়।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা : ১ম-৮ম খণ্ড (৯০খানি পুস্তক) ৪৫/-

আধুনিক বাংলা-সাহিত্যের জন্মকাল হইতে যে-সকল অগ্রণীর সাহিত্য-সাধক ইহার

উৎপত্তি, পঠন ও বিকাশে সহায়তা করিয়াছেন, তাহাদের জীবনী ও গ্রন্থপঞ্জী।

শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের

১৯৫২-৫৩ সনের রবীন্দ্র-স্মারক-পুরস্কারপ্রাপ্ত

বঙ্গালীর সারস্বত অবদান (বহু নব্যগ্রন্থসংগ্রহ) ১০/-

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—২৪৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

সত্ত প্রকাশিত হইল

ডেভিড রিকার্ডের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ

‘দি প্রিন্সিপল্‌স অব পোলিটিক্যাল ইকনমি অ্যাণ্ড ট্যাকসেশনে’র বাংলা অনুবাদ

অর্থনীতি ও করতত্ত্ব

অনুবাদক : শ্রীঅন্বাকান্ত মে

ধনবিজ্ঞানের উষাকালে রিকার্ডের লেখার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিক প্রবণতা দেখা গিয়াছিল, আজও তাহা চূর্ণভ বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। মূল্য বারো টাকা।

তথ্যপূর্ণ ভূমিকা সহ কয়েকখানি বিশিষ্ট গ্রন্থের প্রামাণিক সংস্করণ

চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন	—বসন্তরঞ্জন রায় বিশ্বকল্লভ	৬।০
বৌদ্ধগান ও দোহা	—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী	৫।
শকুন্তলা	—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	১।
সীতার বনবাস	—ঐ	১।
পালামো	—সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৫।০
স্বর্ণলতা	—ভারকনাথ পল্লোপাধ্যায়	২।০
সারদামঙ্গল	—বিহারিলাল চক্রবর্তী	১।
মহিলা (১ম ও ২য় খণ্ড)	—সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার	২।
আলালের ঘরের দুলাল	—প্যারীচাঁদ মিত্র	৩।০
হতোম প্যাচার নক্শা	—কালীপ্রসন্ন সিংহ	৪।০
পদ্মিনী উপাখ্যান	—রত্নলাল বন্দ্যোপাধ্যায়	১।
সে কাল আর এ কাল	—রাজনারায়ণ বসু	১।
স্বপ্ন	—গিরীশচন্দ্রশেখর বসু	২।০
পুরাণপ্রবেশ	ঐ	৬।
ন্যায়দর্শন (১ম খণ্ড)	—কণিকৃষ্ণ তর্কবাগ্ধিশ	৪।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

২৪৩১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

হেমচন্দ্র-গ্রন্থাবলীর নিম্নলিখিত গুস্তকগুলি প্রকাশিত হইল

সম্পাদক : শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস

- ১। বুদ্ধসংহার কাব্য (১-২ খণ্ড) ৫৮ ২। আশাকানন ২৮ ৩। বীরবাহু কাব্য ১৫০
৪। ছায়াময়ী ১৫০ ৫। দশমহাবিজ্ঞা ৫০ ৬। চিত্ত-বিকাশ ১৮
৭। কবিতাবলী ৪৮ ৮। রোমিও-জুলিয়েত ২৫০ ৯। নলিনী-বসন্ত ১৫০
১০। চিন্তাতরঙ্গিণী ৫০ ১১। বিবিধ (যন্ত্রস্থ)

শীঘ্রই অমূল্য রেজিনে বাধাই গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইবে।

সাহিত্যরথীদের গ্রন্থাবলী

সম্পাদক : ব্রজেননাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসজ্জনীকান্ত দাস

বঙ্কিমচন্দ্র

উপভাস, প্রবন্ধ, কবিতা, গীতা

আট খণ্ডে রেজিনে অমূল্য বাধাই। মূল্য ৭২৮

ভারতচন্দ্র

অন্নদামঙ্গল, রসমঞ্জরী ও বিবিধ কবিতা

রেজিনে বাধানো—১০৮

কাগজের মলাট—৮৮

দ্বিজেন্দ্রলাল

কবিতা, গান, হাসির গান

মূল্য ১০৮

পাঁচকড়ি

অধুনা-চুত্ৰাপ্য পত্রিকা হইতে নির্বাচিত

সংগ্রহ। দুই খণ্ডে। মূল্য ১২৮

মধুসূদন

কাব্য, নাটক প্রহসনাদি বিবিধ রচনা

রেজিনে অমূল্য বাধাই। মূল্য ১৮৮

দীনবন্ধু

নাটক, প্রহসন, গল্প-পুস্তক দুই খণ্ডে

রেজিনে অমূল্য বাধাই। মূল্য ১৮৮

রামেন্দ্রসুন্দর

সমগ্র গ্রন্থাবলী পাঁচ খণ্ডে।

মূল্য ৪৭৮

শরৎকুমারী

‘ভববিবাহ’ ও অন্যান্য

সামাজিক চিত্র। মূল্য ৬৫০

রামমোহন

সমগ্র বাংলা রচনাবলী রেজিনে অমূল্য বাধাই। মূল্য ১৬৫০

বলেদ্র-গ্রন্থাবলী

বলেদ্রনাথ ঠাকুরের সমগ্র রচনাবলী। মূল্য ১২৫০

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ—২৪৩/১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৬

সংস্কৃত সাহিত্য গ্রন্থমালা

শ্রীরাজশেখর বসু অনুদিত

কালিদাসের মেঘদূত

॥ মূল, অম্ভবাদ, অম্বয় সহ ব্যাখ্যা ও টীকা সংবলিত ॥

মেঘদূতের অনেকগুলি বাংলা পদ্মাম্ভবাদ আছে। পদ্মাম্ভবাদ বতই প্রচলিত হউক, তাহা মূল রচনার ভাবাবলম্বনে লিখিত স্বতন্ত্র কাব্য। ইহাতে প্রথমে মূল শ্লোক, তাহার পর যথাসম্ভব মূলম্ভাব্যায়ী স্বচ্ছন্দ বাংলা অম্ভবাদ দেওয়া হইয়াছে। এরূপ অম্ভবাদে সমাসবহুল সংস্কৃত রচনার স্বরূপ প্রকাশ করা যায় না, সেই জন্য পুনর্বার অম্বয়ের সহিত যথাযথ অম্ভবাদ ও প্রয়োজন অম্ভাসারে টীকা দেওয়া হইয়াছে।

দ্বিতীয় সংস্করণ ॥ মূল্য দেড় টাকা

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনুদিত

অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত

অশ্বঘোষ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর আরম্ভে বর্তমান ছিলেন। কাব্যহিসাবে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত যুরোপীয় পণ্ডিতসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে—ঐহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইহাকে কালিদাসের কাব্যের সমপর্যায়ের কাব্য বলিয়া মনে করেন। কোনো ভারতীয় ভাষায় ইতিপূর্বে ইহার অম্ভবাদ হয় নাই।

প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড ॥ প্রতি খণ্ড দেড় টাকা

শ্রীরমা চৌধুরী অনুদিত

নারী-কবিগণ কর্তৃক রচিত

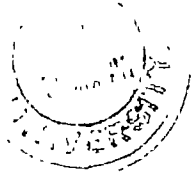
কবিতাবলী

বাংলা ভাষায় কোনো অম্ভবাদ না থাকায় বৈদিক নারী-ঋষি ও তৎপরবর্তী কালের নারী-কবিদের রচনা এত কাল জনসাধারণের নিকট অপরিজ্ঞাত ছিল। এই গ্রন্থে ২৬ জন বৈদিক নারী-ঋষির ২৫৩টি ঋক্, ৩২ জন নারী-কবির ১৪২টি সংস্কৃত কবিতা ও ৯ জন নারী-কবির ১৬টি প্রাকৃত কবিতার বঙ্গাম্ভবাদ মুদ্রিত হইয়াছে।

মূল্য দুই টাকা

বিশ্বভারতী

৬৩ ছারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা



গঙ্গা-ভাগীরথীর প্রবাহপথ

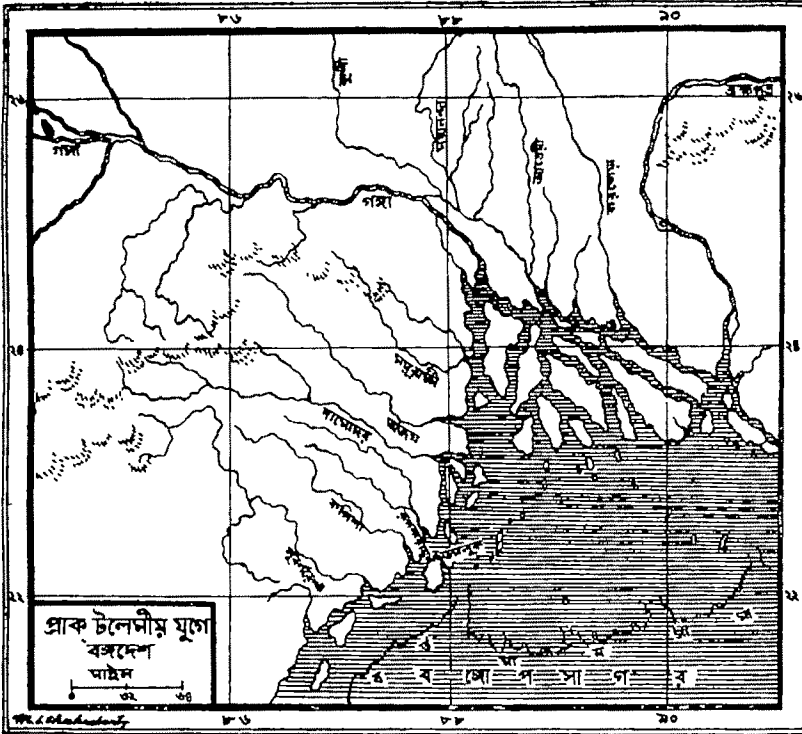
অধ্যক্ষ শ্রীবিধুভূষণ ঘোষ

গঙ্গাপ্রবাহ বঙ্গদেশের প্রাণকেন্দ্র। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া বঙ্গদেশের ভৌগোলিক ভাগ্য গড়িয়া উঠিয়াছে। আর এই ভৌগোলিক ভাগ্যই তাহার ইতিহাসের গতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ করিয়াছে। হিমালয়ের সামুদ্রিক হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ও ছোটনাগপুরে মালভূমি ও গারো, খালিয়া, জয়ন্তিয়া শৈলশ্রেণীবিষুত বঙ্গপ্রান্ত সমুদ্রগর্ভে ছিল। তখন না ছিল মেঘ-মমতাভরা শ্রামল প্রান্তর, শঙ্কাকীর্ণ ভূমি, না ছিল গভীর অরণ্য, না ছিল বঙ্গপ্রান্তে জীবনের কোন স্পন্দন। তখন শুধু সমুদ্রতরঙ্গ প্রতিহত হইত শৈলশ্রেণীর সামুদ্রিক প্রান্তরবেলায়। আর ধরপ্রোতা পার্শ্বভাষা ঝর্নাপ্রবাহ পর্বতের ঢালু পাজ বাহিয়া বিপুল আবেগে সমুদ্রে পড়িত। সমুদ্রের অতল গহ্বর হইতে ধীরে ধীরে আবিভূত হইল ধরণী, স্বপ্নের মায়ার মত। পার্শ্বভাষা নদী-প্রবাহবাহিত পলি জমিয়া যুগযুগান্তর ধরিয়া সমুদ্রগহ্বরে ভূমির স্তর সৃষ্টি করিয়াছে। নিত্য নব নব ভূমি সৃষ্টির ফলে সমুদ্র পশ্চাদপসরণ করিয়াছে। নদীর মোহনাঞ্জে দ্বীপের পর দ্বীপ সৃষ্টি হইয়া দ্বীপবলয় গড়িয়া উঠিয়াছে। দ্বীপবলয় ক্রমশঃ সাগরজলের উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। দ্বীপগুলির পারস্পরিক সংলগ্নতা ও দ্বীপসমূহের পরিধির বিস্তৃতি ও স্ফীতি তাহাদের মূল ভূখণ্ডের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়াছে। সামুদ্রিকসংলগ্ন নব-ভূমি সাগরকে দক্ষিণে সরিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে। সাগরের সহিত মিলন না হইলে নদীর জীবনে সার্থকতা থাকে না। অপস্থ্যমান সাগরকে অহুসরণ করে নদী। সাগরের পরিত্যক্ত সঙ্কুচিত খাত দিয়া পার্শ্বভাষা নদী দীর্ঘায়িত হইয়াছে সাগরকে স্পর্শ করিবার আকুল আবেগে। নব-সৃষ্ট ভূমির উপর দিয়াই এই মিলন-অভিসারের পথ রচিত হয়। এই চলার পথে ও পথের শেষে নদীপ্রবাহের গতিতে আসিয়াছে বৈচিত্র্য। প্রাণলীলায় চঞ্চল, মিলনের আনন্দের কল্লনায় বিভোরা নদী প্রাণোচ্ছল প্রবাহে নবসৃষ্ট কোমল ও নমনীয় ভূমিকে অভিসিক্ত করিয়া ছুটিয়াছে। আবার হইয়াছে মিলন। কিন্তু মোহনার দ্বীপবলয়সৃষ্টিতে মিলনের তার ছিন্ন হইলে, সাগর হয় অপস্থ্যত, আবার ক্ষুদ্র হয় নদীর চলা। অনন্ত কাল ধরিয়াই যেন সাগর ও নদীর মিলন ও বিরহের অপূর্ণ লীলা চলিয়াছে। বঙ্গদেশের ভূমিসৃষ্টির মূল কথা এই কাব্য। জলপ্রবাহের গতি ও প্রকৃতি চুস্তেয়। এক যুগে সে কুলপারহীন সাগরপ্রতিম উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল নদী; পরবর্তী যুগে তাহার প্রমত্ততা আর নাই। শান্ত শীর্ণ গাঙ্গিনিকায় সে পরিণত হইয়াছে। কীণ রক্তরেখার জায় যে গাঙ্গিনিকা ঝাঁকাঝাঁকা পথে বহিতেছিল, অকস্মাৎ তাহার বুকে নামিয়া আসিল প্রমত্ত বজ্রার বেগ। হুই কুল প্রাবিত করিয়া নব নব খাতে সহস্র ধারায় সে প্রবাহিত

হইতে থাকে। নদীপ্রবাহ সহজতম ও হ্রস্বতম পথটি বাছিয়া লয়। কোমল, অকঠিন ও নমনীয় ভূমির উপর দিয়া খাত রচনা সহজ। নদী নব-সৃষ্ট ভূমির উপর দিয়াই খাত রচনা করে; পুরাত্তমির উপর দিয়া প্রসারিত নদীর বাজাপথে খাত পরিবর্তন সহজে ও সহসা ঘটে না। একদা জিহ্মোতা (তি-স্তাং), করতোয়া, আজমেরী, পুনর্ভবা, মহানন্দা প্রভৃতি নদ-নদী ছিল পার্বত্য বর্ণাশ্রবাহ। পর্বতের ঢালু গাজ বাছিয়া তাহারা সরাসরি সাগরে পড়িত। ময়ুরাকী, অজম, দামোদর, রূপনারায়ণ, কঁাসাই (কপিশা বা কংসাবতী) ও স্বর্ণবর্ণেশাও ছোটনাগপুরের মালভূমির পূর্বপ্রান্তস্থায়ী সাগরে মিলিত। গঙ্গাও সেই সময়ে রাজমহলের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে সাগরে পড়িত। রাজমহল পর্বতমালা ও মালদহের পার্বত্য পুরাত্তমির মধ্যবর্তী বাজুমিশ্রিত দো-আঁসলা নরম মাটির উপর দিয়া প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা একাধিক ধারায় সাগরে পড়িত। পশ্চিমবঙ্গের পুরাত্তমি ছোটনাগপুরের পার্বত্য ভূমিরই ক্রমবিস্তৃতি এবং ইহা রাজমহল হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত। বর্ধমান-মেদিনীপুরের পশ্চিম ভাগের উচ্চতর গৈরিকভূমি ইহার অন্তর্গত। এই পুরাত্তমিরই পূর্ব, পূর্ব-দক্ষিণ প্রান্তস্থ নদীর মোহনায় নব-ভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। উত্তরবঙ্গে মালদহ-রাজসাহী-দিনাজপুর জেলার মধ্য দিয়া পুরাত্তমি রেখার মত প্রসারিত। ইহা গৈরিক, প্রস্তর ও বাজুকাময়। এই রেখা ও হিমালয়সমূহদেশের মধ্যবর্তী অংশ নিম্নভূমি, নবভূমি। হিমালয়নিঃসৃত নদ-নদী-বাহিত পলিমাটিতে এই জলাময় নব-ভূমির সৃষ্টি। পূর্ববঙ্গের পুরাত্তমির রূপ বিচিত্রতর। গারো-খাসিয়া-জৈন্তিয়া পাহাড়ের দক্ষিণে ও পশ্চিমে সংলগ্ন মধুপুর ও ভাওয়ালগড়ের গজারিবনয় গৈরিক পার্বত্য ভূখণ্ড পুরাত্তমি, এবং ঢাকা নগরী ইহারই দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। গঙ্গা-করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ এই পুরাত্তমির পশ্চিমশায়ী সাগরে নবভূমি সৃষ্টি করিয়াছে। ত্রিপুরা-চট্টগ্রামের শৈলশ্রেণীগাজলিয়া ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চল ও কাছার জেলার উত্তরাংশ ও শ্রীহট্ট জেলার পূর্বাংশ পূর্ববঙ্গের পুরাত্তমির অন্তর্গত। ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাবাহিত পলিমাটির কল্যাণ-স্পর্শে এই পুরাত্তমির গা বেঁধিয়া নব-ভূমি গড়িয়া উঠিয়াছে। নব-ভূমিসৃষ্টি প্রাক্-ঐতিহাস কাল হইতে টলেমীয়ুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল ধরা যাইতে পারে। এই নব-ভূমি মোটামুটি মেদিনীপুর, বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বাংশ, রাজসাহী জেলার দক্ষিণাংশ, বগুড়া, পাবনা, ঢাকা ও করিমপুর জেলা; এই নব-ভূমির গঠন ঐতিহাসিক কালের মধ্যে সম্পূর্ণ হইয়াছিল। উত্তরবঙ্গে মৌর্য অধিকার বিস্তৃতির সাম্রাজ্যরূপ রহিয়াছে মহাস্থানগড়ের মৌর্যালিপি। প্রাচীন বঙ্গ বলিতে যে নবভূমিকে বুঝাইত, তাহা বোধ হয় তখনও মূল ভূখণ্ডের সহিত যুক্ত হয় নাই। বিভিন্ন নদীর মোহনা-মুখে এই নব-ভূমি সম্ভবতঃ ধীপাকারে বর্তমান ছিল। ধীপবলয় ও মূল ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী খাড়ি বা সাগর-বাহর সঙ্কোচনে এবং ধীপগুলির নিত্য পলিমাটির সংযোগে কলেবর বৃদ্ধিতে ধীপবলয় ও মূল ভূখণ্ডের দৃষ্টিভ্রাস পাইতে থাকিল। নদীর মোহনাগুলি ক্রমশঃ ভরিয়া যাওয়ায় নদ-নদীগুলি সমুচিত খাড়িপথে প্রবাহ সৃষ্টি করিয়া, আবার নূতন করিয়া সাগরযাত্রা

আরম্ভ করিল। টলেমীর বহু পূর্বের নিৰ্ম্মাণ্যমাণ বঙ্গদেশের সম্ভাব্য মানচিত্র দেওয়া হইল।

প্রাক-টলেমীয় যুগের নিৰ্ম্মাণ্যমাণ বঙ্গদেশ



প্রাকটলেমীয় যুগ দ্বারা প্রাক-ঐতিহাসিক কাল হইতে মৌর্য আমল পর্যন্ত বুঝিতে হইবে। মৌর্যযুগে ও তাহার পরবর্ত্তী কালে গ্রীক ও লাতিন ইতিহাসকার ও ভৌগোলিকগণ বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থা অল্পবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিবরণে বর্ণিত ও টলেমীর মানচিত্রে অঙ্কিত বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থা বুঝিতে হইলে, মৌর্যযুগের পূর্বে বা সমকালে বঙ্গদেশ কিরূপ ছিল, তাহাই বক্ষ্যমাণ মানচিত্রে দেখান হইয়াছে। মানচিত্রে গঙ্গা, কোশিকী, আত্রৈয়ী ও করতোয়ার মোহনা, আধুনিক কালের পদ্মাপ্রবাহ তখনকার সাগরবাহ বা ষাড়িতে। মোহনাসমূহের দক্ষিণে পশ্চিমে তখনকার নিৰ্ম্মাণ্যমাণ বঙ্গ। উত্তরবঙ্গের নদীগুলি ও গঙ্গা নতুন প্রবাহপথ রচনা করিয়া সাগরের সহিত মিশিত হইবার প্রয়াস পাইতেছিল। মানচিত্রে চিহ্নিত ষাড়িগুলিই নদীর প্রবাহপথে পরিণত হইল। ১নং ষাড়িপথে মহানন্দা, আত্রৈয়ী, করতোয়ার বারিরাশি লইয়া কোশিকী ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিশিল। ২, ৩, ৪, ৫ ও ৬নং ষাড়িপথে গঙ্গা সাগরে পড়িল। ৭নং ষাড়ি

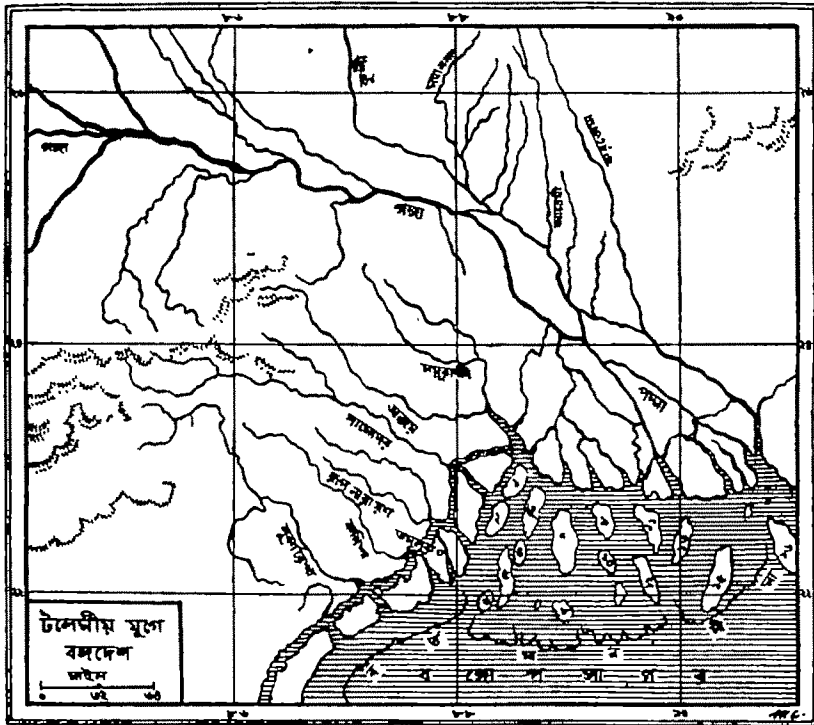
বেশী দিন গঙ্গার প্রবাহধারা বহন করিতে পারে নাই। সম্ভবতঃ ইহার খাত শুষ্ক হইয়া গাঙ্গিনিকায় পরিণতি লাভ করিল।

ভূমির সৃষ্টি ও গঠন প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করিয়া চলে। নিয়ম ও রীতির বাহিরে ইহার সম্ভাব্যতা কল্পনা করা যায় না। গঙ্গার নূতন প্রবাহপথে সাগরসঙ্গম নূতন ভৌগোলিক অবস্থা সৃষ্টি করিল। আবার এই সময়ে কৌশিকীর উচ্চ প্রবাহে ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটতে লাগিল। ফলে, নিম্নপ্রবাহ বার বার খাত ত্যাগ করিয়া অবশেষে পশ্চিমতম প্রবাহে রাজমহলের পশ্চিমে গঙ্গায় আসিয়া মিশিল। কৌশিকীর নিম্ন প্রবাহে করতোয়া সাগর পর্যন্ত প্রসারিত হইল। মধ্যপ্রবাহপথে আজেরী আপনাকে মিলিত করিল করতোয়ায়। গঙ্গা কালিন্দীখাতে কৌশিকীর বাকী প্রবাহপথ কৃষ্ণিগত করিল। বঙ্গদেশে কৌশিকী ও গঙ্গার আধিপত্য বিস্তারের লড়াইয়ে কৌশিকী পরাজিত ও পলায়নপর হইলে, গঙ্গাপ্রবাহ বঙ্গদেশের হৃদয়দেশ অধিকার করিয়া লইল। ইহাও যৌথ্যবুগ আরম্ভ হইবার অনেক আগের কথা। বঙ্গের ভূমিগঠনে গঙ্গার অবদানই বেশী। অস্ত্রান্ত্র নদ-নদী এই সৃজনকার্যে সাহায্য করিয়াছে যাত্র। বঙ্গের কোন্ অংশ কোন্ সময় গঠিত হইয়াছে, তাহার কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। প্রাচীন বঙ্গের কোন ধারাবাহিক প্রামাণিক ভৌগোলিক ইতিবৃত্তও নাই। প্রাচীন অধর্কবেদে, জৈন গ্রন্থে, বৌদ্ধ গ্রন্থে, রামায়ণ মহাভারতে বঙ্গদেশের জনপদ ও নদ-নদীর বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ আছে। বঙ্গদেশের নির্ভরযোগ্য ভূগোল রচনার পক্ষে তাহা অত্যন্ত অপ্রচুর। গ্রীক ও লাতিন লেখকগণের বিবরণে বর্ণিত বঙ্গদেশের ভৌগোলিক নির্দেশ, টলেমীর মানচিত্র, পেরিপ্লাসগ্রন্থে নাবিকগণের বিবরণ প্রাচীন বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থা নির্ণয়ের অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য উপাদান। এই সব তথ্যও অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বিচার করিতে হইবে। প্রাচীন শিলালেখ ও তাম্রপট্টগুলিতে নগরী, গ্রাম, জনপদ, নদ-নদীর উল্লেখ আছে। ইহাদের ভৌগোলিক তাৎপর্য নির্ণয় করা কঠিন। সমসাময়িক কালের ও পরবর্তী কালের কাব্য-সাহিত্যে জনপদ, নগরী ও নদ-নদীর কাহিনী পাওয়া যায়। অলঙ্কার, অর্থগৌরব ও বন্ধাহীন কল্পনার অস্তুরাল হইতে তাহাদের প্রকৃত ভৌগোলিক তাৎপর্য উদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। তবু, আহরিত সমস্ত তথ্য বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে বিচার করিয়া যুক্তিগ্রাহ্য একটি রেখাচিত্র পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের প্রাক্-টলেমীয় ভৌগোলিক অবস্থার স্বাভাবিক পরিণতির আভাস টলেমীর মানচিত্রে আছে। টলেমী ও বর্তমান কালের মধ্যে রহিয়াছে প্রায় চুই হাজার বৎসরের ব্যবধান। চুই হাজার বৎসর পূর্বেরকার অবস্থা এখন নাই। যেখানে অহরহ ভূমির ভাঙ্গা গড়া চলিতেছে, সেখানে ভৌগোলিক অবস্থার ঘন ঘন পরিবর্তন অনিবার্য। অতএব চুই হাজার বৎসর পূর্বে টলেমীবর্ণিত গঙ্গার মোহনা যেখানে ছিল, আজ নিশ্চয়ই সেখানে নাই; থাকিতে পারে না। এই দীর্ঘকাল গঙ্গা ও তাহার বিভিন্ন শাখা নদ-নদীগুলি নীরব নিথর হইয়া থাকে নাই। চুই হাজার বৎসর ধরিয়াই গঙ্গাপ্রবাহ অবিরাম বহিয়া চলিয়াছে। নূতন ভূমি সৃষ্টির ফলে, টলেমীর আমলের মোহনা নবভূমির

অন্তরালে বিলুপ্ত; আর প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে গঙ্গাপ্রবাহ নূতন মোহনা সৃষ্টি করিয়া সাগরে পড়িয়াছে। স্মৃতরাং ক্যাম্বিসন, মেগা, কাষেরীথন, স্ময়েডোষ্টমন ও এ্যাটিবোল প্রমুখ টলেমীবর্ণিত পঞ্চ শাখা ও মোহনা গঙ্গার বর্তমান মোহনাসমূহের সহিত এক ও অভিন্ন হইতে পারে না। টলেমীর যুগে হাওড়া, হুগলী, চব্বিশপরগনা, ধুলনা ও বরিশাল জেলার বেশীর ভাগই ছিল না। নদীয়ার দক্ষিণ ভাগে, যশোহরের উত্তর ভাগে, এবং ফরিদপুর জেলার দক্ষিণভাগে সমুদ্রবেলাভূমি বিস্তৃত ছিল। স্মৃতরাং টলেমীর গঙ্গার পঞ্চ মোহনার সন্ধান এখানেই মিলিবে। অনেকে এ ভাবে চিন্তা করেন না। তাঁহারা স্রবণরেখামুখ বা কপিশামুখ বা হুগলীমুখ, রায়মঙ্গলমুখ, হরিণবাটামুখ, মেঘনামুখ, বুড়ীগঙ্গামুখকেই টলেমীর পঞ্চ মোহনা মনে করিয়া থাকেন। ইহা নিছক কল্পনা মাত্র। ভূতত্ত্বের দিক্ হইতে এই প্রস্তাব একেবারেই অবৈজ্ঞানিক, স্মৃতরাং একান্ত অচল। তাহা ছাড়া কিছু দিন পূর্বেও বঙ্গদেশের উপকূলভাগ এইরূপ ছিল না। মুসলমান যুগের বহু পুঁথিতে—ঐতিহাসিক বিবরণ, বিদেশী পর্যটকের ভ্রমণকাহিনী ও ইউরোপীয় বণিক ও নাবিকের বিবরণ ও মানচিত্রের বঙ্গদেশের সহিত বর্তমান কালের বঙ্গদেশের মৌলিক পার্থক্য দেখা যায়। পঞ্চদশ ষোড়শ শতাব্দীর উপকূলরেখা হইতে এখনকার উপকূল অনেক দক্ষিণে সরিয়া গিয়াছে। ভাগীরথীই গঙ্গার প্রধান প্রবাহ এবং টলেমীর ক্যাম্বিসন, ইহাই প্রচলিত ধারণা। অনেক ঐতিহাসিক এইরূপ ধারণা পোষণ করেন। প্রমাণ-পঞ্জীকেও এই ধারণাকে ঐতিহাসিক রূপ দিবার জন্ত বিলুপ্ত করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন, ভাগীরথী তথা গঙ্গার প্রধান প্রবাহ অধুনালুপ্ত সরস্বতীখাত দিয়া প্রবাহিত হইয়া, রূপনারায়ণ ও কপিশার জলধারা লইয়া স্রবণরেখার মুখে গিয়া পড়িত। মতান্তরে কপিশামুখে ভাগীরথীর সাগরসন্নিহন হইত। এই প্রবাহ ও মোহনাই টলেমীর ক্যাম্বিসন। এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নহে। প্রথমতঃ সরস্বতীখাত টলেমীর যুগে ছিল না। ঐ সময়ে ইহা ছিল সাগর। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের পূর্বপ্রান্তে সাগর নবদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দ্বিতীয়তঃ এই প্রস্তাব বিজ্ঞানসম্মত নহে। যদি তর্কের খাতিরে মানিয়া লওয়া হয় যে, সরস্বতী-খাত ছিল, তাহা হইলে ভাগীরথীর স্রবণরেখা পর্যন্ত প্রবাহিত হওয়া সম্ভব নহে। স্রবণরেখা-প্রবাহ পুরাতন ভূমির উপর দিয়া প্রসারিত; সরস্বতীর অববাহিকা অঞ্চল নব-ভূমি, নিম্নভূমি। নদীপ্রবাহ নিম্নভূমি হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ভূমিতে প্রবাহিত হয় না। পূর্বেই বলা হইয়াছে, প্রাক-টলেমী যুগে সাগর অনেক অভ্যন্তরে অগ্রপ্রবিষ্ট ছিল। টলেমীর যুগে সাগর সঙ্কুচিত হইয়া দক্ষিণে সরিয়া আসিয়াছে। মুর্শিদাবাদ জেলার পূর্বাঞ্চল দিয়া গঙ্গা হইতে উৎসারিত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী দেখা যায়। তাহারই পশ্চিমতম প্রবাহটি সোজা দক্ষিণে আসিয়া মিলিত হয় জলঙ্গীর সঙ্গে। এই মিলিত প্রবাহই ক্যাম্বিসন। এখনকার নবদ্বীপের নিকট তাহা সাগরে মিশিত। মাধান্তাঙ্গা-ইছামতীপ্রবাহ ও মোহনাকে টলেমী “মেগা” অভিধায় অভিহিত করিয়াছেন। কপিলমুনি পাইকগাছা,—যশোহর জেলার গ্রামবিশেষ—বোধ হয়, “মেগা-সঙ্গমে”র ক্ষীণ স্মৃতি বহন করিতেছে। কুমার বা কোয়ারক

প্রবাহ ও মোহনা টলেমীর মানচিত্রে “কাথেরীথন” পরিচিতি লাভ করিয়াছে। আধুনিক খুলনা নগরীর উপরে কোমারক মোহনা ছিল। পদ্মা হইতে উৎসারিত আড়িম্বলখা নদীর প্রবাহ ও মোহনাই “সুয়েডোষ্টন”। পদ্মা-প্রবাহ ও মোহনাকে টলেমী এ্যাটিবোল বলিয়াছেন। পদ্মার প্রবাহ টলেমীর যুগে এইরূপ ছিল না; এমন কি, দেড় শত বৎসর পূর্বেও তাহার নিম্নপ্রবাহ অল্পরূপ ছিল। বর্তমান খাত হইতে আরও পশ্চিমে ফরিদপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া যেহেদীগঞ্জের নিকট ব্রহ্মপুত্রের মোহনার সাগরে পড়িত। ব্রহ্মপুত্রের চূর্বীর প্রবাহ পদ্মার প্রবাহকে ঠেলিয়া উজান বহাইত বলিয়াই বোধ হয়, টলেমী গঙ্গার এই মোহনাকে এ্যাটিবোল (thrown back) বলিয়াছেন। মৌর্য ও মৌর্যপূর্বকালের ভৌগোলিক অবস্থার ক্রমপরিণতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া টলেমীযুগের বঙ্গদেশের ভৌগোলিক অবস্থার সম্ভাব্য চিত্র অঙ্কিত করা গেল।

টলেমীর যুগের বঙ্গদেশ



গঙ্গারিডি গ্রীক ও লাতিন লেখকগণের বর্ণিত গঙ্গার অববাহিকা অঞ্চলের জন ও জনপদের নাম। গঙ্গারিডি বোধ হয় “গঙ্গা-হৃদয়ী”র গ্রীক রূপ। গঙ্গাহৃদয়-বিষুত বা গঙ্গা-প্রবাহ যে দেশের হৃদয়-স্বরূপ, এমন অঞ্চলকেই গঙ্গাহৃদয়ী বলা যায়। গঙ্গার শাখা-প্রশাখা এই জনপদের প্রাণপ্রবাহ। এই জনপদের উত্তর প্রান্তে ও মধ্যভাগে গঙ্গার বিভিন্ন শাখা প্রবাহিত ছিল। হেরোডটাস গঙ্গাকে গঙ্গারিডির পূর্বপ্রান্তবাহী বলিতেছেন। ডিওডোরসের

উক্তি : “This river (Ganges) which is 80 stades in width flows from north to south and empties into the ocean forming the boundry towards the east of the tribe of the Gangaridae...”ও কোন স্থাপ্ত নির্দেশ দেয় না। সুতবাং অনেকেই ভাগীরথী প্রবাহকেই গঙ্গা মনে করেন। তাঁহাদের মতে গোটা পশ্চিমবঙ্গটাই গঙ্গারিডি। ডিওডোরসের পরবর্তী উক্তি কিন্তু অস্পষ্টতা রাখে নাই। “...This region is separated from Further India by the greatest river in those parts, for it has a breadth of 80 stades but it adjoins the rest of India which Alexander had conquered”—ডিওডোরসের এই উক্তি গঙ্গা প্রবাহকেই বুঝাইতেছে। এই প্রবাহ এক দিকে Further India,—অর্থাৎ পেরিপ্লাসের Chryse ও গঙ্গারিডিকে বিষুস্ত করিতেছে; অপর দিকে আলেকজান্ডার কর্তৃক বিজিত উত্তরভারতের সহিত গঙ্গারিডির যোগাযোগ অব্যাহত করিতেছে। গঙ্গা-পদ্মা প্রবাহই গঙ্গারিডির পূর্বসীমা। টলেমীর ভূগোলে ক্যাসিনন গঙ্গারিডির পশ্চিমপ্রান্তশায়ী। যুশিদাবাদ জেলার লালবাগ মহকুমা, নবদ্বীপ জেলার উত্তর অংশ, যশোহর জেলার উত্তর ভাগ, করিমপুর জেলা ও ঢাকা জেলার পশ্চিম ভাগ, রাজসাহী ও মালদহ জেলা লইয়া গঠিত বিস্তৃত অঞ্চলই প্রাচীন কালের গ্রীক ও লাতিন ইতিহাসকারগণ-বর্ণিত গঙ্গারিডি। মেগাস্থিনিসের বিবরণে ইঙ্গিত আছে যে, গঙ্গা গঙ্গারিডির মধ্য দিয়াই সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছে। টলেমীর মানচিত্রেও তাহার সমর্থন রহিয়াছে।

গঙ্গাহ্রদবাসী জন বহুজন। গ্রীক ও লাতিন ভৌগোলিকগণ কোম বা জনের নাম উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা নদীর নামেই জনপদ ও জনের পরিচিতি দিয়াছেন। বেশীর ভাগ লেখকেরই এই জন ও জনপদের সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না।

পেরিপ্লাসের গ্রন্থে বঙ্গদেশের উপকূলরেখা, গঙ্গার মোহনা ও গঙ্গানদীপ্রবাহের উপর অবস্থিত গঙ্গাবন্দরের উল্লেখ আছে। পেরিপ্লাসের বিবরণে গঙ্গার প্রধান মোহনার সন্ধান পাওয়া যায়। তাঁহার গ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হইল :

“After these, the course turns towards the east again, and sailing with the ocean to the right and the shore remaining beyond to the left, the Ganges comes into view, and near it the very last land toward the east, Chryse. There is a river near it called the Ganges, and it rises and falls in the same way as the Nile. On its bank is a market-town which has the same name as the river, Ganges. Through this place are brought malabathrum and Gangetic spikenard and pearls, and muslins of finest sorts, which are called Gangetic.”

পশ্চিমবঙ্গের উপকূল গরিয়া পেরিপ্লাস অঞ্চল হইতেছিলেন। বঙ্গদেশের দীর্ঘ উপকূল অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা আজ বাহা আছে, টলেমী ও পেরিপ্লাসের আমলেও তেমন ছিল

অন্বেষণ করিলে,—পেরিপ্লাস পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ উপকূল ধরিয়াই অগ্রসর হইয়াছিলেন, যানিয়া লইতে হইবে। আর হগলী মোহনায়ই তাঁহার গঙ্গাদর্শন লাভ হইয়াছিল, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। পেরিপ্লাসের গঙ্গাপ্রবাহ ও বন্দরের পথনির্দেশ স্পষ্টভাবে এই অন্বেষণকে অসম্ভব করিয়াছে। হগলী মোহনায় গঙ্গার দর্শন সম্ভব হইলে, গঙ্গানদীতে পড়িতে হইলে জাহাজকে উত্তরাভিমুখী হইতে হইত। তাহা সম্ভব নয়। উপকূল ধরিয়া জাহাজ উত্তরাভিমুখী চলিলেই তাঁহার পক্ষে পূর্বদিকে গতি ফিরানো সম্ভব। তাহা হইলেই পূর্বাভিমুখী জাহাজের বাম দিকে থাকে বিলীম্যান তটরেখা, আর দক্ষিণে থাকে ~~অ~~বিশি-
বিস্তার। এই ভাবে চলিবার পরই গঙ্গামোহনার সাক্ষাৎ লাভ হয়। পেরিপ্লাসের গঙ্গা, গঙ্গার দক্ষিণপূর্বাভিমুখী প্রবাহকেই বুঝাইতেছে। এই শাখার তীরেই গঙ্গাবন্দর। টলেমীর মানচিত্রে গঙ্গাবন্দর Kambhenikon শাখার উপরে দেখান হইয়াছে। পেরিপ্লাসের বিবরণে ইহারই সমর্থন রহিয়াছে।

পেরিপ্লাস গঙ্গার এই শাখার পূর্ব দিকে বিস্তৃত অঞ্চলকে Chryse বলিতেছেন। টলেমিও গঙ্গার পঞ্চমোহনাবিশ্রুত গঙ্গারিডি বা গঙ্গাছদির পূর্বশাখী অঞ্চলকেও Chryse নামে অভিহিত করিতেছেন। Chryse অর্থ স্তব্ধভূমি। এই অঞ্চলে প্রচুর স্তব্ধ আমদানী হইত বা পাওয়া যাইত, কিম্বা ব্যবসায়ী গ্রীক বণিক ও নাবিকেরা আশাতীত লাভ অর্জন করিতে পারিত বলিয়া এই বিস্তৃত অঞ্চল গ্রীকগণের নিকট ছিল স্বর্ণপ্রসূ দেশ। এখনও ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জ মহকুমার ব্রহ্মপুত্রের নিম্নপ্রবাহের উত্তর তীরের বিস্তৃত অববাহিকা অঞ্চলকে সোনারগাঁ পরগণা বলে। সেন-আধিপত্যের অবসানের অব্যবহিত পরে সোনারগাঁ একটা স্বাধীন রাজ্য ছিল। সুলতানী আমলেও সোনারগাঁ সমৃদ্ধিশালী রাজ্যরূপে অনেক দিন বর্তমান ছিল। সোনাকান্দা-বন্দর সোনারগাঁর পশ্চিম প্রান্তসংলগ্ন। বিক্রমপুরে ও ফরিদপুরে স্বর্ণপ্রসূ, স্তব্ধভূমির প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। এই সব অঞ্চলে নদী-বাহিত পলিতে প্রচুর স্বর্ণকণা পাওয়া যাইত। এই অঞ্চলের প্রাচীন নাম যাহাই থাকুক না কেন, ইহাকে গ্রীক ও পরবর্তী কালের নাবিক ও বণিকেরা স্বর্ণভূমিই বলিত; বিদেশীদের প্রদত্ত নাম দেশীয়গণের নিকট অপ্রাচীন মনে হয় নাই। পেরিপ্লাসের বিবরণ অনুসরণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্তী ঢাকা ও ফরিদপুর জেলার সাগরশাখী অংশই Chryse বা স্তব্ধভূমি।

তিরুমলয়-লিপি আর একটি প্রশ্ন তুলিয়াছে। দক্ষিণরাঢ় ও উত্তররাঢ় জয়ের মাঝখানে চোলরাজের বঙ্গালদের সহিত লড়াই হয়। এই লড়াই কোথায় হয়? দক্ষিণ ও উত্তর-রাঢ়ের মধ্যবর্তী কোন অঞ্চল কি বঙ্গালরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল? না, দক্ষিণরাঢ় জয় করিবার পর চোলরাজ সাগর অতিক্রম করিয়া বঙ্গাল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন? দক্ষিণ-রাঢ়ের পরাজিত শত্রু ও স্বেয়োগ-সঙ্কানরত উত্তররাঢ়ের পাল-সম্রাটকে পার্শ্বে রাখিয়া চোলরাজ নিশ্চয়ই সাগর অতিক্রম করিবার প্রয়াস করেন নাই। তম্রলুক হগলী হাওড়া তখন বীপরূপে সবে মাত্র উৎখিত হইয়াছে। রূপনারায়ণ ও দামোদর-মোহনার বিরাট

দ্বীপাঞ্চল বঙ্গালদেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল, ইহাই অস্বীকৃত হয়। এই অস্বীকারের সমর্থন রহিয়াছে লক্ষ্মণসেনের পোবিষ্কপুর-পট্টোলিতে। তাম্রপট্টোলিতে উল্লিখিত বেতস্তচতুরক আধুনিক বেতড়। বেতড় হাওড়া জেলার দক্ষিণে অবস্থিত। লক্ষ্মণসেনের আমলে হাওড়া ও হুগলীকে পশ্চিমখাটিকা বলা হইতেছে। মোহনামুগে পলিমাটিগঠিত দ্বীপসমূহ আকারে বাড়িয়া পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইতেছিল। দ্বীপমধ্যবর্তী সাগরবাহু সঙ্কুচিত হইয়া খাড়িতে পরিণত হইবার ফলে, তাহাদের সহিত মূল ভূখণ্ডের দূরত্বও কমিতেছিল। বিস্তীর্ণ খাড়ি অঞ্চলের যে অংশ পশ্চিমবঙ্গের উপকূলের নিকটবর্তী ছিল, তাহা সেন-আমলে বর্ধমান-ভুক্তির অন্তর্ভুক্ত হইল। আর পূর্বাঙ্গ পৌণ্ড্রবর্ধনভুক্তির অঙ্গীভূত হইয়াছিল। সেন-আমলের শেষ দিকে এই ভাবে বিস্তীর্ণ খাড়ি অঞ্চল মূল ভূখণ্ডের রূপ পরিগ্রহ করিবার ফলে, সাগরবাহু সঙ্কুচিত হইয়া গেল; আর সাগরের সঙ্কুচিত খাতপথে গঙ্গার kambyson খাণ্ডা, বাহা সেন-আমলে ভাগীরথী গঙ্গা—দীর্ঘায়িত হইয়া ত্রিবেণীর নিকট দ্বিখা বিভক্ত হইয়া হুগলী ও যমুনাধাতে প্রবাহিত হইল। কিছু দিন পর, সম্ভবত দিল্লীতে মুলতানি সুলতান হইবার পূর্বে, হুগলীপ্রবাহ পশ্চিমখাটিকা ও মূল ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী প্রশস্ত খাড়িপথে সাগরবাহু করিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও হুগলীপ্রবাহ অব্যাহত ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের অর্ধাং রাঢ় ও সুরঙ্গের পূর্বপ্রান্তে সমুদ্রের অবস্থিতি ছিল দেখান হইয়াছে। টলেমীর বহু পরে রাঢ়ের পূর্বপ্রান্তীয় সাগরের পরোক্ষ উল্লেখ কাব্য-সাহিত্যে ও তাম্রপট্টোলিতে আছে। মহাত্মারতে সুলতান ও অস্ত্রাঙ্গ সুলতানগণকে সমুদ্রতীরবাসী বলা হইয়াছে। রঘুবংশেও সুলতানগণের সমুদ্রতীরে বাসের ইঙ্গিতই স্পষ্ট। হারহা-তাম্রশাসনে গোড়গণের সমুদ্রতীরে আশ্রয় লইবার কথা আছে। গোড়রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া গোড়েরা গঙ্গার বদীপে আশ্রয় লইয়া থাকিবে। বোধ হয়, মুর্শিদাবাদ জেলার অংশবিশেষই তাহাদের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল। ধর্মপালের খালিমপুর-শাসনে স্থালীকটবিষয়ের সহিত যুক্ত ব্যাভ্রভট্টী মণ্ডলের উল্লেখ আছে। কালনা মহকুমার পূর্বস্থলীর স্থালীকটের স্থিতি বহন করা অসম্ভব নহে। স্থালী বা স্থলী পাল-আমলে একটা বড় শাসনবিভাগ ছিল; পরবর্তী কালে ইহার রাষ্ট্রিক মর্যাদা থাকে নাই। ইহার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন অধিকার সহিত যুক্ত হইয়া যায়। যথা, পূর্বস্থলী ব্রহ্মস্থলী ইত্যাদি। এই স্থালী অঞ্চলের সাগরশায়ী অংশের নামই বোধ হয় খালিমপুর-শাসনের ব্যাভ্রভট্টী। তিরুমলয়লিপি রাজেন্দ্র চোলের অভিযানের বিবরণ দিয়াছে। দণ্ডভুক্তি ও দক্ষিণরাঢ় জয় করিয়া রাজেন্দ্র চোল বঙ্গরাজ্যের সহিত লড়াই করেন। পরে তিনি উত্তররাঢ়ে উপস্থিত হইলেন। উত্তররাঢ়কে তিরুমলয়-লিপিতে সমুদ্রতীরবর্তী দেশ বলা হইয়াছে। কেহ কেহ উত্তররাঢ়কে সমুদ্রতীরশায়ী দেখাইবার জন্য উত্তররাঢ়কে দক্ষিণে প্রসারিত করিয়া সমুদ্র পর্যন্ত ঠেলিয়া লইয়া গিয়াছেন। দক্ষিণরাঢ়ের কথা তখন তাহাদের মনেও ছিল না। কিন্তু তাহা ত নয়। তিরুমলয়লিপি দক্ষিণরাঢ়ের স্পষ্ট উল্লেখ করিয়াছে। দামোদর-প্রবাহোত্তর রাঢ়ই উত্তররাঢ়; কালনা মহকুমাও তাহার অন্তর্গত।

কালনার পূর্বপ্রান্তেই সাগর ছিল। ইহাই তিরুমলয়মিণির ভৌগোলিক নির্দেশ। দেখা যাইতেছে, একাদশ শতাব্দীর সূচনাতেও সাগর কালনা নবদ্বীপ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। সুতরাং টলেমীর যুগে গঙ্গা-ভাগীরথীপ্রবাহের সরস্বতীধাতে প্রবাহিত হইয়া সুবর্ণরেখা-মুখে সাগর-স্রোত একটা উদ্ভট কল্পনামাত্র।

সেন-আমল আরম্ভ হইবার সময়ও গঙ্গাভাগীরথীপ্রবাহ হুগলীধাতে প্রবাহিত হয় নাই। বিজয়সেনের ব্যারাকপুর-পট্টোলিতে ইহারই স্পষ্ট নির্দেশ আছে। এই পট্টোলিতে উল্লিখিত “ঘাসিসন্তোগভট্টবাড়” গ্রামকে অনেকেই “ভাটপাড়া” মনে করেন। ভাটপাড়া নৈহাটির নিকট গঙ্গা-ভাগীরথীর তীরে অবস্থিত। কিন্তু বিজয়সেনের আমলে ভাটপাড়া (যদি ঘাসিসন্তোগভট্টবাড় ও ভাটপাড়া অভিন্ন মনে করা হয়) ‘বিখণ্ড’ নামক নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। সুতরাং হুগলী-প্রবাহের এই অংশে যদি ভাগীরথী-প্রবাহ প্রবাহিত হইত, তাহা হইলে সে কথা উল্লেখ করা হইত। গোবিন্দপুর-পট্টোলিতে বেতড়ের পূর্বপ্রান্তবাহী প্রবাহকে জাহ্নবী বলা হইয়াছে। ইহা একটি খাড়িবিষেব। যদি ইহা গঙ্গার প্রবাহ বহন করিত, তাহা হইলে তাহার উল্লেখ থাকিত। অতএব অস্বতঃ বিজয়সেনের আমলে হুগলীধাতে গঙ্গার কোন শাখা যে প্রবাহিত হইত না, ইহা নিঃসংশয়ে বলা যায়।

ভাগীরথী গঙ্গার প্রধান প্রবাহ। চল, ইহা প্রমাণ করিবার অতিরিক্ত আগ্রহ অনেকেই দেখাইয়া থাকেন। কিন্তু সেন-আমলের অবসান ও মুসলমান আমলের আরম্ভে গঙ্গার মোহনা দক্ষিণে সরিয়া যায়। জিবেণীর নিকট গঙ্গার সমুদ্রসঙ্গম ঘটিত, ইহাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে দেখান হইয়াছে। জিবেণী পর্যন্ত গঙ্গা-প্রবাহের আগমন ধোয়ীর পবনদ্রুত কাব্যে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সময়েই ভাগীরথী প্রশস্ততর নদীরূপে ও গঙ্গার শাখারূপে আত্মপ্রকাশ করে। নদীয়ার নিকট গঙ্গার অন্ততম প্রধান শাখা ক্যান্ডিসন, আধুনিক জলদীর সহিত মিলিত হয়। মিলিত প্রবাহ ভাগীরথী-গঙ্গা নামে প্রবাহিত হইতে থাকে। ইহার পূর্বে ভাগীরথী ক্ষীণকায় গঙ্গার ক্ষুদ্রতম একটি শাখামাত্র ছিল। জয়নাপের বঙ্গবোধবাট-তাম্রশাসনে, ধর্মপালের তাম্রপট্টোলি ও লক্ষণসেনের শক্তিপুর-শাসনে উল্লিখিত গাঙ্গিনিকা এই বর্তমান কালের ভাগীরথীর প্রাচীন রূপ। লক্ষণসেনের রাজত্বকালে রাঢ় অঞ্চলের জলের অভাব দূর করিবার প্রয়োজনে গঙ্গার জলধারা অধিক পরিমাণে গাঙ্গিনিকা ধাতে প্রবাহিত করা হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার যে অঞ্চল দিয়া গাঙ্গিনিকা প্রবাহিত ছিল, তাহার নাম শক্তিপুর-পট্টোলিতে বাগরী-খণ্ড। বাগরী কোম অধ্যুষিত জনপদের মধ্য দিয়া গাঙ্গিনিকা বহিত বলিয়া, ইহার দেশজ নাম হয়, ত ছিল বাগরী-তি। ০ তি অনার্থ্য শব্দ,—অর্থ নদী। বাগরী-তির সংস্কৃত রূপই ভাগীরথী। গঙ্গার প্রবাহ নবধনিত গাঙ্গিনিকাধাতে বহিতে লাগিল। ইহাই গঙ্গার প্রধান শাখারূপে পরিচিত হইল। এই সময়ে জলদীধাত ক্ষীণতর হইয়া পড়িয়াছিল। বাগরী-তি বা ভাগীরথীই প্রবলতর হইয়া জলদীপ্রবাহ আত্মসাৎ করিয়া সাগরস্রোত আরম্ভ করিল। বাগরী জনপদ হইতে ধনিত গাঙ্গিনিকার যেমন ভাগীরথী নামকরণ

হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তেমন রাজা বা রাজকর্মচারী বা পূর্বকবিশারদ শিল্পী (engineer), বাহার নামকসে বিরাট খননকর্ম সমাধা হইয়াছে, তাহার নামেও ভাগীরথীর পরিচিতি হওয়া অসম্ভব নহে। মোট কথা, ভাগীরথীপ্রবাহ স্থল্লির মূলে রহিয়াছে মাহুঘের প্রতিভা।

প্রাচীন বঙ্গদেশের গঙ্গাপ্রবাহ ও জনপদসমূহের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত রচনা একটি হুম্মহ ব্যাপার। ইহাতে প্রাচীন ও আধুনিক প্রমাণপঞ্জীর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। কল্পনার আশ্রয়ও মাঝে মাঝে লইতে হয়। কিন্তু অব্যোক্তিক কল্পনার অবশ্য কোন মূল্য নাই। গঙ্গাপ্রবাহের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার প্রবাহ-ধাত ও গতি নির্ধারণ করিতে গিয়া কোন বিশেষ মতকে রূপ দিবার চেষ্টা অবাহিত। গঙ্গার প্রধান প্রবাহ যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়াই প্রবাহিত ছিল, এবং এই প্রবাহই যে ভাগীরথী, ইহা ধরিয়া লইয়া অনেকে প্রমাণপঞ্জী নিজ নিজ মতের সমর্থনে সাজাইয়া ধরিয়াছেন। ভাগীরথীকে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত করাইয়া গঙ্গারিডি বা গঙ্গারদিকে ঠেলিয়া রাঢ়ে লইয়া যাওয়া সহজ। ভাগীরথীই ত টলেমীর ক্যাম্বিসন, ইহাই তাহাদের মত। রাজমহল-শৈলমালার পাদদেশ হইতে দক্ষিণে প্রসারিত পার্বত্য ভূমির তলদেশ দিয়া দক্ষিণে বিস্তৃত বিল বিল নালা কাহারও মতে প্রাচীন ভাগীরথীর প্রবাহধাত। বিল-বিল-নালা দেখিলেই তাহাকে কোন নদীর পরিত্যক্ত ধাত, ক্ষয় নব-ভূমির ক্ষেত্রেই বলা বাইতে পারে। কিন্তু ভাগীরথীর পক্ষে নিম্নভূমি হইতে উচ্চতর মালভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত হওয়া ভূবিজ্ঞানের দ্বিচ্ছিন্ন একেবারেই অসম্ভব। গঙ্গার ধাত হইতে ভাগীরথীর উৎসমুখ অনেক উচ্চ। একমাত্র বর্ষাকালে যখন গঙ্গার প্রবাহ ফুলিয়া ফাঁপিয়া চুই কুল ভাসাইয়া দেয়, শুধু তখনই ভাগীরথীধাতে সামান্য জল প্রবেশ করে। সুশীতাবাহ জেলার ভূমি পুরাভূমি,—গৈরিক পার্বত্য ভূমি। আর গঙ্গা প্রবাহিত কোমল মো-ঐশলা নবভূমির উপর দিয়া। নদীপ্রবাহ প্রাকৃতিক নিয়মে নিম্নভূমির উপর দিয়া ধাত রচনা করে। বর্ষায় প্লাবিত গঙ্গার জলরাশির কিছু অংশ স্থিতি-জলীপুরের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইত। বর্ষার অবসানে ইহার শুষ্ক ধাত হইত গাঙ্গিনিকা। ইহাই ত স্বাভাবিক।

ভাগীরথী, গঙ্গার প্রাচীনতম ও প্রধানতম প্রবাহ। এই জন্ত গঙ্গার মাহাত্ম্যের অধিকারিণী, ইহাও স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া অনেকে মনে করেন। পদ্মা বা পদ্মাবতী গঙ্গার অর্ধাচীন শাখা,—এই কারণে তাহার কোন মাহাত্ম্য নাই, ঐতিহ্যও নাই, এই ধারণাও কোন ঐতিহাসিক মূল্য নাই। টলেমী যুগের ও প্রাচীন বঙ্গদেশের গঙ্গাপ্রবাহ ও জনপদসমূহের ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত রচনা একটি হুম্মহ ব্যাপার। প্রাচীন ও আধুনিক কালের তথ্যের অস্পষ্টতার দরুন কল্পনার আশ্রয় লওয়া অপরিহার্য হইয়া পড়ে। কিন্তু কল্পনা যুক্তিকে অহুসরণ করিবে। বিশেষ মতকে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্ত কল্পনাকে নিয়োগ করা অবাহিত। গঙ্গার প্রধান প্রবাহ যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্য দিয়া প্রবাহিত ছিল এবং এই প্রবাহই যে ভাগীরথী, ইহা ধরিয়া লইয়া প্রমাণপঞ্জী বিজ্ঞাস করিয়া অনেকেই নিজ নিজ মত

প্রতিষ্ঠা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। গঙ্গারিডি এই প্রবাহের পশ্চিমে অবস্থিত, ইহাই তাঁহাদের মত। কেহ কেহ রাজমহল-শৈলমালার পাদদেশ হইতে দক্ষিণে প্রসারিত পার্বত্য ভূমির তলদেশ দিয়া দক্ষিণে বিস্তৃত ঝিল-ঝিল-নালাকে ভাগীরথীর প্রাচীনতম খাত বলিয়াছেন। এই প্রস্তাব অবাস্তব ও ভূবিজ্ঞানবিরোধী। গঙ্গার খাত হইতে ভাগীরথীর উৎসমুখ অনেক উচ্চ। বর্ষাসমাপ্তমে গঙ্গার জল কুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিলেই ভাগীরথীখাতে জল প্রবেশ করে। গঙ্গা নরম ও নমনীয় ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া গঙ্গার পুরাভূমির উপর দিয়া প্রসারিত হওয়া অসম্ভব। গঙ্গার এই শাখা প্রাচীন কাল হইতে জলীপূরের উচ্চ গৈরিক পুরাভূমির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মক্জনদীর মত শুষ্ক হইয়া গিয়াছে।

ভাগীরথী গঙ্গার ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্য দখল করিয়া লইয়াছে। ইহা অনেকটা জ্বর-দখল। গঙ্গার ঐতিহ্য ও মাহাত্ম্যের উদ্ভাষিকার গঙ্গার সকল শাখাই সমান প্রাপ্য। যদি বলা হয়—ভাগীরথী প্রাচীন, এই কারণে সবটুকু মাহাত্ম্যই তাহার; তাহা হইলে বলিব, ভাগীরথী প্রাচীনতম খাত নহে, বরঞ্চ অর্ধাচীন। ইহা প্রধান প্রবাহও নহে। পদ্মা-কাশেরীখনই প্রধান শাখা। কি করিয়া ভাগীরথী অর্ধাচীন হইয়াও, অপর সকল শাখাকে বঞ্চিত করিয়া, গঙ্গার সবটুকু মাহাত্ম্য আত্মসাৎ করিল? টলেমী ও পেরিপ্লাসের মতে পদ্মা-কাশেরীখন গঙ্গার প্রধান প্রবাহ, তীর্থমহিমা প্রাপ্য ইহারই। প্রবাদ আছে : মাহুঘের মুখেই জন্ম, মাহুঘের মুখেই ক্ষয়। পাল-আমল ছিল বঙ্গদেশে বৌদ্ধ যুগের আমল। বৌদ্ধ যুগে হিন্দু ছিল; কিন্তু তাহারা ছিল মুষ্টিমেয় ও নির্জীব। বৌদ্ধদেশ দিয়া প্রবাহিত গঙ্গার মাহাত্ম্য লইয়া বৌদ্ধরা মোটেই মাথা ঘামাইত না। পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধপ্রভাব অপেক্ষাকৃত কম ছিল। দক্ষিণ হইতে বিভিন্ন আক্রমণকারীর সহিত অনেক হিন্দু আসিয়া রাঢ়ে রহিয়া গেল। সেন-রাজারা ছিলেন গৌড়া হিন্দু। তাঁহাদের পূর্বের শূর-রাজারা হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন চাহিয়াছিলেন। শূর ও সেন-রাজারা পশ্চিমবঙ্গে ধর্মবিপ্লবের সূচনা করিলেন। সাম্রিক ব্রাহ্মণ আনয়নের কাহিনী, বজ্রালী কোলীভের গল্পকথা, আর লক্ষ্মণসেনের বৈষ্ণবধর্মসম্পর্কিত আগ্রহ এই বিপ্লবের ইঙ্গিতই জানায়। হিন্দুধর্মের প্রতি সকলকে, বিশেষ করিয়া বৌদ্ধগণকে আকৃষ্ট করিবার জন্ত নতন করিয়া ধর্মকাহিনী রচিত হইতে লাগিল। নবধনিত ভাগীরথীখাতে গঙ্গাকে অল্পপ্রবিষ্ট করিয়া গঙ্গার সমস্ত মাহাত্ম্য ভাগীরথীর উপর আরোপ করা হইল। গঙ্গা-দ্বান সকল ক্রিয়াকাণ্ডের অঙ্গীভূত হইল। গঙ্গা-স্নানের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার কারণ, অর্ধাচীন-খাতকে পবিত্রতম বলিয়া গ্রহণ করাইবার প্রচেষ্টা। ব্যারাকপুর ও গোবিন্দপুর-পট্টোলি হইতে জানা গিয়াছে, ষাটশ শতাব্দীর ভাটপাড়া হইতে বেতড় পর্যন্ত গঙ্গা ভাগীরথী ছিল না। ভাটপাড়ায় “তিথণ্ড,” আর বেতড়ে জাহ্নবী। জাহ্নবীকে মোটেই পবিত্র বলা হয় নাই। এই প্রবাহের উপর কোন গুরুত্বই দেওয়া হয় নাই। ভাগীরথী গঙ্গার প্রশস্তি ধোয়ীর কাব্যেই প্রথম পাওয়া গেল। এই সময়ে গাঙ্গিনীকা ভাগীরথী হইয়াছে। বৌদ্ধসম্পর্কে পদ্মা তখন অপাতঙ্গম। হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি পুনরুজ্জীবনের কালে, রাঢ় অঞ্চলে নব-হিন্দুধর্মের প্রাধান্য আসায় অর্ধাচীন ভাগীরথীর মাহাত্ম্য লোকমুখে স্তীত হইতে লাগিল। সেন-আমলে সংস্কৃতির কেন্দ্র বঙ্গ হইতে রাঢ়ে স্থানান্তরিত হইল।

এই প্রবন্ধে শুধু ভাগীরথীপ্রবাহের ইতিবৃত্ত আলোচিত হইল। অজ্ঞাত প্রবাহপথের আলোচনা সমসাময়িকের করার ইচ্ছা রহিল।

বাংলা ভাষায় ‘বিভাসুন্দর’ কাব্য

অধ্যাপক শ্রীত্রিদিবনাথ রায়

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

৪। বিভাসুন্দরের দশন ও সমাগম সম্বন্ধে পরামর্শ

ক। বিভা কতৃক মালিনীকে বিনয়।

আলোচ্য কাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম কাব্য গোবিন্দদাসের বিভাসুন্দরে লিখিত আছে, মালিনী সুন্দর কতৃক রচিত মালা বিভাকে উপহার দিলে, বিভা যখন মালা লইয়া হরগোরীর পাদপদ্মে উপহার দিলেন, তখনই যেন দৈব বলে মালার রচক সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ হইল—

“দণ্ডবৎ করি কস্তা রহিল ঐমনে।

লজ্জায় উঠিয়া বৈসে চাহে সখি পানে ॥

কহ গো কহ গো (তুমি) তন মালিন্যানী।

এ ফুল গাঁথিলা কে বা কহ দেখি তুনি ॥”

মালিনী কহিল যে, সুন্দর নামে তাহার এক বৃহিনীনন্দন তাহার গৃহে আসিয়াছে; সেই এই মালা গাঁথিয়াছে। বিভা তাহার কথায় বিশ্বাস করিলেন না। তখন সে স্বীকার করিল—

“মাল্যানী বলেন কস্তা মোর কিবা ওর।

সার্থক পুঞ্জিলা তুমি ভবানীশ্বর ॥

কত কাল ছিল কস্তা তোমার আরাধনা।

যে কারণে পাইলা বর মনের বাসনা ॥

যেন রূপ তেন গুণ বিভার নাহি অন্ত।

ধর্ম্মেতে ধার্মিক বড় অতি গুণবন্ত ॥

মরেছিল মালক মোর এ বারো বৎসর।

কুমারের অহুতাবে ফুটিল সম্বর ॥

তুচ্ছ কাষ্ঠ মঞ্জরিল দেখি চিত্রময়।

মাহুকের শক্তি কস্তা যেমত কতু নয় ॥

মরিলে জীয়াতে পারে হারালে পারে দিতে।

কুমারের গুণ ধর্ম না পারি বলিতে ॥”

এই সব কথা শুনিয়া যখন বিভার অঙ্গ অবশ হইল, তখন তাঁহার সখী তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া মালিনীকে জিজ্ঞাসা করিল, কিরূপে তাহার সহিত কথাবার্তা ও দেখাওনা

হইতে পারে। মালিনী তাহার কোন সম্বন্ধি দিতে না পারায় চিত্তরেখা তাহাকে এই পরামর্শ দিল—

“ফুলের দোলা দেহ গিয়া মহাপ্রভুর তরে ।

সদীত বেড়াও তুমি নগরে নগরে ॥

এই চিহ্ন থাকে যেন কুমার হৃদয় ।

শস্য ঘণ্টা হাতে দ্বিবা...চামর ॥”

কৃষ্ণরাম ও তাহার অনুকরণে রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন, মালা দেখিয়া ও লিখন পড়িয়া বিজ্ঞা উৎকণ্ঠিত হইলে সখীগণ তাহাকে সাহসনা দিতে লাগিল। বিজ্ঞার এই উৎকণ্ঠা কৃষ্ণরাম সংক্ষেপে বলিয়াছেন। কিন্তু রামপ্রসাদ “মালাদূতে বিজ্ঞার উৎকণ্ঠাবস্থা” শীর্ষক একটি প্রসঙ্গেরই অবতারণা করিয়াছেন। বিমলা তিরস্কৃত হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। স্তবরাং তাহাকে সে দিন আর কিছু বলা হইল না। কৃষ্ণরাম লিখিতেছেন—

“মালাটি লইয়া হাতে হৃদয় লিখন তাতে

যত্ন করি পঙ্কিল সকল ।

বিরহে হরিল জ্ঞান স্মৃতি পূজার ধ্যান

সখীগণে তুমি কতুহল ॥

বাসনা নাই যে থাই বসিতে না পারে রাই

তাইলে দ্বিগুণ বাড়ে আলা ।

বিকল হইল অতি প্রভাত হইলে রাত

প্রাণ পাই দেখিলে বিনয়া ॥”

রামপ্রসাদ লিখিতেছেন—

“দান করি বিধুমুখী কদয়ে পরমহুখী

পূজে ইষ্ট দেবতা সারদা ।

চিকন গাঁথনি ফুল অতিশয় চিত্তাকুল

অনিমিখে নিরখে প্রমদা ॥

দেখিয়া পুষ্পের হার পূজা করে কেবা তার

ধ্যান জ্ঞান ছই গেল দূরে ।

কাছে ডাকি সুলোচনা পাতি পড়ে বিচক্ষণা

অব্যাজে যুগল আঁখি সুরে ॥

মনেতে জানিল এই পুরুষ রতন সেই

দরশন পাইব কিরূপে ।

তিলেক বৎসর প্রায় বুক কেটে জিউ যায়

সখী প্রতি কহে চুপে চুপে ॥

‘হেমে কি হইল সই দেখ দেখি হীরা কই

ফিরা আমি পায় বরি তার ।

যদি ক্ষমা করে রোষ এতে কিছু নাহি ঘোষ
 তুনি পো সকল সমাচার ॥
 কারে ঘরে দিলা ঠাই বুঝি বা তেমন নাই
 বিজ্ঞাঘর ধরণী মণ্ডলে ।
 বিরহিণী দেখি আশা এসরা হইলা শ্রামা
 বিধু মিলাইলা করতলে ॥'
 সখী কয় 'দৈর্ঘ্য হও আজিকার দিন রও
 প্রভাতে পাইবা দেখা হীরা ।
 এতই কেন উন্নত মিলিবে সকল তত্ত্ব
 জিজ্ঞাসা করিও দিয়া কিরা ॥'
 বিজ্ঞা বলে 'বল বটে এখন প্রমাণ বটে
 আজি সে বাচিলে হইবে কালি ।
 হের কণ্ঠাগত শ্রোণ কাঁট কর পরিজ্ঞাপ
 সব শেষে যত দেও গালি ॥'
 বুঝি হারা পুন তারা কহে 'সারা হও পারা
 বাধ্য নহ সাধ্য কিবা আছে ।
 রাণী ঠাকুরাণী যথা যাই তথা সব কথা
 নিবেদন করি তাঁর কাছে ॥'
 ভয় দর্শাইয়া নানা জনে জনে করে মানা
 কষ্টে শ্রেষ্ঠে সান্তাইয়া রাখে ।
 শ্রীকবিরঞ্জন বলে জলনিধি উৎকলিলে
 বালির বন্ধন কোথা থাকে ॥'

রামপ্রসাদের বিজ্ঞা মালা দেখিয়া ও সুনন্দরের লিখন পড়িয়া তাহাকে পাইবার জন্ত উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। অবিবাহিতা রাজকন্তার অজ্ঞাত, অপরিচিত ও অদৃষ্টপূর্ব যুবকের সামান্য একটু লিখনে এরূপ অদৈর্ঘ্য হওয়া মোটেই স্বাভাবিক হয় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের মালিনী লিখন দিয়াই তিরস্কৃত হইয়া চলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং বিজ্ঞা লিখন পড়ার পর সে দিন তাহার সহিত আলাপ করিতে পারেন নাই। পরদিন মালিনী ফুল দিতে আসিলে বিজ্ঞা তাহার নিকট পূর্বদিনের ব্যবহারের জন্ত ক্ষমা চাহিলেন এবং সুনন্দরের সমাচার জানিতে চাহিলেন। এই বর্ণনায় কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদ, উভয়েই বিশেষ কবিত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন নাই।

ভারতচন্দ্রের বিজ্ঞা হীরার সমক্ষেই কোটা খুলিয়া ফুল হইতে নিকিষ্ট ফুলশরবিজ্ঞা হইয়া ও শ্লোক পড়িয়া ব্যাকুল হইলেন ও হীরাকে বিনয় করিয়া কহিলেন,—

“কহ ওলো হীরা তোরে মোর কিরা
বিকল করিলি কলে ।

গড়িল যে জন সে জন কেমন
বিশেষ কহ না ছলে ॥”

হীরা কহে ‘স্তন কেন পুন পুন
হান সোহাগের শূল ।

কহিয়া কি ফল বুদ্ধিহ সকল
আপন বুদ্ধির তুল ॥

একপ তোমার যৌবনের তার
যতপি না হৈল বিয়া ।

কোথা পাব বর ভাবি নিরন্তর
বিদরে আমার হিয়া ॥

যে জিনে বিচারে বরিবা তাহারে
কোন্ মেয়ে হেন কহে ।

যে তোমা হারাবে তারে কবে পাবে
যৌবন তাহে কি রহে ॥

যৌবনে রমণ নহিল ঘটন
বুড়াইলে পাবে ভালে ।

নিদাঘ জালায় তরু জলে যায়
কি করে বরিষাকালে ॥

দেখিয়া তোমায় এই ভাবনায়
নাহি রুচে অরজল ।

পাইয়া হৃদয় রাজার নন্দন
রাখিছ করিয়া ছল ॥”

ইহার পর হীরা হৃদয়ের পরিচয় দিল এবং তাহার পর বলিল—

“তোমার লাগিয়া নাগর রাখিয়া
গালি লাভ হৈল মোর ।

যাহার লাগিয়া চুরি করে গিয়া
সেই জন কহে চোর ॥”

হীরা এই বলিয়া চলিয়া যাইবার ছল করিলে বিজ্ঞা তাহাকে মাথার কিরা দিয়া
ফিরাইলেন । বিজ্ঞাকে কাতরা দেখিয়া হীরা তাহার কাণে কাণে হৃদয়ের রূপ বর্ণনা করিল ।

খ। স্বপ্নবৈরাগ্য রূপবর্ণনা

গোবিন্দদাস ভূম্বরের রূপবর্ণনা করেন নাই। কৃষ্ণরাম মালিনী কঙ্কর ভূম্বরের পরিচয় দান প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এই ভাবে তাঁহার রূপবর্ণনা করিয়াছেন,—

“সুন্দর তাহার হৃত সুন্দর মুরতি ।
রূপে শুণে অল্পম কবি বৃহস্পতি ॥
যশ নিয়মল অতি প্রতাপে তপন ।
অঙ্গ ভঙ্গ দেখে অঙ্গ তেজিল মদন ॥
অমিয়া জড়িত কথা অতিশয় ভাঙ্গ ।
কিরণেতে নিবিড় আঁধার করে আল ॥
দেখিয়া তাহার রূপ হেন লয় মন ।
জিয়াইয়া দিল হর মকরকেতন ॥
ধরণী যশুগে বুকি নাহি ভার তুল ।
দরশনে কামিনী কেমনে রাখে কুল ॥”

রামপ্রসাদ এ প্রসঙ্গে হুম্মরের রূপবর্ণনা করেন নাই। বলরাম লিখিয়াছেন, বিজ্ঞা হুম্মরের
পত্র পড়িয়া মালিনীকে তাহার ভগিনীপুত্রের রূপবর্ণনা করিতে বলিলে মালিনী—

"বোড় করি পাণি কহেন যানিনী

তন নুপত্তির সূতা ।

ভাগিনা আমার বরণ তাহার
যেন কনকের লতা ॥

তাহার বরণ তপত কাঞ্চন
মুখ শরদের চাঁদ ।

তার মধ্যস্থান কেশরিনগজন
রূপ সুবস্তীর কাঁদ ॥

କମଳା ବିଶେଷ ଓଢ଼ ।

বিসবর জিনি বাহর বজনি
কায়ের কামান ভুজ ॥

চরণ যুগল রক্ত কমল
তাঁহে পড়ি কাঁদে বিধু ।

ভাষার লোচন খঞ্জন গঞ্জন
বচনে বরিষে যথু ॥

বাখার চিকুর ঠেকয়ে নুপুর
 আছাইয়া থাকে যবে ।^১
 অলিরথ নাথ একোদর জাত
 নাসিকা তুলন খণ্ডে ॥
 কবিশিয়ারদ মনোহর পদ
 কালিদাস নহে তুল ।
 সর্বগুণধর আমার স্নহর
 সেই গ্যাথ্যা দিল ফুল ॥
 বিশংতিবৎসর বরেন্স তাহার
 দেখিতে যেমন ছুপ ।
 মার কাট কিবা মনে লয় যেবা
 কহিল আমি স্বরূপ ॥^২

বিজ্ঞা তাহাকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং নিজেই বলিলেন যে, সরোবরে স্নান করিবার সময় তাহাকে দেখিবেন ।

দ্বিজ রাধাকান্তের স্নহর মালিনীর অপেক্ষা না রাখিয়া দেবীন্দ্র কঙ্কল পরিয়া স্বয়ং উপবনে গিয়া বিজ্ঞাকে দেখিয়াছেন এবং বিজ্ঞা কামের পূজা করিলে কঙ্কল মুছিয়া তাহাকে দর্শন দিয়াছেন । সেই প্রসঙ্গে কবি তাহার রূপবর্ণনা করিয়াছেন—

“মনোত্তররূপ জিনি অদভূত রূপ ।
 ভুবন মোহন অপরূপ রসকূপ ॥
 আজ্ঞাছু লঙ্ঘিত বাহ নাতি স্নগভীর ।
 নাসিকা উপরে অতি জিনি মস্তকীর ॥
 মঞ্জুল লোচন কঙ্কল গঞ্জিয়া ।
 অনবদ্য মধ্য মস্ত কেশরী জিনিয়া ॥
 করিবরকর জিনি উরুর বলন ।
 কনক কপাট বস্কতট স্নশোভন ॥
 বালেন্দু নিশ্চিত মুখ ভুরু স্নগঠন ।
 ললাটে অষ্টমী ইন্দু জিনি স্নগঠন ॥”

মধুসূদন বিজ্ঞাস্নহরের দর্শনের পর বিজ্ঞার মুখ দিয়া স্নহরের রূপবর্ণনা করিয়াছেন—

“কি রূপ দেখিলু সখি প্রবল মোহন ।
 তিলেক দেখিবামাত্র ত্রবিলেক মন ॥

১ । পুরুষের আপাছবিলম্বিত কেশ ও তাহার পদে নুপুর, এ বর্ণনা সিতান্ত ছুর্বল । বোধ হয়, কবিতা মিলাইবার জন্মই ইহার অবতারণা করা হইয়াছে ।

মধ্যে দিয়া থাক বাড়াইল নাক
 মদনের শুকপাখি ॥
 আঁজাছু লম্বিত বাহু সুবলিত
 কামের কনক আশা ।
 রসের আলয় কপাট হৃদয়
 ফণিমণি পরকাশা ॥
 যুবতীর মন সফরী জীবন
 নাভি সরোবর তার ।
 ত্রিবলিবন্ধন দেখে যে জন
 তার কি মোচন আর ॥
 দেখিয়া সে ঠায় জ্বিয়ে য়োর কান
 এত যে হৈয়াছি বুড়া ।
 মাসী বলে সেই রক্ষা হেতু এই
 ভারত রসের চূড়া ॥”

ভারতচন্দ্রের বিজ্ঞা অজ্ঞা কবির বিজ্ঞার জ্ঞায় নির্জ্ঞার মত স্বয়ং তাহার রূপ বর্ণনা করিতে মালিনীকে অহুরোধ করেন নাই। মালিনী তাহার কানে কানে যে স্তম্ভের রূপ বর্ণনা করিয়াছে, তাহাতে রস জন্মিয়া উঠিয়াছে।

গ। বিজ্ঞাস্তম্ভের দর্শন

পূর্বেই বলিয়াছি, গোবিন্দদাস নগরসংকীর্ণনচ্ছলে বিজ্ঞাস্তম্ভের দর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গোবিন্দদাস লিখিতেছেন,—

শশ্বৎ ঘণ্টা চামর লইয়া ও স্তম্ভর
 রহিয়াছে মহাপ্রভু ধরে ।
 লইয়া ফুলের দোলা নানা রঙ্গে করে খেলা
 উপস্থিত রাজার ছয়ারে ॥
 চতুর্ভিতে নৃত্য গীত রাজদ্বারে উপনীত
 নানাবিধি বাজের বাজন ।
 ছেন কালে চিত্ররেখা স্তম্ভরে করায় দেখা
 করাজুলি দিয়া ততক্ষণ ॥”

কৃষ্ণরায় বিজ্ঞাস্তম্ভের দর্শনপ্রসঙ্গ বর্ণনা করেন নাই। রায়প্রসাদের বিজ্ঞা মালিনীকে মানচ্ছলে যুবরাজকে দেখাইতে অহুরোধ করিয়া, তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া গলার হার গুহঙ্কার দিলেন। হোরা ক্ষুণ্ণচিত্তে স্তম্ভরকে আসিয়া সংবার দিল। বিজ্ঞা বাতায়নতলে বসিয়া দেখিতে লাগিলেন, স্তম্ভর বকুলতলায় সরোবরতীরে স্নানার্থ উপস্থিত হইলেন।

এখানে রামপ্রসাদ সমস্ত গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। যে বকুলতলায় হীরা সুন্দরের সাক্ষাৎ পাইয়া ছিলেন, রাজবাটীর অন্তঃপুর হইতে তাহা যে দেখা যায়, তাহার কোন আভাস রামপ্রসাদ পূর্বে দেন নাই। ইহা যদি রাজবাড়ীর মধ্যে কোন সরোবর হয়, তাহা হইলে প্রাচীরবেষ্টিত রাজপ্রাসাদে সুন্দর প্রবেশ করিলেন কিরূপে, তাহাও লিখেন নাই। রাজবাড়ীর অন্তঃপুরের বাতায়ন হইতে বিজ্ঞা দূরবর্তী সরোবরতীরস্থ সুন্দরকে কিরূপে দেখিলেন, তা বুঝিবার উপায় নাই। যাহা হউক, বিজ্ঞাসুন্দরের এই দর্শনপ্রসঙ্গ রামপ্রসাদ একটু বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। “বিজ্ঞা সুন্দরের পরস্পর দর্শন,” “সুন্দর দর্শনে বিজ্ঞার সখীর প্রতি উক্তি” ও “বিজ্ঞা দর্শনে সুন্দরের মোহ” এই তিনটি প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ বিজ্ঞাসুন্দর দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শব্দালঙ্কারের ঘটা করিয়া এই তিনটি প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। নিম্নে তাহার কিছু কিছু উদাহরণ দিলাম—

“বন-ম-স্ত-হস্তী-মন ছুট্টাচারী বড়।
 ক্ষমাক্ষুশক্ষেপে কর কুন্তে দড়দড় ॥
 রসমই কহে সই প্রতিজ্ঞা তাবত।
 স্বরশরে ভেদ তহু নহেক যাবত ॥
 ক্ষমাক্ষুশ খোয়া গেল অনঙ্গ অলসে।
 মনমস্ত-বারণ বাবণ হবে কিসে ॥
 কাস্ততহু এ কাস্ত একান্ত মোর বটে।
 আর ইচ্ছা নাই সই স্বামী হেন ঘটে ॥”

“সুন্দর সুন্দর বর এই বটে আলি।
 দড় দড় কি কব কহ কি শুনে আলি ॥
 সুবর্ণ সুবর্ণ জিনি মুখ কমলজ।
 কিরূপ কিরূপ করি কৈল কমলজ ॥”

কি রূপসী	অঙ্গে বসি	অঙ্গ খসি	পড়ে।
প্রাণ দহে	কন্ত সহে	নাহি রহে	ধড়ে ॥
মধ্যে ক্ষীণ	কুচ পীন	শশহীন	শশী।
আস্তবর	হাস্তোদর	বিদ্যাদর	রাশি ॥
নাসাতুল	ভিলকুল	চিস্তাকুল	ঈশ।
বাক্যস্থিতি	স্বধাবৃষ্টি	লোলদৃষ্টি	বিষ ॥”

বলরাম বিজ্ঞা ও সুন্দর উভয়কেই একই সরোবরে স্নান করিতে লইয়া গিয়াছেন এবং সেইখানেই উভয়ের দর্শন বর্ণনা করিয়াছেন। বলরামের বর্ণনা সুন্দর ও সহজ—

“ভাবিয়া মরিয়াছিহু প্রীতিজ্ঞা করিয়া ।
 কার মনে ছিল আই মোর হবে বিয়া ॥
 এতদিনে শিব বুঝি হৈলা অল্পকূল ।
 ফুটাইল ভগবতী বিবাহের ফুল ॥”

তাহার পর কিল্পে সাক্ষাৎ হইবে, তাহা ভাবিয়া বলিলেন—

“মোর বালাধানার সমুখে রথ আছে ।
 দাড়াইতে তাঁহারে কহিবে তার কাজে ॥
 তুমি আসি আমারে কহিবে সমাচার ।
 সেই ছলে দরশন করিব তাঁহার ॥”

তাহার পর বিজ্ঞা—

“কাম প্রহণের ছলে কাম রাখে সতী ।
 রতিদান ছলে তারে পাঠাইলা রতি ॥”

ফুলের রতিকামের সঙ্গে কামের মূর্তিটি রাখিয়া রতিটি ফিরাইয়া দিলেন । চিত্রকাব্যে পরিচয় দিলেন—

“সবিতা পদ্মাসুজানাং ভূবি তে নাভ্যাপি সমঃ ।
 দিবি দেবাত্মা বদন্তি ধিতীয়ে পঞ্চমেপ্যহম্ ॥”

এই শ্লোকটি অল্প কোন কাব্যে বা সংস্কৃত বিজ্ঞানসুন্দরেও নাই । সম্ভবতঃ ইহা ভারতচন্দ্রের নিজ রচনা ।

এইখানে একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করা নিতান্ত আবশ্যিক । কৃষ্ণরাম, রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র বিজ্ঞানসুন্দরের সাক্ষাৎ হইবার পূর্বে মালিনীকে দিয়া বিজ্ঞার উৎকর্ষার কথা সুন্দরকে বলাইয়াছেন এবং বিজ্ঞাকে দিয়া দেবীর আরাধনা করাইয়াছেন । আকাশবাণীতে দেবী সুন্দরকেই বিজ্ঞার ভাবি স্বামী বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন । কিন্তু ভারতচন্দ্র ইহাতে একটু বিশেষত্ব করিয়াছেন—

“এইরূপে মালিনীরে করিয়া বিলায় ।
 বড় ভক্তিভাবে বিজ্ঞা বসিলা পূজায় ॥
 পূজা না হইতে মাগে আগে ভাগে বর ।
 দেবীরে করিতে ধ্যান দেখয়ে সুন্দর ॥
 পাণ্ড অর্ঘ্য আচমন আসন ভূষণ ।
 দেবীরে অর্পিতে করে বরে সমর্পণ ॥
 সুগন্ধ সুগন্ধি মালা দেবীগলে দিতে ।
 বরের গলায় দিছু এই লয় চিতে ॥
 দেবী প্রদক্ষিণে বুঝে বর প্রদক্ষিণ ।
 • আবুল হাইল পূজা হয় অদ্বীন ॥

ব্যস্ত দেখি ভারে কালী কহেন আকাশে ।
 আসিয়াছে তোর বর মালিনীর বাসে ॥
 পূজা না হইল বলি না করিহ ভয় ।
 সকলি পাইছ আমি আমি বিশ্বময় ॥”

বিজ্ঞান এই ভয়স্রতা এবং দেবীর বিজ্ঞাকে আশ্বাস অস্ত্র কোন কাব্যে নাই। কবির এই কল্পনা ভাব ও রসে অপূর্ব।

ভারতচন্দ্র বিজ্ঞানসুন্দরের দর্শন অতি সংক্ষেপে সারিয়াছেন। মালিনী সুন্দরকে লইয়া রথতলার রাখিয়া বিজ্ঞাকে সংবাদ দিলে—

“আধিবিধি সুন্দরে দেখিতে ঘনি ধায় ।
 অজুলী হেলায়ে হীরা ছু হারে দেখায় ॥
 অনিমিষে বিনোদিনী দেখিছে বিনোদ ।
 বিনোদের বিনোদিনী দেখিয়া প্রমোদ ॥
 শুভক্ষণে দরশন হইল ছু’জনে ।
 কে জানে যে জানাজানি সুজনে সুজনে ॥
 বিপরীত বিপরীত উপমা কি দিব ।
 উর্দ্ধে কুমুদিনী হেটে কুমুদবান্ধব ॥
 ছহার নয়ন কাঁদে ঠেকিয়া ছুজনে ।
 ছুজনে পড়িল বান্ধা ছুজনের মনে ॥
 মনে মনে মনমালা বহল করিয়া ।
 ঘরে গেলা ছু’ছে ছু’হা ফদর লইয়া ॥
 আঁধি পালটিয়া ঘরে যাওয়া হৈল কাল ।
 ভারত জানয়ে প্রেম এমনি জ্ঞানাল ॥”

এই বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হইলেও অপর সকল কবির বর্ণনা হইতে রসঘন।

খ। সুন্দরসমাগমের পরামর্শ

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, মালিনী বিজ্ঞার সহিত সুন্দরের মিলনের কোন ব্যবস্থাই করে নাই। এমন কি, অস্ত্রাস্ত্র বিজ্ঞাসুন্দরের স্ত্রায় পিতাকে জ্ঞানাইয়া বিবাহের ব্যবস্থা করিবার কথাও বলে নাই। সে সুন্দরকে বিজ্ঞার সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিয়া, যখন বিজ্ঞার ভবনে সংকীর্ণনের প্রসাদ মাল্যসহ উপস্থিত হইয়া বলিল—

“হারী প্রহরী তারা বড়ই চতুর ।

কোন মতে আসিবে তোমার অন্তঃপুর ॥”

তখন চিত্তরেখা তাহার উত্তর দিল—

“চিত্তরেখা বলে যদি হয় গুণবান ।
তবে সেই আসিবারে জানিবে সন্ধান ॥
চিত্তরেখা বলে তুমি নাহি জান কাজ ।
আসিতে সন্ধান সে জানিবে সুবরাজ ॥”

মালিনী তাহার পর গৃহে গিয়া স্তম্ভকে মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া কার্যসাধন করিতে বলিল ।
একেবারে দৈবের হস্তে সমস্ত তার সমর্পণ করিয়া দিল । স্তম্ভের সিদ্ধ মন্ত্র জপিয়া মন্ত্রের
প্রভাবে হুড়ু হুড়ু করিলেন ।

কুব্জরাম লিখিয়াছেন, মালিনী বিজ্ঞার নিকট হইতে নানা উপহার লইয়া আপন গৃহে
আসিয়া স্তম্ভকে বিজ্ঞার মনের ভাব ব্যক্ত করিল ও বলিল,—

“কেমতে হইবে দেখা ভাব মহাশয় ।
তোমা বিনা তার আশ ভিলেক না রয় ॥”

তাহার পর বলিল যে, উভয়েই উভয়কে পাইতে ব্যাকুল হইয়াছ, কিন্তু মিলিবার
কোন উপায় নাই । কারণ—

“দ্বিবা বিভাবরী আগে কোটাল গ্রহরী ।
এই সে কারণে আমি ভয় বড় করি ॥
এক যুক্তি বলি আমি যদি মনে লয় ।
নৃপতিরে বলিয়া করহ পরিণয় ॥”

তাহা শুনিয়া—

“হাসিয়া স্তম্ভর বলে হৃদয় কোকুট ।
গোপনে করিব বিভা ইথে বড় সুখ ॥
চোররূপে যুবতী লইয়া করি লীলা ।
জগতের সার সুখ বিধি যা লিখিলা ॥
পশ্চাৎ শুনিলে রাজা যে হয় সে হবে ।
সহায় পরম দেবী কোন চুঃখ নবে ॥”

ইহা শুনিয়া মালিনী আর কিছু বলিল না । বলরাম স্তম্ভের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পূর্বেই
বিজ্ঞার মুখ দিয়া বলাইয়াছেন—

“যে হকু সে হকু আমি লজ্জা পরিহারি ।
গোপতে কুমার আমি স্বয়ম্বর করি ॥”

তাহার পর স্তম্ভের সহিত সাক্ষাৎ হইবার পর বিভা সখীগণকে বলিলেন—

স্তন সখীগণ দেখিল স্বপন
আজ রজনীর শেষে ।
একই স্তম্ভর বহু গুণধর
তইয়াছিল মোর পাশে ।

আপনি স্বপনে হাসি তার সনে
হার দিল, তার গলে ।

সেই হইতে যোর চিন্ত হইল চোর
না জানি কি ফল ফলে ॥

শুন সখীগণ কর আওজন
কালী পূজিবার তরে ।

আজ নিশাকালে কালী পূজি ভালে
তবে মন হয় স্থিরে ॥”

ইহা শুনিয়া সখীগণ পূজার আয়োজন করিল । বলরাম লিখিতেছেন—
“তেয়াগিয়া লাজ বিজ্ঞা করে সাজ
কালী পূজিবার ছলে ।”

“এখায় স্তম্বর পিয়া মালিনীর ঘর ।

দিবসে বঞ্চিত হুঁহে মদনের শর ॥

ভাবিল কুমার আমি কি বুদ্ধি করিব ।

কোন্ ছলে বিস্তার মন্দিরে আমি যাব ॥

যদি খিড়কীর পথে করিয়ে গমন ।

কোটাল পাইলে লাগ বধিব জীবন ॥”

এইরূপ নানা চিন্তা করিয়া, পরে ভাবিলেন—

“যেই দিন ঘরে হৈতে করিল গমন ।

একান্ত করিল কালীর চরণ পূজন ॥

সেই দিন কেন মোরে দিল আশ্বাসন ।

দরশন পাবে যবে করিবে স্মরণ ॥

একান্তে করিয় কালীর চরণ পূজন ।

তবে মনোরথ তোমার করিব পূরণ ॥”

তাহার পর স্তম্বর কালীর জব করিলেন । রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন, বিজ্ঞাস্তম্বরের পরস্পর দর্শনের পর বিজ্ঞা ভগবতীর জব করিলে—

“একান্ত কাতরা বিজ্ঞা কুট্টা মহাবিজ্ঞা আত্মা

পড়িলা প্রসাদ জবাকুল ।

শ্রবণে শুনিল এই তোমার স্বদেশ সেই

আজি নিশি সফল প্রকুল ॥”

বিজ্ঞা পুলকিতা হইয়া বাসরসজ্জা করিতে লাগিলেন ।

মধুসূদন চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, বিজ্ঞা যখন স্তম্বরের সহিত মিলন করাইবার জন্ত মালিনীকে বিনয় করিতে লাগিলেন, মালিনী তখন বলিল—“রাজা রাণী শুনিবে সর্বনাশ হইবে ।” বিজ্ঞা পুনরায় অহুময় করিলে সে বলিল—

“তবে যদি হয় মনেতে নিশ্চয়
জানহ ভজিব তারে ।

কোন মতে আসি সেই পরবাসী
ভেটিব তোমার তরে ॥”

মালিনী নিজে কোন ভায় লইল না। বিজ্ঞা তখন মালিনীকে বলিলেন—সুন্দর যে-কোন প্রকারে যেন তাহার গৃহে উপস্থিত হন। মালিনী সুন্দরকে সেই কথা জানাইলে সুন্দর কলিকটুর পূজা করিলেন। দেবীর বরে পুড়ন্ত সৃষ্টি হইল।

উপরিস্থিত কবিদিগের মধ্যে কেহই কোন যুক্তি দেখান নাই যে, কেন সুন্দর বা বিজ্ঞা প্রকান্তে বিবাহ না করিয়া গোপনে মিলিত হইতে চাহিলেন। ভারতচন্দ্র কিঙ্ক সেই সমস্তা পূরণ করিয়াছেন। বিজ্ঞাসুন্দরের পরস্পরের দর্শনের পর—

“প্রভাতে কুসুম লয়ে হীরা গেল ক্ষুণ্ণ হয়ে
সুন্দর রহিল পথ চেয়ে ।

বিজ্ঞার পোহায় রাতি ঐ কথা নানা জাতি
পুস্তকের আট গুণ মেয়ে ॥

হীরা বলে ঠাকুরাণি কিবা কর কানাকানি
শুভ কর্ম শীঘ্র হৈলে ভাল ।

আপনি সচেষ্ট হও রাজ্যারে রাণীরে কও
আজ্ঞার বরেতে কর আল ॥

বিজ্ঞা বলে চুপ চুপ যদি ইহা শুনে ছুপ
তবে বিয়া হয় কি না হয় ।

গুণসিদ্ধ মহারাজ তার পুত্র হেন সাজ
ব্যাপার না হইবে প্রত্যয় ॥

তাহারে আনিতে ভাট গিয়াছে তাহার পাট
তিনি এলে আসিত সে ভাট ।

লঙ্কর আসিত সঙ্গে শব্দ হৈত রাঢ়ে বলে
হাটের ছয়ায় কি কপাট ॥

এমনি বুঝিলে বাপা অমনি রহিবে চাপা
অজ্ঞ দেশে যাইবে কুমার ।

সর্ব কর্ম হবে নট কুমি ত অযুক্তি বট
তবে বল কি হবে আমার ॥

তাই বলি চুপে চুপে বিয়া হয় কোনরূপে
শেষে কালী যা করে তা হবে ॥”

কুনিয়া হীরা শিহরিয়া উঠিল। কোতোয়াল বুকেতু জানিতে পারিলে “তিলেকতে

পাড়িবে জঞ্জাল ।” তাহার পর সখীরা কথায় কথায় প্রচার করিয়া ফেলিবে । বিজ্ঞা সখীদের সম্বন্ধে হীরাকে নিশ্চিন্ত হইতে বলিলেন, তাহার ঠাহার অন্ত্যস্ত বাধ্য । বিজ্ঞা স্তম্ভরকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিতে বলিলেন, তিনিই ব্যবস্থা করিবেন ।

“বিজ্ঞা বলে চল চল বুঝাইয়া গিয়া বল
তিনি ভাবিবেন পথ তার ।

কালী কুলাইবে যবে ঘটনা হইবে তবে
নারিকেলের জলের সঞ্চার ॥

কৈও কৈও কবিবরে কোনরূপে যোর ঘরে
আসিতে পারেন যদি তিনি ।

তবে পণে আমি হারি হইব তাঁহার নারী
কৃষ্ণ যেন হরিলা কুস্মিনী ॥”

হীরা গিয়া স্তম্ভরকে বলিল । স্তম্ভর শুনিয়া—

“রায় বলে এ কি কথা কেমনে যাইব তথা”

স্তম্ভর কোন উপায় খুজিয়া পাইলেন না ।

“স্তম্ভর উপায় কিছু না পান ভাবিয়া ।

যাইব বিজ্ঞার ঘরে কেমন করিয়া ॥

কোটাল ছরঙ্গ খানা ছয়ারে ছয়ারে ।

পাখী এড়াইতে নারে যাহ্নবে কি পারে ॥

আকাশ পাতাল ভাবি না পেয়ে উপায় ।

কালীর চরণ ভাবি বসিলা পূজায় ॥”

৫। সজ্জিখমন হইতে বিদ্যাস্তম্ভরের বিচার

ক। সজ্জিখমন

গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন, স্তম্ভর সাত বার সিদ্ধ যজ্ঞ অর্প করিয়া—

“যজ্ঞ অর্পিয়া কুমার হইল দণ্ডবৎ ।

যজ্ঞের প্রতাপে হইল স্তম্ভরের পথ ॥

বিজ্ঞার মন্দির আর মালিনীর ঘর ।

পাতালে জাজাল হইল পরম স্তম্ভর ॥

কনকরচিত সে অপূর্ব জাজাল ।

হুই ভিত্তে শোভে তার যুকুতা প্রবাল ॥”

কৃষ্ণরায় লিখিতেছেন, বিমলার কথা শুনিয়া, রোমাঞ্চিত দেহে মধনে ব্যাকুল হইয়া, স্তম্ভর স্নানাদি সারিয়া শিবপূজাস্তে কালীর যজ্ঞ অর্প করিয়া তাঁহাকে স্তব করিলেন ও প্রার্থনা জানাইলেন—

“গোপনে করিব বিজ্ঞা তোমার আদেশ ।
 একাকী আইছ দূর জানিয়া বিশেষ ॥
 কেমনে যাইব রাজকন্টার আলয় ।
 কোটাল ছরস্ত বড় দেখি লাগে ভয় ॥
 হইল আকাশবাণী সদয়া অভয়া ।
 স্রুখে গিয়া কর বিজ্ঞা রাজ্যের তনয়া ॥
 বিজ্ঞার মন্দির আর বিমলার ঘর ।
 হইল স্তম্ভ পথ অতি মনোহর ॥
 চন্দ্রকান্ত মণি কত জলে ঠাঞি ঠাঞি ।
 রজনী দিবস তুল্য অন্ধকার নাই ॥”

রামপ্রসাদ কৃষ্ণরামের কথা ধ্বনিত করিয়াছেন, তবে স্তম্ভের বর্ণনা করেন নাই—

“স্তব করে কবি পরিতুষ্টা দেবী
 পুনরপি আজ্ঞা হয় ।
 ভয় নাহি বহু ইহা কোন ভুল
 স্রুখে কর পরিণয় ॥
 অপক্লপ কথা অকস্মাৎ তথা
 হইল স্তম্ভ পথ ।
 প্রসাদের বাণী ভক্তের ভবানী
 পুরাইলা মনোরথ ॥”

বলরামও স্তম্ভের কোন বর্ণনা করেন নাই। তাঁহার স্তম্ভের দেবীকে ককারাদি ক্রমে স্তব করিয়া বিজ্ঞার ঘরে যাইবার অজ্ঞ বর চাহিলে—

“কুমারের তুনি বাণী কুপাময়ী নারায়ণী
 ভক্তকালী কঙ্কালমালিনী ।
 চলহ বিজ্ঞার ঘরে অন্তর দিলাও তোরে
 হইবেক স্তম্ভ সরসী ॥
 পূরিবেক মনোরথে চলহ স্তম্ভ পথে
 যথা বিজ্ঞা নৃপতিকুমারী ।
 মালিনী বিজ্ঞার ঘরে স্তম্ভ হইব বরে
 অন্তর্জ্ঞান হৈলা মহেশ্বরী ॥”

মধুসূদন চক্রবর্তী লিখিয়াছেন, কালিকার পূজা করিয়া স্তম্ভের বর লাভ করিলেন এবং কৃৎকার দিতেই মালিনীর গৃহ হইতে বিজ্ঞার গৃহ পর্যন্ত স্তম্ভ সৃষ্টি হইল ।

বিজ্ঞা রাধাকান্ত মায়াকঙ্কলপ্রভাবে স্তম্ভকে অদৃষ্ট করিয়া বিজ্ঞার সহিত মিলাইয়াছেন ; কিন্তু স্তম্ভের প্রসঙ্গও বাদ দেন নাই। তিনি তাঁহার কাব্যে বহু নুতন করিয়াছেন ।

ভারতচন্দ্রও সম্ভবতঃ রামপ্রসাদের বিভাস্থলের প্রসঙ্গগুলি আগে পাছে করিয়া ও নূতন প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়া ইচ্ছামত কাব্যটিকে নূতনতর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রাধাকান্ত লিখিতেছেন, মিলনের পর বিভা ও স্থলর মায়াকাজলের সাহায্যে ছদ্মবেশে রাজসভায় গিয়া মিথ্যা পরিচয় দিলেন এবং বীরসিংহের নিকট হইতে স্থলর ছদ্মবেশিনী বিভাকে বাঞ্ছন্য করাইয়া লইলেন। বিভা ও স্থলর কিরূপে রাজসভায় বাইলেন ও আসিলেন, সখীগণ তাহা জানিতে চাহিলে, বিভা সব কথা খুলিয়া বলিলেন। স্থলর নিজে হইয়া পড়িলে সখীগণ কাজল চুরি করিল ও সকলে অশ্রু হইয়া কৌতুক করিতে লাগিল। স্থলরকে ভয় দেখাইবার জন্য তাহারাই বলিল, “রাণী আসিতেছেন, তুমি পালাও।” স্থলর তাহাদের চাকুরী বুঝিয়া নির্জনে গিয়া কাঙ্গার ধ্যান করিতে লাগিলেন—

“তব দাসে পরিহাসে হাসে নারী হৈঞা।

লজ্জানিবারণী তারা জপা বিনাসিঞা ॥

ভকতবৎসলা শ্রামা সেবক শরণে।

মা ভই মা ভই সদা ডাকেন গগনে ॥

মায়ানিজা দিয়া দেবী দ্বন্দ্ব হাসিঞা।

করেন হৃদয়পথ সুতকার দিঞা ॥”

ভারতচন্দ্র সমস্তই দেবীর উপর ফেলিয়া দেন নাই। স্থলর দেবীর স্তুতি করিলে—

“স্ববে তুষ্টা ভগবতী প্রসন্ন হইয়া।

সন্ধি কাটিবারে দিলা উপায় করিয়া ॥

তাম্রপদ্মে সন্ধিমুখ বিশেষ লিখিয়া।

শুভ হৈতে সিঁদকাঠি দিলা কেলাইয়া ॥

পূজা করি সিঁদকাঠি লইলেন রায়।

মজ পড়ি হুক দিয়া মাটিতে ভেজায় ॥”

ইহার পর কামরূপের কামাখ্যার মজ দিয়া কিরূপে স্থলর হৃদয় কাটিলেন, ভারতচন্দ্র তাহা বর্ণনা করিয়াছেন—

“অরে অরে কাঠি তোরে বিশাই গড়িল।

সিঁদকাঠি বিঁধ কর কালিকা কহিল ॥

আখর পাখর কাট কেটে ফেল হাড়।

ইট কাট কাঠ কাট মেদিনী পাহাড় ॥

বিভার মন্দিরে আর মালিনীর ঘরে।

মাটি কাটি পথ কর অনাড়ার বরে ॥”

হৃদয় কাটিলে যে মাটি উঠিবে, তাহা কোথায় বাইবে, সে কথা চিন্তা করিয়া ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

“হৃদয়ের মাটি কাটি উড়ে যাবে বায়।

হাড়ীঝি চণ্ডীর বরে কামাখ্যা আজায় ॥”

তিনি সংক্ষেপে সুড়ঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন—

“কালিকার প্রভাবে মস্তকের দেখ রঙ্গ ।
মালিনী বিভার ঘরে হইল সুড়ঙ্গ ॥
উর্দ্ধে পাঁচ হাত আড়ে অর্ধেক তাহার ।
স্থলে স্থলে মণি অঙ্গে হরে অঙ্ককার ॥
সুন্দরের চোর নাম তাই সে হইল ।
অন্নদামঙ্গল দ্বিজ ভারত রচিল ॥”

৯। সুন্দরের অভিসার

সুড়ঙ্গ স্থতির পরই গোবিন্দদাস সরাসরি সুন্দরকে বিভার গৃহে উপস্থিত করিয়াছেন—

“কামদেব জিনি রূপ অতি মনোহর ।
সচকিত সখিগণ দেখিয়া সুন্দর ॥
আচম্বিতে মন্দিরেতে চক্ষুর উদয় ।
কৌতুকেতে বিভাবতী মুকায় লজ্জায় ॥”

এখানে নারিকার গৃহে নায়কের গোপনে প্রথম উপস্থিতির কোন thrill নাই, যেন সবই ঠিক ছিল, সুন্দর গিয়া উপস্থিত হইয়া একেবারে বিচারে বসিয়া গেলেন।

কৃষ্ণরাম সুন্দরের অভিসারোত্তোগের বেশ একটি বর্ণনা করিয়াছেন—

“দিবাকর অন্তমিত হইল প্রদোষ ।
দেখিয়া কবির মনে হইল সন্তোষ ॥
দিব্য বস্ত্র পরিধান স্বর্ণঅলঙ্কার ।
বহুমূল্য গলে শোভে মুকুতার হার ॥
সুন্দর সুন্দর তহু রাজিত চন্দন ।
করিল বরের বেশ রাজার নন্দন ॥
ভাবিয়া পরমদেবী মন্ত্র জপ করি ।
কবির বিবরে প্রবেশে বিভাবরী ॥
বাহিতে বাহিতে পথে থমকিয়া রহে ।
রতির রমণ শরে বলে প্রাণ দহে ॥
গুরু গুরু কাঁপে উরু যুগল হরিষে ।
কৃষ্ণরাম বলে সীত অনিয়া বরিষে ॥”

বলরাম এক কথায় বর্ণনা সাধিয়াছেন—

“সম্পূর্ণ হইল আশে যদি নটবর বেশে
হরষিতে চলিল সুন্দর ।”

রামপ্রসাদ তাঁহার স্বাভাবিক অলংকারবংকারে ভাষাকে ভাষাক্রান্ত করিয়া নায়কের অভিসার বর্ণনা করিয়াছেন—

“বিজ্ঞবর বরাবর বিবরবিশিষ্ট।

হ্রীকৃপিপী হ্রীরাধিনী হৃদয়েতে দৃষ্ট ॥

নিভৃতে নাগর নানা রস করে রঙ্গে।

চন্দনে চর্চিত চারু চামীকর অঙ্গে ॥” ইত্যাদি

মধুসূদন চক্রবর্তীও বলরামের জায় এক কথায় সারিয়াছেন, অভিসার বর্ণনা করেন নাই। ভারতচন্দ্র বৈষ্ণব বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি—

“বিজ্ঞার নিবাস যাইতে উল্লাস

জুহুর জুহুর সাজে।

কি কহিব শোভা রতিমনোলোভা

মদন মোহিত লাজে ॥

চলিল জুহুর রূপ মনোহর

ধরিয়্য বরের বেশ।

নবীন নাগর প্রেমের সাগর

রসিক রসের শেষ ॥

উরু গুরু গুরু হিয়া হুরু হুরু

কীপয়ে আবেশ রসে।

অগ্নে আগে যায় অগ্নে পাছে চায়

অবশ অঙ্গ অলসে ॥

অগ্নেক চমকে অগ্নেক ধমকে

না জানি কি হবে গেলে।

চোরের আচার দেখিয়া আমার

না জানি কি খেলা খেলে ॥”

ভারতচন্দ্র তাঁহার রসমঞ্জরীতে যে অভিসারিক নায়কের বর্ণনা করিয়াছেন, এই বর্ণনার সহিত তাহার তুলনা করা যাইতে পারে—

“দ্বিতীয় প্রহর রেতে মোরে কহিয়াছে যেতে

সময় হইল প্রায় স্থির মন টলিল।

জুথের কে জানে লেখা গেলে মাত্র পাব দেখা

অনেক দিনের পর আজি আশা ফলিল ॥

অন্ধকারে দেখে আলো পৌর লোক দেখে কালো

শঙ্কজনে মিত্রভাব জলে স্থল হইল।

রজনীতে দিবা মত তিমির হইল হত

রূপে জুপথজ্ঞান তাহে মন মোহিল ॥”

(ক্রমশঃ)

আধুনিক বৈষ্ণব গীতকার

শ্রীঅমলেন্দু মিত্র

বীরভূম কবি-ভূমি। ভক্তপুর, থানা নলহাটনিবাসী শ্রীনবীনকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক বাংলা সন ১৩৩০ সালে প্রণীত “পদামৃতলহরী” নামে এক বৈষ্ণব পদাবলীপুস্তকের পাণ্ডুলিপি রতন-লাইব্রেরিতে পাওয়া গিয়াছে। প্রথম খণ্ডে মাত্র ৮০টি পদ ও কয়েকটি প্রার্থনা আছে। দ্বিতীয় খণ্ড পাওয়া যায় না। কবি স্বীয় হস্তে পুস্তকের মলাট-পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—“উপহার, মহারাজা শ্রীযুক্ত শিবরতন মিত্র, সিউড়ী”। (সম্ভবতঃ “বঙ্গীয়-সাহিত্য-সেবক” পুস্তকে তাঁহার পরিচয় দিবার উদ্দেশ্যে মদীয় পিতামহের নিকট উক্ত পুস্তক উপহার হিসাবে আসিয়াছিল)।

এই পুস্তকের পদগুলিতে গ্রাম্য কবির বিশিষ্ট কবিত্বশক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। বাহাই হউক, সুধীর্ষ ইহার ভাল মন্দ বিবেচনা করিবেন। কবি মৃত। পদগুলি কোথাও কোন দিন প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া জানা গিয়াছে। তাই উক্ত পাণ্ডুলিপি হইতে কতকগুলি পদ সর্বজনসমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

(১)

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র

যথা তালেন গীয়তে ।

উহ্লিত মনরথ, উনমত্ত চিত্ত তাহে শুকত ভাব করি ভাণ ।

ব্রজজন ব্রজন যশোমতী নন্দন, ব্রজমোহন বর কান ॥

সো অব শচীমুখ প্রেম বিলাসত, হরিনাম কর পরচার ।

উজ্জল রস মন্দাকিনী, বারা আনি ডুবাওল, ভাগী অতাগী অপার ॥

সঙ্গে রোহিণীমুখ, আর নিজ জন যত, নদীয়া নগরে উদিয়ায় ।

শান্তিপুর দিনকর, সদাশিব অব, ঝটতি মিলল তথি ধাই ॥

উত্তল তরঙ্গ, মৃদঙ্গ কত বাজত, নাচত গায়ত ভলি বিধার ।

ছোরতে জোরে আনি পাপি ডুবাওল বিভাপতি মদ ভার ॥

কাল জ্বাল ভীত করমী মকর দল মিলত সোই পাধার ।

শুকত মীন কত, ডুবত ভাষত খেলত প্রেম সীতার ॥

বীরে বীরে চলি, ভীরে তথি ধারল নবীন ধরম অগেয়ান ।

শীতল বাত, জুরাওল তম্ব মন, অধিক হো অব সমাধান ॥

(৫)

রূপাহুরাগ । গোষ্ঠ

রসের আবেশে শ্রীগৌরসুন্দর ধমকি ধমকি যায় ।
 ক্ষণে ক্ষণে বোলয়ে মধুর সোনার নুপুর পায় ॥
 মুহু মুহু হাস অমিয়া উগারি ধারায় ভরল ধরা ।
 পাঁচনি সাজনি নিছনি পরাণ নাগরী মানস ধরা ॥
 হা রে রে রে রে আর কত বোলে ডাকে ঘন ঘন গোরা ।
 ধরা চুড়া বাঙ্কি দাস গৌরি আদি মিলল আসিয়া ঘরা ॥
 সবে যন্ত চিত্ত বাছুরী লইয়া চলল জাহ্নবী কূলে ।
 ভুলল নবীন আপনা সঁপিয়া বিকাণ্ডল বিনি মুলে ॥

(৬)

রূপাহুরাগ

নটবর গৌর বরণ জিনি সুবরণ, আভরণ কুন্দক মাল ।
 নয়ন কমল যুগ ঢল ঢল ছল ছল কুন্ডল কুঞ্চিত ভাল ॥
 ভুরুয়া ভরম কোটি কাম কামান কিরে, কাম করম কর নাশ ।
 আশ হি আশ নাসা তিল ফুল জিনি, অধর বাধুলি পরকাশ ॥
 দশন দাড়িম বীজ দরপ দূর করি, ছাতল চাঁদনী হাস ।
 বাস নিরাশ উদাস মানস মতি, নাশক ধরমক কঁাস ॥
 উরু সুবিশাল সুন্দর মণিমালে শোভন ক্ষীণ কটি ভুবনমোহন ।
 শ্রীকর চরণ কর ভকত ভয় ভঞ্জন অহুদিন নবীন শরণ ॥

(১০)

পূর্বরাগ

সুবরণ বরণ বরণ নহে সমভুল, বরণে বরণ হোই ।
 কাঞ্চন কমল বিমল অতি কোমল শীতল পদতল প্রাণ নিছই ॥
 পরিসর বক্ষ কক্ষ অতি সুন্দর, কটিচৈত কেশরী গঞ্জন ।
 মালতীক মাল দোলত উরপর, দোলায়ত জগজ্ঞান মন ॥
 নয়ন কমল ছল ঢল ঢল ঢল চাহনী মধুর মধুর ।
 মুহু মুহু হাস অমিয়া কত উগারই দীন নবীন রসপুর ॥

(১৮)

শ্রীশ্রীগৌরানন্দরূপ

তাল একতাল

শচীনন্দন,	অগমোহন,	কাঁচা কাঞ্চন	কাঁতি দেহা ।
শ্রেমি আগর,	রস সাগর,	ভাব সাগর	চিত্ত লেহা ॥
কুল নাগরী,	রূপ বাঙড়ি	অরিতা পরি	মন জীনা ।
গেহ অন্তর,	সম প্রান্তর,	ব্যাকুলান্তর	অহুহিনা ॥
অরি কীর্জন,	গোরা নর্জন,	শ্রেম বর্জন	কুলক্ষীণা ।
বিধি বঞ্চিত,	কৃপা কিঞ্চিত,	সদা বাঞ্ছিত	এ নবীনা ॥

(১৯)

শ্রীশ্রীগৌরহরির রূপ

দশহুশি

ভুবন রঞ্জন গৌরহরি ।

নিরমল কাঞ্চন বঞ্জন সুবরণ

কি বরণী রূপের মাধুরী ॥

কিবা সে চুড়ার ছাঁদ রমণী মোহন কাঁদ

ভক্তরা শতেক অরণ্য ॥

অকণিম ছুটি আঁধি কটাক্ষে কি রাখে বাকি

ছরস্তু কুসুমশর অহু ॥

প্রায় সে ত্রিভঙ্গ অঙ্গ অবর অতি সুরঙ্গ

তাহে মধুর মুহ হাস ।

কিয়ে পুরুষ কামিনী, ধ্যানে জাগে যামিনী

কুল শীল ধরমে উদাস ॥

চরণ নথর ভাতি কত কত চাঁদ কাঁতি

দিবা রাতি সমান উজোর ।

সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন রাইকান্তি আবরণ

এ দাস নবীন মন ভোর ॥

(২১)

কন্দর্প দশহুশি

ধির দামিনী ভাতি জিনিয়া অদ্বৈত কাঁতি

গৌরান্দ্র লাবণ্য রসপুর ।

কত না চাঁদনী ছানি তাহাতে মাখান পো
 মনন দরপ করে চুর ॥
 কলঙ্ক মাজিয়া চাঁদে খানি খানি করি কিয়ে
 নখছাঁদে রাখিল বসায়।
 দেখে রে ধরিছে স্তম্ভা বুঢ়াতে অধিল ক্ষুধা
 পিয়ে স্তম্ভ চকোরে বক্ষিয়া ॥
 লোভ সধরিতে নারি কত সে নবীনা নারী
 আপনা পাসরি ধায় পাশে।
 নাচাইয়া মন নটে না চাহিয়া বিধিপটে
 ঘাটে বাটে নবীন উদাসে ॥

(২৪)

শ্রীমতী রাধিকার পূর্বরাগ

সজনি ! কালিয়া কি যোগ মন্ত্র জানে।
 অবলা ধরম হরে মুরলীর তানে ॥
 কুল শীল লাজ গুরু গৌরব, সব হরি করল বিভোর।
 নয়ন উপেখি শ্রবণ পথ বাহিয়ে ধৈর্য তোড়ল মোর ॥
 সখি ! অব হাম কি কহিব তোহী।
 রোহি রোহি দিন যামিনী ষাগন, ধরম করম ইহ হোই ॥
 কুটিল কীট কোন যহু প্রাণ কোরক কাটরী কঠিন না জান।
 পঙ্কর জর জর, অন্তর গর গর, অন্তর শরণ বিধান ॥
 ধিক ধিক জনমে অধিক ধিক জীবনে ধিক বিহিকৃত বিঘটন।
 দারিত্র্যক আশ অবিগ হেম মুচক সূচক নবীন নূতন ॥

(২৯)

শ্রীমতীর লালসানুরাগ

কালার পিরীতি ভাবি দিন রাতি পাঙ্কর ঝাঁঝর কৈহু।
 না ভায় গৃহকাজ, গুরুজন সমাজ, কত না গঞ্জনা সৈহু ॥
 পাড়া প্রতিবাসী, করি হাসাহাসি, কত না ইঙ্গিত করে।
 কাহুর পিরীত পিই না বুঝিহু, রিতি রহ বহু দুরে ॥
 মনের কথা কহিল না হয়, হাসিতে কাঁদনে রটে।
 বসি নিরঞ্জে মনে মনে মেনে, কত কত সাধ উঠে ॥
 আপনার মনে মিলি তার মনে, কত না বলিয়ে রোবে।
 সে রশের বঁধু, করে কর ধরে, কত না আদরে তোবে ॥

সে সুখ আবেশে, বসি নিজ বাসে, হাসিয়ে মিছাই আশে ।
পাপিনী নন্দী, বরজ বচনে, সে সুখ তখনি নাশে ॥
ভাঞ্জে সুখ হাট, পিরীতি কপাট, ছটফট করে প্রাণ ।
নবীন পিরীতি না জানে নবীন, কিছু করে অসুখান ॥

(৩৩)

আক্ষেপামুরাগ

ভাল—দশহুনি

সখি ! হাম না জীবব আর ।

কামু অমুরাগ, কালিয় বিবে জারল, কোন করব পরকার ॥ ঐ ॥
তাপে দগধ তম্বু, পুনঃ নাহি দগধবি, বান্ধবি মাধবি পাশ ।
কবছ পুছি জ্ঞানব, দেখব মাধব, জীবন ছোড়ল মনু আশ ।
এত কহি স্তম্বরী, দীঘল শ্বাস ছোড়ি, ধর ধর কম্পিত তেল ।
ধারি ধরল সখি, ঝটকি নবীন দূতী, কামু আনিতে চলি গেল ॥

(৪৪)

শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ

কালিন্দী কুলে কামিনী-কুল-মণি এক পেখলু করিতে সিনান ।
নয়নে নয়ন লাগি নিমিষ মিশাইতে তৈখনে হরল গেলান ॥
সখা রে কি কহব তাকর কীতি ।

প্রান্তর অঙ্কণ সমান চরণতল, করতল কোকনদ ভাতি ॥ ঐ ॥
সুখ সরোবর কিয়ে বদন সুমাধুরী খেল তৌহি দিগ্ধি মীন জোর ।
চিবুক উপর হেরি হেম কমল হেন লাজে নলিনী নীর কোর ॥
নাসা অতি রঞ্জন ধগপতি গঞ্জন, তাকর দরশ তরাসি ।
নাভি বিবর ছোড়ি রোমাবলি ছল ধরি তাপে তুলসী হেন বাসি ॥
গুপত গামিনী সহ সাপিনী পাওল উচ কুচাচল তল স্থান ।
না আনিয়ে অলঙ্কিতে মোখে বুঝি দংশল তব ধরি জলত পরাণ ॥
সোই সুধাকর মুখি মুখ চুষন জীবন ওষধি এক জ্ঞান ।
নবীন কহয়ে বাকা দশা তব নয় একা লেখা করি সমান সমান ॥

(৪৭)

শ্রীকৃষ্ণ আশুদূতী প্রাতি

ভাল—লোফা

এ সখি ! বোলবি তাহে মনু বাণী ।

আপনি আপন তম্বু মন প্রাণ সমগিছ
রমণী রতন তাহে জ্ঞানি ॥

ইথে কি উদাস এতেক তাক সমুচিত
 বৈঠল গুরুজন মাঝ ।
 কুল ভরম কি রতন করি মানল
 হামারি হৃদয়ে হানি বাজ ॥
 তছু প্রেম বারি বিনহি মো জীবন মীনে
 জীবহিতে সংশয় ভেল ।
 নিচয় পুরুষ বধ পাপ তাক লাগব
 কোন যুবতি অছু দেল ॥
 তাকর মুরতি দিয়ান ধরি দিন রাতি
 জাগি খোয়াওহু দেহা ।
 গোঠ মাঠ ঘাট বাট হাম মুরত তহি
 কৈছন তাকর লেহা ॥
 তাক দরশ লাগি যেহু চরাওঞী
 ধারহি কদম্ব কি ওয় ।
 নবীন প্রেম পীযুষ পান আশয়ে
 যৈছন চাঁদ চকোর ॥

(৬১)

শ্রীকৃষ্ণের রূপ

তাল—একতাল

অগরজন,	ঘনগজন,	নয়নাগন,	গতিদাতা ।
বিধুলাজন	স্থিতিবজন,	কৃতি মুগ্ধন	মতি মাতা ॥
কুলতঞ্চক,	গৃহবঞ্চক,	রত্তিরঞ্চক	রসদাতা ।
শীল কণ্টক	লাজ কণ্টক,	প্রাণপঞ্চক	পরিণেতা ॥
অনঙ্গক	প্রেমব্যঞ্জক,	অধাসিক্তক	বিতরেতা ।
ভয়ভঞ্জন	মোহমুক্তক,	নবীনাক্তক	স্বত্বরেতা ॥

(৫৮)

সংক্ষেপ মিলন

তাল—একতাল

দৌহে দৌহা রতি, আরতি পিরিতি বিষম বিগতি দশা ।
 সকরুণ মতি, দৌহার নিজ দূতী, দ্রুতগতি ঘনদ্বাসা ॥
 বাঁহা বাঁহা স্থিতি, কমল ঝটিতি, নয়নে গলয়ে লোর ।
 শুনি দুহুজন, উৎকণ্ঠিত মন, ধৈর্য না নামে ধোর ॥

আপন আপন, বিজন নিবাসে, ধরণী লোটায়ে রোই ।
 নিজ নিজ দূতী, আশ্বাসে কত না প্রবোধ নাহিক হোই ॥
 শত কালকূটে জারল যেমতি তেমতি হওল দে ।
 ধর ধর ধর কাঁপে কলেবর জদয়ে না বাঞ্চে থে ॥
 সময় বুঝিয়ে, যতন করিয়ে, দৌছে দৌহা অভিসারি ।
 মিলাওল আনি, শুকাওল প্রাণ পাওল পিরিতি বারি ॥
 নব তরঙ্গ প্রথম সঙ্গ, ভাসল লুপ্ত বারিষি ।
 সঙ্কীর্ণ সনে নবীন মাতল প্রেমের নাহি অবধি ॥

(৬৪)

শ্রীমতী রাধিকার রূপ

তাল—একতাল

রাজনন্দিনী,	ব্রজবন্দিনী,	গজগামিনী	রসধামা ।
কুলকামিনী,	জিতদামিনী,	পরিবন্ধিনী	ধনস্তামা ॥
শ্রীতসাদিনী,	হিতভাবিনী,	মিতহাসিনী,	কত রামা ।
অলুসঙ্গিনী,	নবরঙ্গিনী,	মৃগ (অ)পাদিনী	হৃদকামা ॥
নবভাবিনী,	প্রতিরঙ্গিনী,	প্রেমবাহিনী	নিরুপমা ।
কাহ্নতোষিনী,	ভুবানামিনী	নবীনামিনী	ধ্যানগামা ॥

প্রার্থনা

বাড়ল প্রেমের ঢেউ ।

আমি পিরীতি তরঙ্গে এ তলু ডারব রাধিতে নারিবে কেউ ॥

মাতল মানস যীন ।

প্রেমধারা ধরি বহিয়া যাওব কুল শীল করি জীণ ॥

জাগল হিয়াত প্রাণ ।

আমি গোরা অলুরাগে এ ঘর তেজব বেদবিধি করি আন ।

আয় । কে যাবি আমার সাথে ।

যে পথে পৌর কীর্তনে নাচিবে সে পথে যাইব সাথে ॥

আর না ফিরিব ঘরে ।

আঁচল পাতিয়া কলঙ্ক লইব যে বলু সে বলু পরে ॥

এবার গৃহকাজ হল সারা ।

গোরা তলুখানি যেখানে ছুখানি সে বাসে পরাণ ভোরা ॥

সেই সে আমার হিত ।

গোরা গুণে তার ছুটি আঁধি সুরে সেই সে নবীন মিত ॥

লিঙ্গ

ত্রীনবীগোপাল দাশশর্মা

প্রাচীন ভাষায় বৈয়াকরণগণ বাক্যস্থ পদের রূপবৈচিত্র্য অবলোকন করিয়া প্রাতিপদিকগুলিকে দুই অথবা তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। এই বিভাজক সংজ্ঞার নাম লিঙ্গ। সংস্কৃত, পারসী, গ্রীক, ল্যাটিন, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় প্রাতিপদিক তিন ভাগে এবং উর্দু, আরবী, হিন্দী, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষায় প্রাতিপদিক দুই ভাগে বিভক্ত। দুই ভাগের নাম পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ এবং তিন ভাগের নাম পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। এই লিঙ্গসংজ্ঞার সহিত শব্দের প্রতিপাত্ত পদার্থের কোন সম্বন্ধ নাই, শব্দের সহিতই সম্বন্ধ। শব্দের দ্বারা কোন পুরুষজাতীয় পদার্থ বুঝাইলেও, তাহা পুংলিঙ্গ হইবে, ইহা মনে করিবার কারণ নাই। সেই প্রকার স্ত্রীজাতীয় পদার্থ বুঝাইলেও, তাহা স্ত্রীলিঙ্গ নাও হইতে পারে। যেমন দার, পত্নী ও কলত্র—এই তিনটি শব্দের অর্থই স্ত্রী, তাহা হইলেও দার = পুংলিঙ্গ, পত্নী = স্ত্রীলিঙ্গ এবং কলত্র = ক্লীবলিঙ্গ। পুরাতন ইংরাজীতেও দেখা যায় woman পুংলিঙ্গ, queen স্ত্রীলিঙ্গ এবং wife ক্লীবলিঙ্গ। এই তিনটি শব্দের অর্থই woman। “Woman, queen and wife were synonymous in Old English, all three meaning ‘woman’ but they were masculine, feminine, and neuter respectively.” Our Language, by Simeon Potter. এই প্রকার এই গ্রন্থে আরও অনেকগুলি শব্দের প্রাচীন ইংলিশের লিঙ্গ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। বর্তমান ইংরেজীতে এই প্রকার লিঙ্গবিভাগ প্রায় পরিত্যক্ত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে অতঃপর বিশেষভাবে আলোচনা করা হইবে।

বহু-অর্থে মিত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ, স্বর্ষ অর্থে পুংলিঙ্গ। সেই প্রকার আত্ম জন্ম প্রভৃতি শব্দ, বৃক্ষ বুঝাইতে পুংলিঙ্গ, ফল বুঝাইতে ক্লীবলিঙ্গ। দয়া, কৃপা, উন্নতি, বেদনা, পিপাসা প্রভৃতি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। অম্লগ্রহ, আনন্দ, বিকোষ, উপদেশ, আচার্য, ব্যবহার প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ, এবং হৃৎ, হুঃ, শয়ন, ভোজন প্রভৃতি শব্দ ক্লীবলিঙ্গ। অস্ত্রাস্ত্র ভাষাতেও ঠিক এইরূপ; শব্দগুলির যাহাই অর্থ হউক না কেন, তাহারা বিশেষ বিশেষ লিঙ্গের অন্তর্গত। লিঙ্গ অনুসারে ইহারা পৃথক পৃথক রূপ গ্রহণ করে এবং ইহাদের বিশেষণ ও সর্বনাম সম্পূর্ণভাবে ইহাদেরকে অনুসরণ করিয়া সেই সেই লিঙ্গের নির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করে। মূল শব্দটি স্ত্রীলিঙ্গ হইলে, বিশেষণ ও সর্বনামকেও স্ত্রীপ্রত্যয়ের নিয়ম অনুসারে প্রত্যয়যুক্ত করিয়া রূপান্তরে পরিবর্তিত করিতে হয়। প্রতিপন্ন অর্থ, ইহাই যে বিভক্ত্যন্ত রূপ, বিশেষণ ও সর্বনাম সর্বদা লিঙ্গসংজ্ঞার অপেক্ষা করিয়া থাকে। এক্ষণে সংস্কৃত ভাষায় কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বক্তব্য পরিষ্কৃত করা হইতেছে। অন্নং বালকঃ বুদ্ধিমান, ইয়ং বালিকা বুদ্ধিমতী, এষঃ গ্রন্থঃ মনোহরঃ, এষা পুস্তিকা মনোহরা, এতৎ পুস্তকং

মনোহরম্। তন্ত দারাঃ বুদ্ধিমন্তঃ স্তম্বরাঃ চ তন্ত পত্নী বুদ্ধিমতী স্তম্বরী চ, তন্ত কলত্রং বুদ্ধিমং স্তম্বরং চ। উদাহরণগুলিতে বালকঃ, ঐশ্বঃ দারাঃ পুংলিঙ্গ, ইহাদের বিশেষণ এবং বিশেষণ-রূপে ব্যবহৃত সর্বনাম পুংলিঙ্গের রূপে রচিত হইয়াছে। বালিকা, পুস্তিকা ও পত্নী স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুস্তকং কলত্রং স্ত্রীলিঙ্গ, স্তম্বরং ইহাদের বিশেষণ ও সর্বনাম যথাক্রমে স্ত্রীলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ হইয়াছে।

উত্তরপদপ্রধান সমাসে অর্থাৎ তৎপুরুষ সমাসে এবং তদন্তর্গত কর্মধারয় ও বিশেষ সমাসে উত্তরপদের লিঙ্গ অল্পসারে শব্দের রূপ রচিত হয়। সেই হেতু ইয়ং স্ত্রী বুদ্ধিমতী বা বিচুযী হইলেও, অয়ং স্ত্রীলোকঃ বুদ্ধিমান্ বা রিষাম্—এই প্রয়োগই প্রশস্ত হইবে। এখানে স্ত্রী শব্দের সহিত লোক শব্দের সমাস হইয়াছে, সমাসবদ্ধ পদের অর্থ নারী বুঝাইলেও, লোক শব্দটি পুংলিঙ্গ; এবং উহার উত্তরই বিভক্তি যুক্ত হইয়াছে। স্তম্বরং সমগ্রপদের পুংলিঙ্গ সিদ্ধ হওয়ায় সর্বনাম ও বিশেষণ পুংলিঙ্গের অন্তর্গত হইল। এইরূপ স্তম্বরঃ নারীগণঃ আগচ্ছতি, এখানে ‘গণ’ শব্দের পুংলিঙ্গহেতু বিশেষণ পুংলিঙ্গ হইল।

মুরোপীয় অজ্ঞাত ভাষায় বিশেষণে লিঙ্গগত পার্থক্য থাকিলেও, ইংরাজী ভাষায় বিশেষণে লিঙ্গগত কোন পার্থক্য নাই। সর্বনামের মধ্যে He, She ও It এই তিনটি মাত্র সর্বনামের যথার্থ প্রয়োগ সিদ্ধির জন্য Noun অর্থাৎ naming word এর লিঙ্গ নির্দেশের প্রয়োজন হয়।

ইংরাজী ভাষায় সাধারণতঃ পুরুষজাতীয় জীববাচক শব্দ পুংলিঙ্গ, স্ত্রীজাতীয় জীববাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। তদন্তর্গত পদার্থবাচক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গের অন্তর্গত, এইপ্রকার নির্দেশ দেওয়া হয়। তবে পুরুষ ও স্ত্রী ভিন্ন কয়েকটি শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গের অন্তর্গত করা হয়। যেমন—Moon, Ship এবং Country. প্রাচীন ইংরাজীতে পাওয়া যায়—“*Horse Sheep and Maiden were all neuter, Earth, Mother Earth, was feminine, but land was neuter. Sun was feminine, but moon, strangely enough, masculine. Day was masculine, but night feminine. Wheat was masculine, oats feminine; and corn neuter.*” Our Language, by Simeon Potter. বর্তমান ইংরাজীতে প্রথমোক্ত নির্দেশ থাকিলেও অনেক স্থলেই মনুষ্যোত্তর প্রাণিবাচক শব্দের জন্য সর্বনামের প্রয়োজন হইলে it এই স্ত্রীলিঙ্গাত্মক সর্বনামের ব্যবহার দেখা যায়। He, she কদাচিৎ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। Moon এর জন্য she ব্যবহৃত হইলেও countryর জন্য it এর ব্যবহার হয়। এই সকল প্রয়োগের অল্পসংখ্যান দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, মনুষ্যবাচক শব্দেই he এবং she এর প্রকৃত সদ্যব্যবহার হইয়া থাকে। মনুষ্যের অল্পরূপ ধর্ম ইতর জীবে প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, তাহাদের উপর he she এর প্রভাব বিস্তৃত হয়, নতুবা itই সর্বত্র কার্য সাধন করে। যাহাই হউক না কেন, এই তিনটিমাত্র সর্বনামের ব্যবহারে সাহায্য করা ব্যতীত ইংরাজী ভাষায় লিঙ্গসংজ্ঞার কোনও প্রয়োজন নাই।

এক্ষণে দেখা যাউক, বাঙ্গালা ভাষায় লিঙ্গসংজ্ঞার প্রয়োজন আছে কি না। বাঙ্গালা ভাষায় মনুষ্যবাচক পুরুষ বা নারী, যাহাকেই বুঝাক না কেন, তাহাব অল্প সর্বনামের কোনও পরিবর্তন হয় না। মনুষ্যেতর প্রাণিবাচক শব্দের, কিম্বা অপ্রাণিবাচক শব্দের পরিবর্তে যে সর্বনাম ব্যবহৃত হয়, তাহাও লিঙ্গসংজ্ঞার অহসরণ করে না। বিশেষণাত্মক সর্বনাম মনুষ্যবাচক শব্দ, মনুষ্যেতর প্রাণিবাচক শব্দ এবং অপ্রাণিবাচক শব্দের সহিত প্রায় এক রূপেই ব্যবহৃত হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মনুষ্যেতর প্রাণী বা অপ্রাণীতে মনুষ্যধর্মের অর্থাৎ জ্ঞানাত্মকরূপ ধর্মের আরোপ করিলে, মনুষ্যবাচক শব্দের অল্পরূপ সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। সুতরাং সাধারণ লিঙ্গসংজ্ঞা দ্বারা শব্দ যে তাবে বিভক্ত, তাহার কোন প্রকার সম্বন্ধই ইহাতে নাই।

শব্দরূপেও দেখা যায়, মনুষ্যবাচক শব্দ, তাহা পুরুষজাতীয় পদার্থবোধকই হউক, আর স্ত্রীজাতীয় পদার্থবোধকই হউক, সকলেরই রূপ এক নিয়মে গঠিত। তদিতর শব্দ প্রাণি-বাচকই হউক, আর অপ্রাণিবাচকই হউক এক নিয়মে গঠিত। এই দুইটি নিয়মের মধ্যে মাত্র বিত্তীয়া বিভক্তিতেই কিঞ্চিৎ পার্থক্য ঘটিয়া থাকে, অল্পত্র নয়। তবে বাক্যে বিশেষণ থাকিলে অনেক সময়, সকল প্রকার শব্দের রূপই এক নিয়মে গঠিত হয়। সুতরাং অস্ত্রাঙ্গ ভাষায় ছায় ইহাতে শব্দরূপচর্চায় লিঙ্গসংজ্ঞার কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

লিঙ্গ সংজ্ঞার যে প্রভাবটুকু বাঙ্গালা ভাষার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, তাহার সামান্য অংশই নির্ভর করিতেছে কয়েকটি বিশেষণের উপর। তবে ইহাও বাঙ্গালার নিজস্ব কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে। ছোট, বড়, ভাল, মন্দ, কঠিন, নরম, সাদা, কাল, ধল, নীল, লাল, নূতন, পুরাণ, সোনালী, রূপালী প্রভৃতি বিশেষণের এবং এই প্রকার আরও অনেক বিশেষণের লিঙ্গগত কোনরূপ বৈচিত্র্যের সন্ধান মিলে না। সংস্কৃত ভাষা হইতে আহৃত অনেক বিশেষণ একরূপেই বিভিন্ন লিঙ্গের শব্দের সহিত ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা ধাতু হইতে নিম্পন্ন বিশেষণ, বৈদেশিক ভাষা হইতে আহৃত বিশেষণ প্রভৃতিতেও রূপের কোন পার্থক্য নাই।

বালকটি সুন্দর, বালিকাটি সুন্দর বা সরল, ভাষা কোমল, লতাটি সুন্দর, ফলটি মিষ্ট, কথা মিষ্ট, নদী বিশাল, জ্যোৎস্না মনোহর, রাজি গভীর প্রভৃতির ব্যবহার বাঙ্গালায় অনবরত হইয়া আসিতেছে। বালিকাটি সুন্দরী বলিলেও, লতাটি সুন্দরী, তাহার কথা মিষ্টা, এই পুস্তকের ভাষা কোমলা, এই প্রকার ব্যবহার কেহ করেন বলিয়া জানা যায় না।

বাঙ্গালা সাহিত্যে গুণবান্, বিদ্বান্ ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি, বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী স্ত্রীলোক, দেহধারণোপযোগী খাদ্য, পরোপকারী মন বা মনোবৃত্তি মনোরম সঙ্গীত ইত্যুৎকর্ণনিভ শয্যা, মঙ্গলাকাজী মাতা, অঙ্গকারাচ্ছন্ন রজনী প্রভৃতি প্রয়োগের অভাব নাই। এই প্রকার বহু প্রয়োগ আছে, যাহাতে লিঙ্গ সংজ্ঞার কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। সামান্য অল্পধাবন করিলেই বুঝা যাইবে যে, সংস্কৃতে বিশেষণগুলির পুংলিঙ্গে বেরূপ হয়, ঠিক সেই রূপেই সকল লিঙ্গের সঙ্গে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এক সময় সংস্কৃতির ঐশ্বর্য্যে এই সকল

প্রয়োগে শব্দানুসারে লিঙ্গগত বৈচিত্র্যের ব্যবহার থাকিলেও, এক্ষেপে তাহা ক্রমশঃ অপসৃত হইয়াছে। এই লিঙ্গগত নিরপেক্ষতা ভাষাকে সরলতার পথেই লইয়া যাইতেছে। পুনরায় উহা যথাস্থানে প্রয়োগের চেষ্টা করিলে, জটিলতা বৃদ্ধির দিকেই অগ্রসর হইবে। বাঙ্গালার স্বচ্ছন্দ গতি ব্যাহত হইবে। আনি না সুধীবৃন্দ ইহার সমর্থন করেন কি না।

বহুপ্-মহুপ্-প্রত্যয়ান্ত বিশেষণ এবং কল্পপ্রত্যয় নিম্নায় বিবস্ বিশেষণ পুংলিঙ্গরূপে জীর্ণাতির সম্বন্ধে প্রয়োগ করিলে, কিছু অতিকটু হইয়া থাকে, যেমন মহিলাটি গুণবতী, বুদ্ধিমতী, বিদুযী না বলিয়া, মহিলাটি গুণবান্, বুদ্ধিমান্, বিদ্বান্ বলিলে অশ্রাব্য হয় না। অবশ্য এইগুলিকে বিধেয়-বিশেষণ রূপে ব্যবহারে লিঙ্গের প্রশ্ন না উঠানও যাইতে পারে। কারণ, শব্দগুলি প্রকৃতপক্ষে পারিভাষিক হইয়া দাঁড়ায়, অর্থাৎ এই রূপের দ্বারা তৎতদ্বর্ণ-সম্পন্ন নারীকেই বুঝাইয়া থাকে, ইহাদের পর পুংক্ বিশেষ্যপদের প্রয়োজন হয় না। সুন্দরী শব্দও ঠিক এইপ্রকার, অসাধারণ সৌন্দর্য বিশিষ্ট নারীর সমানার্থক শব্দ। বাহা হউক, এই কয়েকটি সংস্কৃতমূলক বিশেষণ ব্যতীত, অল্পত্ন লিঙ্গ সংজ্ঞার প্রয়োজন বাঙ্গালায় পাওয়া যায় না। অভাব ইহাকে লিঙ্গনিরপেক্ষ ভাষা বলা যাইতে পারে।

মুকুন্দ কবিচন্দ্রকৃত বিশাললোচনীর গীত বা বাণুলীমঙ্গল

॥ ছন্দ ॥

মনে মনে হাসে চণ্ডী পড়িল চামর ।
উদগ্ধজ্য দ্বিতিস্তত কাঁপে ধরধর ॥
রণে লাঞ্চে মহাসুর বলে মার মার ।
আকর্ণ পুরিয়া দেই ধমুকটকার ॥
ধর তিন বাণ ছুড়ে ধমকের গুণে ।
অর্গ মর্গ পাতাল ব্যাপিল তিন বাণে ॥
আসে পলায় বিধি দেব হরিহর ।
পবন বরুণ বর্ষরাজ প্রবলর ॥
বসু সন্ধ্যা বসুমতী পুণ্যজননাথ ।
রবি শশী বলে আজি পড়িল প্রমাদ ॥
জনমিঞা যুবতী করিল কোন কাজ ।
সহিতে নারিল যুদ্ধ হইল বড় লাজ ॥
তেজিয়া বিক্রম সুরগণে তেজে অজ্ঞ ।
জীবনে কাতর কেহ না সম্বরে বজ্র ॥
পলায় দেবতা দেবীগণ নাহি রহে ।
[২৮ক] একেলা ত্রিপুরা প্রাণপণে যুদ্ধ সহে ॥
উরটে উপাড়ে শিলা পর্বত বিশাল ।
উপাড়িল গাছ গিরিসম যার ডাল ॥
কোপে দেবী ক্ষেপে বৃক্ষ পর্বত সমগ্র ।
ধমুক ভাঙ্গিয়া বীর পড়িল উদগ্ধ ॥
বিষম হস্তীর দস্ত মুটকীর ঘায় ।
তাম্র অঙ্ক বাণে ধরনী লোটায় ॥
উগ্রাস্ত্র উগ্রবীর্ঘ্য বীর মহাহুহু ।
ত্রিপুরা বিক্ষিপ্ত শূলে তিনজন্যার তহু ॥
অসি ভিক্ষিপাল বীর পড়িল বিভাল ।
পড়িল পর্বত যেন পরশে পাতাল ॥
যত সৈন্ত পড়ে দেখে মহিষ দারুণ ।
ভগবতী ত্রিপুরা ধমুকে দিলা গুণ ॥

ধর শর যুগল ধমুকে দেই টান ।
দৃঢ় বাম মুষ্টিক দক্ষিণ ভুজে বাণ ॥
ক্ষেপিল যুগল শর করিয়া সন্ধান ।
হুর্ধ্বর হুর্ধ্ব পড়ে তেজিয়া পরাণ ॥
পড়িল সকল সৈন্তে দেখে দৈত্যনাথ ।
আনন্দে পুরিল তহু না জানে বিপদ ॥
ধরিয়া মহিষতহু কোপে লাঞ্চে রণে ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপূবাচরণে ॥০॥

॥ বাঙারি অথ মল্লার ॥

বীর বুকে রে পাতিয়া অবতার ।
কহে মেবগণে আজি নাহিক নিস্তার ॥
ধরণীর ধূলি পেলে চরণকমলে ।
গগনমণ্ডল ব্যাপিল আঁঘিয়ারে ॥
শূল যুগল দেই পর্বতের মূলে ।
ঈষতে টানিয়া পেলে গগনমণ্ডলে ॥
চারি ধূর আরোপে কুশের লাগে পিঠে ।
ক্রোধিত মহিষ অনল জ্বলে দিঠে ॥
ঈষত কাঁপায় শূল যেন মেঘদণ্ড ।
বিশেষ পাইয়া মেঘ হইল ধণ্ড ধণ্ড ॥
ধরমান কুপাণ বিধাণ চুই খান ।
হেট মাথা করি রহে যমের সমান ॥
শত শত পর্বত ডেড়ে নাসিকার ঝড়ে ।
লেজের বিক্ষেপে সপ্ত সমুদ্র উথলে ॥
টল টল করে ক্ষিতি রড় দিয়া বুলে ।
বীরডাকে দেবতা মূর্ছিত হইয়া পড়ে ॥
মহিষবিক্রমে কো[২৮]পে কাঁপে ভগবতী ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥

॥ বারাদি ॥

দৈত্যপ্রভু দেবরিপু মহিষ দুর্জয়বপু
জয় অজয় রণমাঝে ।
বাড়ে বীর অবিরত যেন বিদ্যাপর্যন্ত
দেখিয়া তরাস দেবরাজে ॥
বিষাণে জলধি বিক্ষে রবি শশী পথ রুদ্ধে
ডরে কুর্খ কাঁপে ধর ধর ।
চণ্ডীর সমুখে চলে চরণকমলভরে
ঘন পড়ে উঠে কলীধর ॥
বিষম বিক্রম করে কোন জন বধে ধুরে
শূন্নে বিদ্যারে কোন জনে ।
লেজের বিক্ষেপে মারে বদনে প্রহারে কারে
কোন জন বধিল ভ্রমণে ॥
ছাড়য়ে বিষম ডাক কুমারের যেন চাক
ফিরে চক্ষু অরুণ কিরণ ।
ধাম বীর অতি বেগে কেহ দেখে নাহি দেখে
মুচ্ছিত পড়য়ে দেবগণ ॥
মরুতান্নি ধর্মরাজ রাজ রাজ দ্বিজরাজ
আয় যত দেবতা কাতর ।
পলায় দেবের জেষ্ঠ লাজে মাথা করে হেট
জিহ্বা বিক্ষুব্ধ গাঙ্কশেখর ।
নাসিকাপবনঝড়ে কারে ক্রিত্তিতলে পাড়ে
সিংহে বধিতে করে মন ।
পূরে দেবী সিংহনাদ বাহন যুগের নাথ
মহারবে পুরিল গগন ॥
অধিকা হুকার ছাড়ে অতি কোপে লাফ ছাড়ে
অসিতময়ন শতদল ।
চণ্ডীপদসরসিজে স্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজ
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

ধরশূন্য মহিষ সমুদ্রে অবতরে ।
নাগপাশে ত্রিপুরা বাঙ্কিল দৈত্যেশ্বরে ॥
রণে বন্দী মহাসুর পাইল বড় লাজ ।
তেজিয়া মহিষতলু হৈল শৃঙ্গরাজ ॥

দেখিয়া কেশরী কোপে হানিল ভবানী ।
তৎকাল পুরুষ চর্ম ধর খড়্গাপাণি ॥
মহামায়ার ক্রোধে ভগবতী দেখে ।
হানিল হুকার দিয়া চণ্ডী নাহি সহে ॥
উলটি হানিল চণ্ডী [২০ক] না জানে বিষাদ ।
ছিণ্ডিল পুরুষ গজ হইল অচিরাত ।
দেবীর বাহন সিংহ কর দিয়া টানে ।
কুশিল ত্রিপুরা মায়াগজের গর্জনে ॥
ধরমান রূপাণ হানিলা ভগবতী ।
গজদণ্ড ছিণ্ডিল কুশিরে বহে ক্ষিতি ॥
করহান করিকর নাহি করে ভয় ।
পুন মহাসুর হয় মহিষ দুর্জয় ॥
উঝটে উপাড়ে শিলা পর্ত পাতর ।
স্বর্ণ মর্ত পাতালে কাঁপিল চরাচর ॥
অনুরদলনী জয়া অগতের মাতা ।
কুশিল ত্রিপুরাদেবী মধুপানে রতা ॥
আনন্দে মহিষ নাচে রণমত্তমনা ।
খল খল হাসে চণ্ডী অরুণলোচনা ॥
কুশিল মহিষ রণে বাজে জয়চাক ।
বিষাণে পর্ত বিক্ষে ছাড়ে বীরডাক ॥
অধিকায় পর্ত মারে পেলিয়া বিষাণে ।
অধিকা পর্ত চূর্ণ কৈল নিজ বাণে ॥
বিশাললোচনী বলে গদগদ বাণী ।
শুন রে মহিষ তোর বল বুদ্ধি জানি ॥
ক্ষেণেক গরজ বুঢ় রণে মহারজ ॥
মধুপান করি আমি তাবদ বিলম্ব ॥
আমার বচন কোন কালে নহে মিথ্যা ।
হানিলে মস্তক তোর গর্জিব দেবতা ॥
এ বোল বলিয়া দেবী লাফ দিয়া উঠে ॥
ত্রিশূল রূপাণ হাথে মহিষের পিঠে ॥
ছুটিল মহিষাসুর যেন বিদ্যাচল ।
দেখিয়া দৈত্যের বল দেবতা সকল ॥
কুশিল ত্রিপুরা ভগবতী সেইক্ষণে ।
গলায় চরণ দিয়া বিক্ষে শূল বাণে ॥

মাথা পাতি মহাস্রব ধীরে ধীরে যায় ।
 মহিবদনে রহে অর্ধখান কায় ॥
 ত্রিপুরার ভেজে অর্ধ শরীর মুকায় ।
 খরখড়াপাণি বীর চিহ্নিল উপায় ॥
 হানিতে উদ্ভম কৈল ত্রিপুরার গায় ।
 মায়া[২২]বিনী বুঝিল দৈত্যের অভিপ্রায় ॥
 হানিল মহিবমুণ্ড ধরণী লোটারায় ।
 পড়িল মহিবদৈত্য বলে হায় হায় ॥
 দিতির নন্দন বিনাশিল ভগবতী ।
 আনন্দ হইল দেব ঋষি করে স্তুতি ॥
 নানারূপ বেণুযন্ত্র বাজায় মুদয় ।
 অঙ্গরাগণে নাচে নহে তালভঙ্গ ॥
 গন্ধর্ব গীত গায় দেবগণপ্রীতি ।
 ত্রিমুখ মুকুন্দ তনে মধুর ভারতী ॥০।

। পাহিড়া রাগ ॥

চামুণ্ডা প্রচণ্ডা চণ্ডবতী চণ্ডরূপা ।
 চণ্ডবিনাশিনী চণ্ডী তুমি কর রূপা ॥
 উজ্জলদশন নবশশীনিরোমণি ।
 প্রোতবিনাশিনী দেবী কিরীটী কুণ্ডলিনী ॥
 কে জানে তোমার মায়া তুমি নগের নন্দিনী
 অনন্তরূপিণী অম্বা বোণীর জননী ॥
 ত্রিমাত্রা ত্রিগুণ ত্রিকা ত্রিশূলধারিণী ।
 ত্রিপুরা ত্রিদেব ধনী কর্পর খড়্গিনী ॥
 বিশাললোচনী নরমস্তকমালিনী ।
 ত্রিপুরসুন্দরী অম্বা বাণ্ডলী রঙ্গিণী ॥
 ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী তুমি মরালগামিনী ।
 কমলা ভগবতী হরিশ্চন্দ্রবাসিনী ॥
 ত্র্যম্বকা জীম্বরী [তুমি] ত্রিপুরধাতিনী ।
 সেবকবৎসলা শিবা হরের গৃহিণী ॥
 ত্রিবন্ধশক্তি জ্ঞানী ত্রৈলোক্য তির্যকী ।
 ত্রিপুরসুন্দরী ব্রহ্ম তৃতীয় ভগবতী ॥
 নিশা সকল লোক শব্দের জননী ।
 কন্দের নিয়মে দেবী দেবারিদলনী ॥

চারিদশ লোকে যত নিবসে স্রুতি ।
 কারণে বুঝিতে পারি যেহিজন সতী ॥
 মহাদি প্রলয়ে মরে ব্রহ্মাদি সীর্ষাণ ॥
 তোমার জীবনপতি না মরে ঈশান ।
 তুমি যারে কর রূপা সে জন মুকুতি ॥
 যন্ত্র সর্বগুণে সেবি ক্রমে শুদ্ধমতি ॥
 আপদ সম্পদ [৩০ক] হেতু শ্রমতি কুমতি ।
 ত্রিমুখ মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০।

। ইতি মহিষাসুরবধ সমাপ্ত ॥

নরৈঃ কিং বর্ণ্যতে চণ্ডী কিং জ্ঞাতেন স্রয়জ্জ্বা ।
 সদাস্ত মতিরস্মাকং ত্রিপুরাপদপঙ্কজে ॥

। পঞ্চম পালা সমাপ্ত ॥

নিবাস্তকবচ পূর্বে ছিল মহাবল ॥
 শুভ্র নিশুভ্র তার তনয় যুগল ॥
 প্রবেশিলা তপোবনে ছুই শুদ্ধমতি ।
 অজ্ঞোহস্ত মানসে ছুই সেবে পত্তপতি ॥
 বাহিরে ভিতরে মম অমধ্যভাগে ।
 নিরবধি ছুই ভাই শিব শিব অপে ॥
 নাসিকায় না লয়ে গন্ধ অনিমিষ আঁখি ।
 যৎপ্র অভিলাষী শ্রোতজলে যেন পাখি ॥
 নয়নে না দেখি কিছু না শুনি শ্রবণে ।
 চিত্তের পুত্তলি যেন রহিল ধোয়ানে ॥
 চারি ছয় দশ বার যোল ছুই কুল ।
 তাহার উপরে পদ্ম সহস্র কমল ॥
 যমুনা ভারতী গঙ্গা বহে এক রূপ ।
 ক্ষুধা তৃষা হরিল নাহিক ভূতভুক ॥
 ফুটিল কমলরাজ দশশতদল ।
 তখি মধু পিয়ে মস্ত চপল ভ্রমর ॥
 বাহিরে চঞ্চল বড় ভিতরে নিশ্চল ।
 স্থলশৃঙ্গ তন্তু তিন লোকে অগোচর ॥
 মধুপানে মাতিয়া ভ্রমরা হুলি খেলে ।
 শক্তিৰূপিণী দেবী প্রকাশিল কোলে ॥

ত্রিপুরার মায়ায় সমাধি পরিহরি ।
কবিচন্দ্র কহে দৈত্য পুঞ্জে ত্রিপুরারি ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

প্রতিমা সাক্ষাত কৈল মহেশ মুরতি ।
তোমার চরণ বিহ্ন আর নাঞি গতি ।
করবন্তি প্রহার করিয়া দশাঙ্গুলি ।
শোণিত করিয়া দ্ব্যত রচিল দীপালি ॥
নৈবেদ্য করিল মাংস ভক্তি অচ্যুতপ ।
দশন করি[৩০]য়া চূর্ণ করে গন্ধধূপ ॥
অস্থি খণ্ড খণ্ড পুগ রসনা তাঘূল ।
তপ করে মন তাঁর নহে প্রতিকূল ॥
কাটিয়া আপন মুণ্ড দেই শিবপদে ।
অখণ্ড কমল যেন ফুটে পুণ্য হৃদে ॥
সেবকবৎসল প্রভু মহেশের বরে ।
পুনঃ পুন হয়ে মুণ্ড যুগল কঙ্করে ॥
শোণিতসম্ভব জবা পুষ্পের বিকাশ ।
তিমির নাশিতে যেন রবির প্রকাশ ॥
অনাহারে ছুই ভাই ষোড়শ বৎসর ।
অবিরত পুঞ্জে নগনন্দিনীদৈবর ॥
আইল বসন্ত ঋতু ফুটে নানা ফুল ।
বিরহী জনের মন হইল আকুল ॥
কোকিল নিনাদ করে কলরব ভুল ।
হেনকালে সাক্ষাত হইলা তোলালিল ॥
ললাটে নূতন শশী শিরে গজা বহে ।
জটিল পুরুষ ভঙ্গ ভূষিলেক দেহে ॥
ত্রিশূল ডমরু ভূজ গলে সিংহনাদ ।
হৃদয়ের মাঝে শোভে ভূজগের নাথ ॥
শ্রবণে ধ্বস্তর ফুল ভূজঙ্গ কুণ্ডল ।
স্মিত উচ্চ সিত গণ্ড ঈষত পাণ্ডুর ॥
মলয় পবন বহে ডাকয়ে কোকিলী ।
কান্ধে লাগে মনোহর সিন্ধা সিদ্ধ ঝুলি ॥
মকর কুণ্ডল কানে ঞন মুখে হালি ।
চন্দ্রিকা প্রকাশে যেন পুণিয়ার শশী ॥

পঞ্চ বয়ন জিনয়ন ভূতেশ্বর ।
পরিত্যা বাধের ছাল বলদ উপর ॥
তন রে নিশ্চিন্ত শুভ ছুই মাগ বর ।
তোরে বর দিয়া যাব ত্রিদশনগর ॥
শঙ্কর বচনে শুভ নিশ্চিন্ত সোদর ।
কাকুতি করিয়া ধরে চরণকমল ॥
চারি চারি মুরতি সকল দেবনাথ ।
যুদ্ধের সময় মোর হব অষ্ট হাথ ॥
যদি বর দিবে মোরে দেব ত্রিপুরারি ।
জিনিব অমরনাথ শাণী হব নারী ॥
তন হিণ্ডি প্রিয়তম বলে শুভামুজ ।
[৩১ক] যুদ্ধের সময় হব অব্যুতেক ভূজ ॥
সত্য সত্য বলে চারিদশলোকনাথ ।
বর দিয়া জুকি শিব জন্মিল উতপাত ॥
ঘোর গরজন মেঘে হয় বজ্রপাত ।
বিজুরি তিমির ঘোর বহে চণ্ড বাত ॥
বর পাইয়া ছুই ভাই পরিতোষ মনে ।
কবিচন্দ্র কহে গেল আপন সদনে ॥০॥

॥ পয়ার ॥

কুটুধ বান্ধব প্রজা পাইল পীরিতি ।
অস্তরে মেলিয়া শুভে কৈল নরপতি ॥
ছুই ভাই সহোদর নিবসে নানা স্থখে ।
জিনিল যতেক দেব ছিল সুরলোকে ॥
তন নৃপ দেবতা ছাড়িল পুন স্থখ ।
শতমথ জিনিঞা হইল মথভুক ॥
চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ গুল্ললোচন ।
যাহার সমুখে স্থির নহে দেবগণ ॥
কি কহিব বিপরীত কালকেয় শৌর্য ।
বিধি হরিহর কাঁপে চলে যদি মৌর্য ॥
ধৌম্র দৌল্লদ কোটিবীর্ষ মহাবল ।
চলিতে বায়বী কাঁপে ক্ষিতি টলটল ॥
দিগ্গজ কাতর হয় কুর্ষে লাগে ভয় ।
রাজি দিবা নহে রবি শশীর উদয় ॥

যে রূপ মহিষ গুপ্ত করে অধিকার ।

আপুনি উদয় চন্দ্র দশ দিগপাল ॥

দেবতা ছাড়িল স্বর্গ অম্বরের ডরে ।

শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে ॥০॥

॥ স্তায়া রাগ ॥

ব্রহ্মা হরিহর অর্পে নিরস্তর ।

ব্রহ্মে দিয়া পুন মন ।

ত্রিপুরাধিক বল নাহিক নির্জ্বর

চারিদশ দেখিল ভুবন ॥

কাম্বে রে দেবগণ ধরণী লোটার

বিষাদ ভাবিয়া মনে বসিল দেবগণে

বিধাতা চিহ্নিল উপায় ॥

দামবদলনী পূর্বে আপুনি

দেবভাগণে দিলে বর ।

ত্রিপুরা ভবানী হরের ধরণী

চিহ্ন অকারণে কর ডর ॥

ব্রহ্মার বাক্যে দেবতার পক্ষে

বিস্মরণ ছিল ভগবতী ।

[৩১] মহিষাসুর বধে তারিলে আপদে

তুমি দেবী দেবতার গতি ॥

রক্ষ রক্ষ হয়- কামিনী উদ্ধার

জিহুবনে হপরাজিতা ।

পূর্বে দিলে বর তারি ব আপদ

অগতঃ স্বরী মাতা ।

জ্বতিপর দেবগণ সশ্বর নিরসন

উপনীত হিমগিরি মাঝে ।

মুকুন্দ রচিল বাঙালীমঙ্গল

ত্রিপুরাচরণাঙ্কে ॥০॥

আর না যাইব ও না পথে ।

পথের কণ্টক যত্ননাথে ॥০॥

নিগুপ্তসোহর গুপ্ত বলে মহাবল ।

দেখিল জ্বিদেব হৈতে দেবতা সকল ॥

জিনিঞা মধ্যম লোক জ্বিদেব পাতাল ।

আপুনি উদয় চন্দ্র দশ দিগপাল ॥

অমর নগরে হৈল জ্বিদেশের নাথ ।

সচী সীমন্তিনী নিত্য পরে পারিজাত ॥

আপনা গুপ্ত করি কেহো কেহো বলে ।

মহুয়া সদৃশ দেব ভ্রমে ক্ষিতিলে ॥

পূর্বে বর দিলে তুমি আপুনি শরী ।

আপুনি নাশিবে যত অম্বরের পুরী ॥

নমো দেবি ভগবতি জ্বর বিফুমায়া ।

দানব নাশিয়া কর দেবতারে দয়া ॥

তব পদে প্রণতি জ্বিদশ একমনা ।

অমতি কুমতি ভয় প্রকৃতি চেতনা ॥

তুমি তুষ্টী তুমি পুষ্টী অগতঃ জননী ।

তুমি লজ্জা মতি ভ্রম ক্ষমা তপস্বিনী ॥

অন্ন জরা যৌবন মরণ বাল্য হেতু ।

প্রহ বার তিথি যোগ অয়ন মাস ঋতু ॥

তুমি অন্ন বিজ্ঞা কমলা অকমলা ।

দশ শত কিরণ পীযুষনিধি কলা ॥

তুমি নিজ্ঞা জাগরণ স্বাহা স্বাধা কান্তি ।

তুমি জ্ঞাতি জ্ঞা তৃষ্ণা নমো দেবি সন্তি ॥

বিবি হরিহর লোক জ্বিদেব রূপিণী ।

স্বজন পালন মহা প্রলয় কারিণী ॥

ভুবনজননী তুমি অনাথের নাথ ।

কাতর জীবন দেব করে কাকুবাৎ ॥

রক্ষ রক্ষ ভগবতি বিষম সঙ্কটে ।

মহাভূষণ উপজিল দেবীর ললাটে ॥

ব্রহ্মে মন দিয়া দেবী করে অবধান ।

জানিল জ্বয়ে [৩২ক] দেবতার অপমান ॥

সেবকবৎসলা হিমধরে অবতরে ।

শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার বরে ॥০॥

॥ মালসী ॥

জ্ঞানের ছলে চারিদশলোকে স্বরী ।

জ্বিদশতটিনীতটে হাথে হেম বারি ॥

মজ্বিতে তাহার জলে গুছে ভগবতী ।

তোমরা সকল দেব করে কর জ্বতি ॥

তন রে সুরধ চণ্ডী উৱিলা আপনি ।
 শক্তিক্লিপণী জয়া দানবঘাতিনী ॥
 কহে জিনয়নী তম্বু তম্বুকত সতী ।
 নিতম্বু তম্বুর তয় মোরে কর স্তুতি ॥
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বৰ যত ক্লতক্লতক ।
 নিৰ্ভয় চলহ সন্তে সুচাইব হুঃখ ॥
 তম্বুকোষে জনমিলা দ্বিতীয় ক্লিপণী ।
 কোষিকী বলিয়া স্তুতি করে দেব মুনি ॥
 প্রথম শরীর তাঁর কৃষ্ণ বিভ্রমান ।
 কালিকাক্লিপণী হিমালয় কৈল স্থান ॥
 কোতুকে নিবসে মধুমতী হিমাচলে ।
 জয় জগজ্জয়ী মোহন রূপ ধরে ॥
 চণ্ড মুণ্ড দেখিলেক তম্বু অম্বুচর ।
 রড় দিয়া কহে গিয়া নুপতি গোচর ॥
 অবধান কর দেব নিতম্বুর ভাই ।
 যে দেখিল নিজ আঁখি নিবেদিত্তে চাহি ॥
 নাসিকাবিবরে ঘন ধর শ্বাস বহে ।
 কহ কহ বলে তম্বু কবিচন্দ্র কহে ॥৩৥

সীমন্তে সিন্দূর সাজে দেখি সশক্তিত লাজে
 শক্রবহু জলদে প্রকাশ ॥
 জিত খগমুনি নাসা বসন্ত কোকিলী ভাষা
 শ্রিত বিকশিত কুম্ভচয় ।
 দেখি তাঁর পদ্মোদর যুগল দাড়িষ ফল
 অভিমানে বিদরে হৃদয় ॥
 জিত কধু তার কণ্ঠ সুবলিত ভুজদণ্ড
 কি কহিব দশনের জ্যোতি ।
 কহি আৰি হুচ করি উপমা করিতে নারি
 সিন্দূরে সিদ্ধ যে জড় যদি ॥
 তাঁর গতি শিখিবারে মরাল মম্বর চলে
 গজরাজ সেবে পুরন্দর ।
 তার মাঝা অভিসাত জিনিঞা যুগের নাথ
 উরুযুগ জিনি করিকর ॥
 নাভি গভীর সর কনক চম্পক দল
 রুচি মনোহর নিভহিনী ।
 তাঁর মুখ কুলগন্ধ তেজে শ্রম মকরন্দ
 অভিনব জিনিঞা পদ্মিনী ॥
 ইন্দ্ৰের পারিজাত গজ তুরগের নাথ
 বিধাতার হংসবিমান ।

তন তম্বু মহাশয় এক কস্তা হিমালয়
 অপরূপ দেখিল অম্বুরী ।
 গন্ধৰ্ব্ব সুকুমারী কিবা সে দেবের নারী
 অম্বুরী কিম্বুরী বিভাধরী ॥
 দেখি তার মুখরুচি মলিন হইল শশী
 উদয় না করে দিন লাজে ।
 প্রবাল বাজুলি ফুল রঙ্গ বিধু নহে তুল
 যদি তাঁর অধরের কাছে ॥
 দেখি তাঁর স্ননয়ন অভিমানে গেল বন
 নগর তেজিয়া কুম্ভসার ।
 দেখিয়া তাঁহার শক্তি গিহিনী চঞ্চলমতি
 কিরি কিরি বুলয়ে সংসার ॥
 দেখিয়া [৩২] তাঁহার কচ চামরী পাইল লাজ
 অভিমানে গেল বনবাঁস ।

যার সখা বুধপতি তার মহাপদ্মনিধি
 তোমার অঙ্গনে বিভ্রমান ॥
 পঙ্কজ গ্রহিত মাল নহে ম্লান অবিশাল
 জলনিধি দিল পরিতোষে ।
 কনক প্রসবে ছত্র বরুণের সেই মাজ
 প্রতিদিন ভব ঘরে বৈসে ॥
 জলনিধি দিল পাশ যাহার অমিঞাতাস
 যত ছিল আপন রতন ।
 উৎকৃষ্ট দান শক্তি বিশেষে করিয়া ভক্তি
 তরে দিল সহস্র কিরণ ॥
 বহিস্তম্ব অম্বর দিল তোমায় সম্বর
 হুতাশন জীবনের ডরে ।
 প্রজাপতি পূর্বরথ তব পদে অহুগত
 যত রত্ন তোমার মন্দিরে ॥

তুমি দৈত্য অধিকারী অচুচিত নাহি বলি
যে দেখিল তোমার কিঙ্কর।

যদি তোমার মনে লয় কর তারে পরিণয়
তুমি নাথ নিমন্তসোদর ॥

চণ্ড মুণ্ড একযোগে কহিল স্তম্ভের আগে
অঞ্জলি করিয়া পুটহাথ।

[৩৩ক] ধনি ধনি ঘোষে জন শুনিঞা হরিষ মন
স্বপ্নীবে ডাকিল দৈত্যনাথ ॥

দূত হইয়া চল তথা পদ্মিনী নিবসে যথা
তার ঠাঞি কথিয় উচিত।

সেবিয়া সারদাপদ আনন্দজনক গীত
বিরচিল মুকুন্দ পণ্ডিত ॥১॥

॥ গৌরী রাগ ॥

স্তম্ভ পুনঃ পুছয়ন্তি ॥

কথ অরে চর রজত ভূধর
পঙ্কজিনী কত রূপ।

স্তম্ভহ সঙ্গর বিজিত নির্জয়
সকললোকভূপ ॥

হরীশবাহিনী নৃমুণ্ডমালিনী
কাতি কর্পর হাথ ॥

অলকনির্মিত কনক কুণ্ডল
বিজিত চামরীনাথ ॥

দশননির্মিত কুন্দকোরক
বদননির্মিত চাঁদ।

নয়ননির্মিত খঞ্জ বিটক
শ্রবণনির্মিত ফাঁশ ॥

সহজ নাগজ তিলকনির্মিত
মিহির মণ্ডল কোটা।

নাসিকা দ্বিত অরুণসোদর
বিহগনায়ক জ্যোতি ॥

ঋহিনির্মিত কুসুম শায়ক
চাপ উদ্ভট রাগ।

কঙ্কলাঙ্কত নয়ন মাধব
কোকিলানন বাক ॥

ভূজবিনির্মিত জলরাহাঙ্কর
কণ্ঠনির্মিত কণ্ঠ ॥

অধর দূষিত বিদ্যা মর্জ্বর
কূচবিনির্মিত শঙ্কু ॥

মধ্যনির্মিত ডমরু স্তম্ভর
নাভিনির্মিত কূপ ॥

শ্রোণীকূষিত কনকনির্মিত
কলস অদ্বুত রূপ ॥

উরবিনির্মিত কুস্ত স্তম্ভর
খণ্ড মধুর জাহ্নু ॥

চরণ দূষিত রকতপঙ্কজ
নখর তারক ভাঙ্গ ॥

দেব নরবর রক্ত সাগর
স্তম্ভ দানবরাজ ॥

বিপ্রকুলোদ্ভব মুকুন্দ মুখবর
সাধ ভূহ নিজ কাজ ॥১॥

॥ যন্ত্রার ॥

নিমন্ত পুনঃ পুছয়ন্তি ॥

দেখিল রূপসী রায় ত্রিপুরকামিনী।

গলে মুণ্ডমালা কাতি কর্পর ধারিণী ॥

[৩৩] চাঁচর চিকুর ঘন কবরীশেখরী।

মালতীর মালা তথি ভুল করে কেলি।

সিন্দূর তিলক চন্দন রেখ ভালে।

দরশ পাইয়া রবি শশী করে কোলে ॥

নয়নে কঙ্কল মুখে হাত প্রবীণ।

বিকচ কমলে যেন চরে কলাটিন ॥

অধর বাজুলি নাগা তিলফুল ভাঁতি।

পাকিল দাড়িষবীজ দশনের জ্যোতি ॥

কনক কুণ্ডল দোলে শ্রবণের মূলে।

উইল ভাহার কচি কচির কপোলে ॥

রজতরচিত হার উল্লে পয়োধরে।

ভূজগ নায়ক চরে কনক ভূধরে ॥

ধিভুজ্ঞে সরল শব্দ আগে পিছে মণি ।
কনকের লতিকায় বেচল শেষকণী ॥
নাভিবিবরে লোম লাপিনীর বাস ।
কুচগিরি নিকটে চরিতে করে আশ ॥
ক্লশ মাঝে নিতম্বিনী উক্ক করিকর ।
চরণ যুগল জিনি রকতকমল ॥
কচির অঙ্গুরি নখ নবতার্য পীতি ।
ঐশ্বর্য মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

বলে শুভ শুভ শুভ দূত মহাশয় ।
বিলম্ব না কর কাঁট চল হিমালয় ॥
কহিয় বিনয়ভাবে বচন গীরিতি ।
যতেক আমার হয় দৌত্য নরপতি ॥
এতেক বলিয়া তারে দিল ফুল পান ।
ভিড়ন করিয়া দিল দৈত্য বলবান ॥
নুপতির আদেশে অগ্রীব দূত চলে ।
প্রণাম করিয়া ধোলায় দেহ হেলে ॥
হিমালয় গিরি চলে নুপতির কাছে ।
হাথী ঘোড়া পাইক প্রচুর কাছে কাছে ॥
দিমিকি দিমিকি বাজ বাজে শব্দ বেণী ।
দগড় কাঁসর ভেরী জ্বলিত শুনি ॥
কপূর তাণ্ডুল ধায় হরষিত মনে ।
নগর তেজিয়া বীর প্রবেশিল বনে ॥
মথিয়া তবক সিনি ঘন ঘন পেলে ।
ধুস্তানি বেটিল নিশি যেন আঁধারায় ॥
ঢেকি নিঞা [৩৪ক] ধামুকী ফরকী সর ধরে ।
পলায় বনের জন্তু জীবনের ডরে ॥
বাঙ্গালী খেলায় পজি করে কোলাহল ।
সমুখে দেখিল হিমালয় মহীধর ॥
রূপে জিহুবন মোহে বিশাললোচনী ।
চৌদিকে বেটিল গিরি পর্বতনন্দিনী ॥
কনক চম্পক ছবি স্বরূপীতটে ।
দোলা হইতে লাগে বীর তাহার নিকটে ।

নৃমুণ্ডমাগিনী দেবী হরসহচরী ।
ঐশ্বর্য মুকুন্দ কহে সেবিয়া দৈবরী ॥০॥
॥ গুহী রাগ ॥ পাহিড়া ॥
ভগবতী আইস চল আমার বচনে ।
তন ল পদ্মিনী জয়া শুভ তোরে কৈল দয়া
তুহু ভাগ্যবতী জিহুবনে ॥
কি কহিব তার দম্ব নিশ্চয়সোদর শুভ
জিজ্ঞাসদীক্ষর দৈত্যনাথ ॥
আমি অমুচরবর তোর সন্নিধানে পর
লক্ষিতে না পারি অমুবাদ ॥
অখিল দেবতালয় নিল সব মহাশয়
কিঙ্কর তাহার মন্দিরে ।
যে কখিল জিতদক্ষ পূরন্দের প্রতিপক্ষ
বিপক্ষ সকল অপোচরে ॥
মোর বশ জিহুবন যতেক দেবতাগণ
আমা বিহু নাহি ক্রতুভুক ।
যত রত্ন আছে লোকে আমার মন্দিরে থাকে
কপিলানন্দিনী কামধুক ॥
ঐরাবত সুরগজ জম্বিল তুরগরাজ
যত রত্ন ক্ষীরোদ মধুনে ।
প্রণাম করিয়া ডরে দেবতা সকল মোরে
পরিতোষে কৈল সমর্পণ ॥
গন্ধর্ব্ব যক্ষরাজে দেবালয় যুগ মাঝে
যত রত্ন আছে জিহুবনে ।
তুমি কস্তা দিব্যরত্ন তেজি সে তোমারে যত্ন
সে সব তোমার নিকেতনে ॥
যে শুভ নুপবর তার তুল্য সহোদর
নিশ্চয় প্রবীণ বড় রণে ।
অমুনয় মোর স্থানে ভজ যেবা তোর মনে
যত অর্থ ভূজিবে [৩৪] ভুবনে ॥
দিত্তির নন্দন দম্ব তনিয়া নিশ্চয় শুভ
অমুচর রতন ভারতী ।
স্বয়ম্বী সংহতি সখী হিমালয়ে শশিমুখী
দৈবত হাসিল ভগবতী ॥

শুন শুভনুপদূত না কথিলে অহুচিত
 অবগতি আমার বচনে ।
 ত্রিপুরাপদারবিন্দ মকরন্দচয় ভৃঙ্গ
 কবিচক্ষু শ্রীমুকুন্দ ভনে ॥০॥
 ॥ সুই রাগ ॥
 দূত কথিলে যতক কথা কিছু তার নহে মিথ্যা
 নিশ্চয় ত্রিংশ অধিকারী ।
 তার জ্যেষ্ঠ শুভ তাই তারে দিক কেহ নাঞি
 নিখিল পিষু ভক্ষ বৈরী ।
 নানা ফুল ফল দিয়া বনে নিবসন হইয়া
 সেবিল সমস্ত হরগৌরী ।
 বড় সুখ রণভূমি প্রতিজ্ঞা কর্যাছি আমি
 গিরিনাথ যোগীর ঝিয়ারী ।
 অহুচর কহ গিয়া নূপ সন্নিধানে ।
 যে জন সংক্রোমে জিনে সেই ভক্তা মোর মনে
 বড় দোষ প্রতিজ্ঞা লভবনে ॥১॥
 শুভ নূপ মহাবল তার তুল্য সহোদর
 যেবা জিনে সমরচক্রে ।
 আমি শিশু সুলক্ষী হইব তাহার নারী
 এ বোল কথিল অবিচারে ॥
 আসিয়া আমার ঠাঞি যুদ্ধে জিনি হই তাই
 বিবাহ করুক মোরে সুখে ।
 বলে সেই অহুচর তনিল যে ছুরাকর
 অসহ্য বচন তোর মুখে ॥
 প্রজাপতি হরিহর ইচ্ছা আদি যত সুর
 যাহার সমুখে স্থির নহে ।
 করিয়া যুদ্ধের আশ তুমি যাবে তাঁর পাশ
 এ হুং আমার প্রাণে সহে ॥
 না কর বিলম্ব সখি মোর বোলে শশিমুখি
 নিশ্চয় শুভের চল কাছে ।
 আসিয়া তাঁহার ভৃত্য হীনবল কোন দৈত্য
 চলে ধরি লৈয়া যায় পাছে ॥
 এতাদৃশ নিশ্চয় বল শুনি শুভ নূপবর
 না করিব পশ্চাত্ত বিচার ।

[৩৫ক] শুন শুভঅহুচর কর গিয়া অগোচর
 যে করিতে উচিত তাহার ॥
 দূত অতিরোষে তাষে নষ্ট হৈলি নিজ দোষে
 পরিতোষ নাঞি পাবে মনে ।
 ত্রিপুরাপদারবিন্দ মকরন্দচয় ভৃঙ্গ
 কবিচক্ষু শ্রীমুকুন্দ ভনে ॥০॥

॥ হনু ॥

শুনিঞা কস্তার বাণী মনে পাইয়া হুংখ ।
 চলিল শুভের দূত হইয়া অধোমুখ ॥
 ধীরে ধীরে চলে দূত চাহে চারি দিক ।
 জীর গরু কহিব জীবনে থাকুক দিক ॥
 আপনার বলে যুদ্ধ নহে অধিকারী ।
 প্রভুর আদেশ নাঞি কি করিতে পারি ॥
 সাত পাঁচ মনে করি যায় শাওরাধাই ।
 বার্তা কহিতে শুভ নিশ্চয়ের ঠাঞি ॥
 শুড় শুড় দগড় বাজে ঘন রবে সিদ্ধা ।
 চণ্ড মুণ্ড বলে নূপ আইল প্রায় ডিঙ্গা ॥
 দোলা হইতে লাগে বীর মলিন বদন ।
 বন্দিয়া দাঙায় শুভনিশ্চয়চরণ ॥
 বলে শুভ কহ কহ দূত মহাশয় ।
 দেখিলে কি না দেখিলে পদ্মিনী হিমালয় ॥
 শুভের বচনে দূত বুকে দিয়া হাথ ।
 কহিতে না পারি নূপ বড় পরমাদ ॥
 নুমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া লক্ষ্মী ॥০॥

॥ পাহিড়া ॥

বনমাঝে হিমালয় পদ্মিনী নিবসে ভায়
 গেলা শুভ তোমার নিদেশনে ।
 কহিল সকল কথা বল বুদ্ধি বিজয়তা
 অধিকার যত ত্রিভুবনে ॥
 অবনীনাথ শুনি কস্তা হাসে উপহাসে ।
 কুটিল নয়ানে চায় চকোরে অমৃত খায়
 যেন চাঁদ চন্দ্রিকা প্রকাশে ॥১॥

নানা রত্ন অধিকারী স্বরপূরে সচী নারী
জিনিলেক দেবতা সকলে ।
যেজিনে সে মোর স্বামী প্রতিজ্ঞা কর্যাছি আমি
হরগৌরীর চরণকমলে ॥
রূপে শুভ বশকেতু আমি তার হব বধু
যদি ভুল্য আমার সংগ্রামে ।
নিশ্চিন্তসোদর শুভ অকারণে তার দম্ব
আম্বক আমার সন্নিধান ॥
[৩৫] অসহ্য হুতের বাক্য শুনিঞা নৃপতি মোক্ষ
ক্ৰোধে যেন জলে হতানল ।
চণ্ডীপদমরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ হৃদ ॥

শুনিঞা কঙ্কার বাণী ক্ৰোধে পূরে তম্ব ।
মুখখান হৈল যেন প্রভাতের ভাস্ক ।
অরুণ যুগল আঁখি চাহে বীরে বীরে ।
কুমারের চাক যেন পাক দিলে কিরে ॥
মাথার মুকুট যেন গগনেতে শোভে ।
উভ করি পেলে খাণ্ডা লাফ দিয়া লোফে ॥
চরণের যায় ক্ষিতি করে টল টল ।
রবি শশী হইল তার কর্ণের কুণ্ডল ॥
বীর ডাক ছাড়ি আসে হয়ে ভূমিকম্প ।
অনলে পতঙ্গ যেন দিতে যায় ঝম্প ॥
কেহ নেত্রা পেলে কেহ বাজায় মাদল ।
কেহ খাণ্ডা কাঁকে কেহ বহে করতল ॥
বীরচাক বাজে কোথা বাজে জয়ঢোল ।
কাহাল কুকরে কোথা বরষের রোল ॥
অবিরত বাজে শব্দ ধয়েবের খোল ।
জিহ্ববন কাঁপে শুনি অশ্রুরের রোল ॥
কেহ যুঝে কেহ পাঁচে ফিরি ফিরি বুলে ।
কেহ শূল পেলে কেহ বৈসে ভকৃতলে ॥
শুভ শুভ দগড় বাজে ঘন রবে শিলা ।
অজুরপো পাল যায় রণে রণচিহ্না ॥

সাজ সাজ বলে শুভ ডাক ছাড়ে কোপে ।
সারথি চালায় রথ রথী রথে চাপে ॥
দশনে চাপিয়া গুপ্ত গোকে দিই তোলা ।
বিফল জনম চাহে যুক্তিতে অবলা ॥
হাথী ঘোড়া জিন করে স্ববর্ণ পাখর ।
তাহার উপর তোলে ছন্ডিত আতর ॥
ঘোড়ায় রাউত চলে গজে গজসাদী ।
সমর চতুরে যায় বধিতে বিরোধী ॥
ঘন কাড়া পড়া বাজে দামা দড়মসা ।
অহুমান দেবতা জীবনে তেজে আশা ॥
[৩৬ক] কুমতি জম্বিল আজি কোন দেবতায় ।
না জানে আপন বল অশ্রুরে ঝাঁটায় ॥
লুকায় যতেক দেব অশ্রুরের ঠাটে ।
পবন লুকায় হস্তী ঘোড়ার গুরপুটে ॥
খাণ্ডায় লুকায় যম ক্ৰোধে হতানল ।
কেহ শিশু যুবা বৃদ্ধ অদিতিনন্দন ॥
নৃপকোপ দেখিয়া স্তম্ভী বহুত কহে ।
অবলাকে সাজিতে উচিত কতু নহে ॥
সিংহাসনে বসিয়া আপুনি থাক শুধে ।
চুলে ধরি তারে গিয়া আম্বক সেবকে ॥
স্তম্ভীবের বচনে নৃপতি মনে শুণে ।
ডাক দিয়া দিল পান ধূম্রলোচনে ॥
আমার বচনে ভূমি চল হিমগিরি ।
চুলে ধরি আন গিয়া পরমশূন্যরী ॥
যদি বা গন্ধর্ব্ব যক্ষ দেব ব্রহ্ম হরি ।
রাখিবারে যত্ন করে পরমশূন্যরী ॥
আপনার বলে তার বধির জীবন ।
প্রণতি করিয়া চলে ধূম্রলোচন ॥
ডাকাডাকি ধাওয়াবাই দিতির তনয় ।
শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাবিজয় ॥০॥

॥ কাঁপা ॥

ভূহিন পর্বতে দেবী নিবসে পদ্মিনী ।
দেখিয়া অশ্রুবল বলে উচত বাণী ॥

দেবতা দানব যক্ষ নহে যার মান ।
 চল কাঁটো সখি শুভনিশ্চেষ্টের স্থান ॥
 যদি বা না যাবে প্রীতে মোর প্রভুর ঠাঞি ।
 চুলে ধরি লব আমি মিথ্যা নাহি কহি ॥৫॥
 অম্বরবচনে চণ্ডী বলে ধীরে ধীরে ।
 তুমি দৈত্যেশ্বর বলবান মহাম্বর ।
 বলে তুমি নিবে মোরে বসি একাকিনী ।
 কি করিতে পারি আমি সিংহবাহিনী ॥
 চণ্ডীর রচনে কোপে হাইল অম্বর ।
 অচলনন্দিনী পাশ ধরিতে চিকুর ॥
 অপিয়া ত্রিপুরা মন্ত্র হহকার ছাড়ে ।
 ধুম্রলোচন বীর ভয় হইয়া উড়ে ॥
 [৩৬] ধুম্রলোচন ভয় দেখি দৈত্যবল ।
 পলায় পদ্মিনী বলে আগল আগল ॥
 যুঝিয়া ত্রিপুরা যত দৈত্য করে নাশ ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরার দাস ॥৭॥

॥ ছন্দ ॥

কেহ হানে কেহ বিদ্ধে কেহ পেলে শিলি ।
 চাপিয়া সিংহের গুঠে কুশিলা বাঙালী ॥
 অকুশ ডাবুশ নেজা হাতে তরোয়ারি ।
 ত্রিপুরা দহুজ্ঞ ঠাটে হৈল মারিয়ারি ॥
 কেহ শেল বহে কেহ শাণিত কুপাণ ।
 অবিরত শুনি কনকনি হান হান ॥
 কেহ পড়ে কেহ উঠে কেহ ছইখান ।
 লাফ দিয়া হানে কেহ সিংহে দেই টান ॥
 কুশিল কেশরী রণে করে জয়গান ।
 কার হাথী ঘোড়া বধে কার বধে প্রাণ ॥
 কার মুণ্ড ছিঙে কার চুলে ঘেঁটে টান ।
 ঘাড় মুচড়িয়া কার করে রক্তপান ॥
 কঙ্কে লুকাইয়া কেহ দেই ভুলুভুড়ি ।
 নেজা খাণ্ডা পেলি কেহ যায় গুড়ি গুড়ি ॥
 গিহিনী শুকিনী উড়ে মারে মালসাট ।
 পড়িল অম্বরবল ভঙ্গ দিল ঠাঁট ॥

নিশ্চেষ্টের সেবকে বারেক রক্ষ মাতা ।
 শুভের নিকটে গিয়া কহিব বারতা ॥
 পলাইয়া যায় পুন উলটিয়া চায় ।
 পুনঃ পুনঃ বলে মোরে রক্ষ মহামায় ॥
 অম্বরের বচনে ত্রিপুরা পরিতোষ ।
 কবিচন্দ্র কহে দেবী ক্ষম তার দোষ ॥৮॥
 ॥ ইতি ষষ্ঠ পালা সমাপ্ত ॥

॥ স্তই রাগ ॥

গোসাঞি
 গেলাম পদ্মিনী কাছে সুবলিত শঙ্খ ভুঞ্জে
 সুবর্ণ কঙ্কণ শঙ্খ আগে ।
 সুনয়ন মুখচাঁদ অবণ আকটি কঁাদ
 বসনে মস্তক নাড়ি চাকে ॥
 কলকণ্ঠ মধু ভাষে দ্বৈত দ্বৈত হাসে
 শর চন্দ্র ধনু অসি হাথে ।
 দেখিয়া অম্বরবল ক্রোধে কাঁপে থর থর
 চাপিল বিজয়ী যুগনাথে ॥
 শুন শুভ্র ছই ভাই নিবেদি [৩৭ক] তোমার ঠাঞি
 জীবন সঙ্কট হিমাচলে ।
 অবলা কে বলে তারে স্বর্গ মর্ত রসাতলে
 তারে ধিক কেহ নাড়ি বলে ॥
 বলে ধুম্রলোচন শুন লো পদ্মিনী শুন
 ভজ মোর প্রভুর চরণে ।
 না ভজিলে পাবে লাজ সাধিব প্রভুর কাজ
 চুলে ধরি লইব এখানে ॥
 বলে কুন্ডা বল বেধ পাঁচনি দৈত্যের নাথ
 তুমি বলবান মহাম্বর ।
 যদি বলে লবে তুমি কি করিতে পারি আমি
 তোমা বিনে কে আছে ঠাকুর ॥
 অহঙ্কৃত কন্ডার বোলে ধুম্রলোচন চলে
 শিরসি ধরিতে তাঁহার ।
 হাইল তোমার ভৃত্য নিকটে দেখিয়া দৈত্য
 ক্রোধে কণ্ঠ ছাড়ে হহকার ॥

ভঙ্গ হইল মহাবল দেখি চাহি জল জল
হৃদয় গণিত পরমাদ ।

বিষম সময় মাঝে কেশরী চাপিয়া যুবক
না দেখিল তার অবসাদ ॥

পদ্মযোনি হরিহর পুন্দর কিম্বদ নর
ভূমি নাথ নিমন্তসোদর ।

হিমগিরি করি লক্ষ্য রহিল বিষম দক্ষ
প্রতিপক্ষ করিল গোচর ॥

কাঁটো চিন্তা প্রতিকার যদি জিবে শুন আর
নিজ রাজ্য রাখিবে সকল ।

চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীযুত মুকুন্দ বিজে
বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

শুনি সক্রুদ্ধিত দৈত্য মুখের উত্তর ।
নিমন্তসোদর শুভ সভার ভিতর ॥
চণ্ড মুণ্ড রক্তবীজ প্রভৃতি কিঙ্কর ।
প্রলয় পবনে যেন কাঁপে মহীধর ॥
কাহারে পাঁচিব রাজ্য করে অহুমান ।
অবলা হইয়া করে দৈত্য অপমান ॥
কলেবর পুরিত সকল তমুরসে ।
বরিখে জলদ যেন জলকণা থসে ॥
নিকটে দেখিল চণ্ড মুণ্ড বলবান ।
ডাক দিয়া নিমন্ত তাহারে দিল পান ॥
[৩৭] ষোড়া ছত্র কাপড় প্রসাদ পান কুল ।
সাজল মাতার হাথী নাহি যার তুল ॥
চল হিমালয় গিরি স্রনদীকূলে ।
ধরিয়া আনিহ ভূমি পদ্মিনীর চূলে ॥
যে রাখে হানিবে তারে বরিহ কেশরী ।
বুড়িরে হানিঞা ভূমি আনিবে স্রনরী ॥
শুস্তের বচনে দৈত্য বলে উচ্চবাণী ।
কবিচন্দ্র বলে দেখে আশ্চর্য্য দি পদ্মিনী ॥০॥

॥ কাঁপা ॥

রাজার আদেশে যুগ্ম জোড় করি কর ।
গন্ধ চন্দন পরে শিরের উপর ॥

প্রণাম করিতে নূপে হেট কৈল কাঁদ ।

গলায় রত্নের মাল পূর্ণিমক চাঁদ ॥

বীর সাজিল রে প্রতাপ শিরোমণি ।

চণ্ড মুণ্ড হুই ভাই বরিতে পদ্মিনী ॥১॥

তবক বেনক শিলি ছুরি কাছে টাঙ্গি ।

ধমুকে টঙ্কার দেই রণে বল রঙ্গি ॥

মাধায় মুকুট পরে গায় আদরুণি ।

মোর দোষ নাঞি আজি রবি শশী সাক্ষী ॥

দশনে চাপিয়া ওষ্ঠ গোকে দেই পাক ।

ছুই চক্ষু ফিরে যেন কুমারের চাক ॥

লাফ দিয়া উঠে বীর চারিদিকে চার ।

কুপিল অশুর ভরে দেবতা পালায় ॥

প্রলয়ের মেঘ যেন ঘন ঘন গাঞ্জে ।

ধবল স্রুটিক ষোড়া চাশে পক্ষরাঞ্জে ॥

কুর্খ বাসুকী কাঁপে ক্রিতি টল টল ।

শ্রীযুত মুকুন্দ কহে ত্রিপুরাকিঙ্কর ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

ঘন ঘন-বাঞ্জে ঢাক কোণা বাঞ্জে ঢাকী ॥১॥

সাজ সাজ বলে দৈত্য করে ডাকাডাকি ॥

শুড় শুড় দগড়-বাঞ্জে বিরল তেঘাই ।

চারিদিকে অশুরে লাগিল ষাওয়াধাই ॥

সারথি চাপিল রণে আগে যার রথী ।

মাহুত চাপিল পিঠে পাথরিয়া হাথী ॥

ষোড়ায় পাথর করে পিঠে দিয়া জিন ।

মাধায় টোপর পরে রাউত প্রবীণ ॥

কেহ জিনি পরে গায় দেই আদরুণি ।

উড়িল পদের ধূলি রবি হই লুকি ॥

কেহ লাফ দেই গায় কেহ মাথে ধূলি ।

[৩৮ক] কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ করে কেলি ॥

কেহ হান হান বলে কেহ মার মার ।

ধমুকের শুণে কেহ দিলেক টঙ্কার ॥

ত্রিভুবন পুরিলেক শিঞ্জিনীর মাদ ।

প্রলয় সময় যেন হয় বজ্রপাত ॥

হাইল অম্বর বালা বিপক্ষ বিভাড ।
 পাবাণ বিদরে বহে লোহার চেওয়াড ॥
 কেহ নেজা বহে খাণ্ডা কেহ বহে ছুরি ।
 কেহ শক্তি শূল বহে মেবতার অরি ॥
 কেহ গদা বহে শেল বলে মহাবলী ।
 কাহাল ফুকরে কোথা দোসরি মোহারি ॥
 ৭ দামা দড়মসা কাড়া বাজে শব্দ বেণী ।
 ঘাঘরের রোল কোথা নুপুরের ধ্বনি ॥
 ঘণ্টার শব্দ কোথা বাজে উরমালা ।
 অনেক মধুর যন্ত্র বাজে করতাল ॥
 দণ্ডি মুহরি বাজে মৃদঙ্গ মাদল ।
 সাহন গাহন চলে চতুরঙ্গ দল ॥
 নিঃশব্দ সমরে ধায় অস্তুরছাওয়ালা ।
 সমুখে ষোগিনীগণ পাছু হইল কাল ॥
 রড় দেই জীগণ মুক্ত কেশভার ।
 ত্রাস্ত্রণ সকল বামে ডাহিনে শূণাল ॥
 গগনে গিধিনী কিরে মারে পাকসাট ।
 অগোচরে বলে ধর ধর কাট কাট ॥
 ঘন শিলা ফুকরে বরজে জয়ভেরী ।
 চলিল অম্বরবল বধিতে স্তম্বরী ॥
 ছত্তিশ আন্তর বহে উভ করি হাথ ।
 বেচিল ভুবারপিরি অম্বরের নাথ ॥
 ত্রিদশতটিনীতটে দেখে দৈত্যবল ।
 কনক শিখরে কজা সিংহের উপর ॥
 দেখিয়া কজার মুখ উপজে ছতাশ ।
 শরতে চাঁদ যেন গগনে প্রকাশ ।
 নুমুণ্ডমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 ত্রীযুত মুকুল কহে সেবিয়া দ্বন্দ্বরী ॥০॥

॥ পয়ার ॥

বলে চণ্ড মুণ্ড কজা কর অবধান ।
 চলহ রাজার [৩৮] ঠাঞি রাখিয়া সন্ধান ॥
 অবলা হইয়া কর প্রতিজ্ঞা পূরণ ।
 কে আছে অধম বীর তোরে দেই রণ ॥

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আমি বিদিত সংসারে ।
 হাসিব সকল লোক ত্রিবেণনগরে ॥
 উন্নত বৌবনবতী রূপে গুণে ধজা ।
 বুঝিলু এখন তুহুঁ হিমালয়কজা ॥
 মারি লেহ আমার প্রধান সেনাপতি ।
 বিলম্বে নাহিক কাজ চল শীঘ্রগতি ॥
 স্বর্ণ মস্ত রসাতল এ তিন জুবন ।
 শুভ্র বিনে অস্ত্রজন নাহিক ভাজন ॥
 কহিল তোমারে আমি আপনার কাজ ।
 তিলার্দ্ধ কাটিব তোর চুই মহারাজ ॥
 এ বোল শুনিয়া দৈত্য বলে মার মার ।
 ধনুকের গুণে কেহ দিলেক টকার ॥
 পাথরে বেষ্টিত বীর করে হিমাচল ।
 ত্রীযুত মুকুল কহে ত্রিপুরামঙ্গল ॥০॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥ কাঁপা ॥

শৈলেশ্বরবর	কাকুন শিখরে
তাই গজমাচল পিঠে ।	
রূপে জুবন তিন	মোহাই ত্রিপুরা
অস্ত্র নিকট তেল দিঠে ॥১॥	
চাপ চক্ক করি	ধরতর অসি ধরি
চোদিয়ে বেড়িলেক বালা ।	
অম্বরের তর্জুন	গর্জুন শুনিঞা
ক্রোধে কথির মুখ ভেলা ॥	
রুদ্রাঙ্গীমুখ	সম্মিত দেখিয়া
দানব কম্পই কোপে ।	
ধরতর ধজা ধরি	উভু হাথ করি
রণমুখ বাম্পই বেগে ॥	
জুড়ুটি কুটিলতর	তালে সমুজ্জর
তৈছন জনমিলা কালী ।	
পাশিনী খড়্গানী	মস্তকমালিনী
শূলিনী ঝটিত করালী ॥	
বাঘছাল পরি	কালী ভয়ঙ্করী
অতিশয় শুক শরীরা ।	

লিত বহু মুখ জিহ্বা ডগমগ
বিবসনা দেহ কটোরা ॥
চাক ফিরি কুধির নেত্র করি
সব্বই ছোড়ই ডাক ।
হুয় মাঝ পড়ি দেব বৈরী জুড়ি
বন ভুব উই চাক ॥
ষ্টিক ভদ্রুর হয়মুখ কুঞ্জর
দস্ত উপাড়ই হাথে ।
জ হয় সর্বই কড়মড় চর্কই
রথ রথী সায়ধি পাতে ॥
াহার কেশ ধরি মুণ্ড হেট করি
গুণ্ডি করি পদযায় ।
ষ্টিক ঘাতনে [৩৯ক] কেহ কেহ লুটই
গুড়ি গুড়ি পড়ি কেহ যায় ॥
নঞ্জা ডাবুল খরতর বাধিক
কজ্জির চর্কই দস্তে ।
তি অস্ত্ররাস্তর লুটই রণভূ
শ্রীযুত ভনই মুকুন্দে ॥০॥

॥ জামা রাগ ॥

রণভূ কালী বিষম করালী
ঝপই না করই শঙ্কা ।
সীতার কারণ দশরথনন্দন-
কিঙ্কর দহে যেন লক্ষা ॥
টুটিল অনেক সৈন্ত চণ্ড মুণ্ড বীর রোষে ।
ক্ষেপিল নিশিত শর বাড়বানল তুল
যেন ঘন জলদ বরিষে ॥৩৭॥
মঙ্গরবিজয়ী চণ্ড মুণ্ড হুই
হাইল হুয় পরিপঙ্খী ।
আগলিল চৌদিগ বেড়িলেক পশ্চিক
হয়বর ময়গল দস্তী ॥
খন্ড উভ করি সমরে কিরি কিরি
নেঞ্জা হাথে অসোয়ার ।

সর্বই মাহত রণভূ পণ্ডিত
ডাক ছাড়ই মার মার ॥
চক্ৰ ক্ষেপিল যত দারুণ দশ শত
আংসাঙ্গিল কালিকার তম্বু ।
কোপে কুধিরমুখী হাসই কম্পই
জলদ ভিতরে যৈছে ভাঙ্গ ॥
উজ্জল দশনা চঞ্চল নয়না
দরশন ভয়াননা ।
ঘোরতর হুকার ছাড়িয়া মার মার
মুগ নুপ পিঠে পয়ানা ॥
যুঝ বই ত্রিপুরা রণে অনিবারা
চণ্ডের মুণ্ড ধরি হিঙ্গে ।
গড়াগড়ি জড়াজড়ি রণভূ লুটই
মুণ্ড কাটিল তার খজো ॥
চণ্ডার পড়ে মুণ্ড হাইল রড়ে
অতি কোপে বরিষয়ে বাণ ।
কুধিয়া কালী হানিল করালী
উভে বীর হইল হুইধান ॥
দেখিয়া দেবীর বল কেহ চাহে জল জল
সাহসে কোন বীর টুটে ।
শ্রীযুত মুকুন্দ ভনে ত্রিপুরাচরণে
দহুজ বিমুখ হইল ঠাটে ॥০॥

॥ মালসী ॥

বহত করিলে যুদ্ধ দেবতার কাজে ।
দেখি ভদ্র পড়ে যত অস্ত্র সমাবে ॥
দানবদলনী জয়া তুমি সুলোচনা ।
বিকল দেবের প্রাণ না সহে যাতনা ॥
ভন[৩৯] গ দৈবী মাতা ত্রৈলোক্যমোহিনী ॥
নিবেদি তোমার পায় প্রচণ্ডনাশিনী ॥৩৭॥
রণস্থলে হুই ভাই চণ্ডের বিনাশ ।
কাটিলে মুণ্ডের মুণ্ড দৈত্য হইল নাশ ॥
তুমি জয় তুমি ভুবি তুমি নারায়ণী ।
শুভ নিশ্চয় হুই ভাই বধিবে আপুনি ॥

চণ্ড মুণ্ড সমরে বধিলে ভগবতী ।
চামুণ্ডা তোমার নাম রহিল খ্যাতি ॥
ত্রিপুরাপদারবিন্দে কবিচন্দ্র কহে ।
ত্রাসে পলায় দৈত্য কোথাহ না রহে ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

উলটিয়া চাহে কালী বলে যার যার ।
রবির কিরণ লুকি হইল অন্ধকার ॥
কোথা চাক চোল বাজে কোথা বাজে দণ্ডি ॥
ঝুঝিরে কন্দুর বহে ভাসে গাণ্ডি মুণ্ডি ॥
জড় জড় ধগড় বাজে কেহ যায় রড়ে ।
কাপড় সম্বরে নাঞ্ছি কোথা উঠে পড়ে ॥
কেহ মরে কেহ জিয়ে আড়াকিয়ে চায় ।
চলিতে না পারে কেহ গড়াগড়ি যায় ॥
গিঘিনী শুকিনী শিবা করিল পয়ান ।
কেহ মাংস খায় কেহ করে রক্তপান ॥
কেহ হাসে কেহ নাচে কেহ পাক মেলে ।
কেহ চিকিচিকি করে কেহ মুণ্ড গিলে ॥
কেহ বৈসে কেহ উঠে গগনমণ্ডলে ।
কেহ মুখ মেলে কেহ লাফ দিয়া বুলে ॥
শৃগাল কুকুর মাংস করে টানাটানি ।
ঝপ ঝপ উড়ে বৈসে গিঘিনী শকুনি ॥
রণকুমি দুর্গত যত হইল রক্তপাত ।
লাফ দিয়া চলে বুলে ধুকড়িয়া কঁাক ॥
পড়িল অস্তুর ঠাট ধুইতে নাঞ্ছি তিল ।
গণিতে পারি যত পড়ে কাক চিল ॥
ছাড় মাংস ছাড় করি গিলে বারে বারে ।
হরষিত প্রেত ভূত ত্রিপুরা অবতরে ॥
রড় দিয়া পলাইতে কেহ মরে পথে ।
সিংহের উপরে দেখি দেবী পাছু খেদে ॥
[৪০ক] নিমন্ত্বের সেবকে বারেক রক্ষ মাতা ।
শুভের নিকটে গিয়া কহিতে বারতা ॥
পলাইয়া যায় পুন্ড উলটিয়া চায়ে ।
পুনঃ পুনঃ বলে মোরে রক্ষ মহামায়ে ॥

শুভের নিকট কেহ উত্তরিল গিয়া ।
প্রণাম করিয়া কহে বৃকে হাথ দিয়া ॥
জল জল চাহে দৈত্য মুখে নাহি কথা ।
কহ কহ বলে শুভ শুভের বারতা ॥
চণ্ডীর কুপায় দূত প্রকাশিল তুণ্ড ।
কি কহিব গোসাঞি পড়িল চণ্ড মুণ্ড ॥
কি বল কি বল দূত কহ আর বার ।
কবিচন্দ্র কহে শুন ত্রিপুরা অবতার ॥০॥

॥ গৌরী রাগ ॥

দেখিল ধবলকার লাফ দিয়া স্বর্গ যায়
নয়ানে উইল বিবস্বান ।
পোষে এক বনজঙ্ঘ কথিলে কুশিবে বি
যত বীর পতঙ্গ সমান ॥
দেব কি কহিব তোমার চরণে ।
শুন হে দৈত্যের নাথ বড় হইল পরম
অবলা প্রবল ত্রিভুবনে ॥১॥
বিকট দর্শন মুখ বহুনির্মিত নথ
অতিরক্ত অধর তাহার ।
যদি সে সমরে চাপে চৌদ্ধ ভুবন কাঁপে
সুয়াসুর নর কোনৎসার ॥
যত ঠাট দেখে সঙ্গে আপনা রাখিহ যবে
আমি নিম্ন তোমার কিঙ্কর ।
সমরে কস্তুর সম জিনে হেন নাহি জ
প্রতিপক্ষে করিল গোচর ।
পর্তুত করিয়া লক্ষ্য দৈত্য মায়ে শতসংখ্য
সিংহবাহিনী ভগবতী ।
না থাকিহ নির্ভয় যুবতী লখিল নঃ
কিবা করে আজিকার রাতি ॥
অসহ দুতের বাণী তুনিঞা নুপতিমণি
কোপে জলে বেন হতানল ।
চণ্ডীপদসরসিজে ত্রীযুত মুকুন্দ দ্বিজে
বিরচিত সরস মঙ্গল ॥০॥

॥ পঠমঞ্জরী ॥

রদাপ করে কোনসার সীমন্তিনী ।
ননবাসিনী তারে চেটীতে না গণি ॥
ঝল ললাটে পূর্ন দৈবের লিখন ।
বতীর হাথে চণ্ড মুণ্ডের মরণ ॥
সাজ বলে দৈত্য কালধাম ছোটে ।
স কাঁপব শুভ্র মুখে নাঞ্চি টুটে ॥
[৩০] কবিল নিশুভ যেন অলে হতানল ।
স্তের চরণে ভুজ দেই মহাবল ॥
গারে আঙ্গা দেহ দেব কুমি জেষ্ঠ ভাই ।
গমার কিঙ্কর আমি বলিতে ডরাই ॥
শুভবচনে পান দেই রক্তবীজে ।
বিচল্য কহে দেবীর চরণপঙ্কজে ॥৩১॥

॥ পাহিড়া ॥

সাজিল রে রকতবীজবর
মোঠন ঘন দেই গোম্ফে ।
শুভ মহিষপতি শাসন বন্দিয়া
চৌদ্ধ ভুবন ঘারে কপ্পে ॥
একু সজ্জাই জয়ঢোল বজ্জাই
গুড় গুড় দগড় ন টুটে ।
তাজি বাজি ঘন চপ্লই হিঙ্কই
প্রায় পয়োধর গাজে ॥
চতুরঙ্গ মহাবল কোটি কোটি দল
পঙ্কিম জয় জয় গানে ।
নেত্রা ডাবুশ শেল শূল বজ্জাঙ্কুশ
বীর চলহ পয়ানে ॥
সজা কাহাল বরজ ভেরিবর
কাঁসর মধুরিম বাজে ।
ধড়গ উভু করি ধিগ্গই লুপ্ফই
প্রায় পয়োধর গাজে ॥
স্বরপুরি লুক্কাই বজ্জ বিমুক্কাই
সম্বর স্বরগ্গই শঙ্কে ।

পদন্তর লঙ্ঘিত সমুক্ষিত অধুত
সর্পনাথ ভয় তঙ্কে ॥
পদন্তর উজ্জিত শূলি বিলঙ্ঘিত
দশ শত কিরণ মরীচি ।
তাজি বাজি ঘন চপ্লই হিঙ্কই
চলহ গজবররাজি ॥
ধণ্টা ঘাঘর দড়মসা বজ্জাই
সর্বই গজ হয় কাঙ্কে ।
উজ্জল উচতর পতকা সাহন
গাহন ভনই মুকুন্দে ॥৩২॥

॥ ছন্দ ॥

ক্রোধে আঙ্গা দিল শুভ্র নিশুস্তের ভাই ।
যত ছিল অস্তরে লাগিল ধাওয়াধাই ॥
চৌরাশি সহস্র কছু আপনার বলে ।
পঞ্চাশ সহস্র চলুক কোটি বীৰ্য্যদলে ॥
শতেক সহস্র কোটি শূত্রের সেনাগণ ।
না কর বিমুচন আমার শাসন ॥
কাল বেকাল কাল চলুক মোর বোলে ।
তেজি নিযুত কোটি অস্ত্রের কুলে ॥
[৪১ক] চলুক দৌহদ কোটি বীৰ্য্য মহাম্বর ।
আমার নিদেশে মোর্য্য চলুক প্রচুর ॥
রাজার আদেশে দৈত্য সমরে পাগল ।
কেহ ছুরি বহে টালি কেহ করতল ॥
জিনি গায় দিলেক ভিতরে আদরুণি ।
মাথায় টোপর পরে ছুই আঁধি দেখি ॥
পাখরিয়া লাখে লাখ ময়গল হাথী ।
অঙ্কুশ ডাবুশ নেত্রা পিঠে যুদ্ধপতি ॥
বামবেগে কোটি কুরগের বাগ ।
পাখরিয়া চাপে যুদ্ধপতি নুপতাগ ॥
কেহ রথ চাপে কেহ চাপিল মহিষ ।
যার দরশনে হয় যমের হরিষ ॥
হাথী ঘোড়া রথ চলে রণে অনিবারা ।
ছুটিল মহিষ যেন মুখে খসে তারা ॥

কেহ যুকি বহে শেল কেহ খাণ্ডাফলা ।
 কেহ লাফ দেই কেহ পৌঁফে দেয় তোলা ॥
 কেহ রড় দেই কেহ গায় মাখে ধুলা ।
 মকরকুণ্ডল কর্ণে গলে রত্নমালা ॥
 কেহ হাসে কেহ নাচে মারে মালসাট ।
 পৃথিবী ছুড়িল যত অশ্বরের ঠাট ॥
 জ্বলিত বাজে বেণী খয়েরের খোল ।
 ষাণ্ডয়াধাই রাণ্ডয়ারাই হইল গণ্ডগোল ॥
 দণ্ডি মুহুরি শঙ্খ ফুকরে কাহাল ।
 দায়া দড়মসা কাড়া বাজে অবিশাল ॥
 ঘন রণভূর বাজে তরল নিশান ।
 কেহ শিলি পেলে কেহ হানে ধুলাবাণ ॥
 কোথা ভেরী বাজে কোথা বাজে জয়ঢোল ।
 কাহাল ফুকরে কোথা বরষের বোল ॥
 জয়বীরচাক বাজে গুড় গুড় দগড় ।
 কেহ পড়ে কেহ উঠে না পরে কাপড় ॥
 ধাইল অশ্ববল লক্ষ কোটি কোটি ।
 উদয়াস্ত গিরিতে নিসঙ্কী পরিপাটী ॥
 উড়িল চরণধূলি নাহি দিশপাশ ।
 গগনমণ্ডল কিবা পৃথিবী আকাশ ॥
 ছত্তিশ আতর বহে উত্ত করি হাথ ।
 বেটিল ভূষারগিরি অশ্বরের নাথ ॥
 টল টল করে ক্রিতি কুর্শে লাগে ডর ।
 রবির কিরণ নুকি দিগ্গজ কাতর ॥
 জ্বাসে পলায় ইন্দ্র বিধি হরিহর ।
 পাছু রক্তবীজ চলে সমরে পাগল ॥
 ত্রিপুরাপদারবিন্দে মধুলুঙ্গ মতি ।
 ত্রিষুত মুকুন্দ কহে মধুর ভারতী ॥০॥

॥ মালসী রাগ ॥

ধরণী আকাশ [৪১] পুরে শিঞ্জিনীর নাদ ।
 প্রলয় সময় যেন হয় বজ্রধাত ॥
 গলায় নুমুণ্ডমালা বলে সাজ সাজ ।
 উন্নত হইয়া তহু ডাকে যুগরাজ ॥

দেখিল ত্রিপুরা দৈত্য সাজিল আপার ।
 লাফ দিয়া ধরে বহু পাতে অবতার ॥
 অধর চাপিল কোপে বিকট দশন ।
 মুখ মেলি হাসে কালী কাঁপে জিভুবন ।
 ঘণ্টা বাজাইয়া সিংহ নিনাদ ফিরায় ।
 সেই শব্দ শুনিয়া অশ্ববল ধায় ॥
 গগনে মুকুট লাগে ষোগিনীর মেলা ।
 সিংহের উপর চাপে হাথে খাণ্ডাফলা ।
 যুবক ষোগিনীগণ না ছাড়িহ ডরে ।
 বিশাললোচনী ঘন সিংহনাদ পুরে ॥
 যেই যেই দেবের বাহন রূপ ভূষা ।
 সেই রূপে অবতরে ত্রিপুরা কধিরাশা ॥
 দেবতার শক্তিরূপিণী হিমালয় ।
 দেখিয়া ভীষণ দৈত্য কবিচন্দ্র কয় ॥১॥

॥ শ্রী রাগ ॥

কমণ্ডলু অক্ষমালা ধরি ভূজ
 হংসবাহনে বেদযুধী ।
 চারি মুখে ব্রহ্মাণী ব্রহ্মরূপিণী
 চপল যুগল যুগ আঁখি ॥
 বৃষভে চাপিয়া উরে ত্রিনয়নী রূপ
 ডমক ত্রিশূল ভুজ কান্দে ।
 ললাটে ভাস্কর ফোটা বায়ুকী নাগের
 শিরে শোভা করিলেক চাঁদে ॥
 অবতরে গো মা সর্ব
 শক্তিরূপিণী ভগবতী ।
 দানবদলনী জয়া অনন্তরূপিণী
 রূপাময়ী জিভুবনে গতি ॥
 কৌমারী অবতরে শক্তি ধরিয়
 বাহার বাহন মন্ত শিখী ।
 হান হান কাট কাট ঘন মারে মা
 বিশাললোচনী শশিমুখী ॥
 চাপিয়া বিহগরাজে যুগল যুগল
 শঙ্খ চক্র গদা খড়্গানী ।

রয়ে পিয়ল বাস জলদ বিশ্বরি ভাষ

॥ ছন্দ ॥

জগদীশ শক্তিরূপিণী ॥

বসন্ত ধবল দাঁত দ্বিতীয়ার যেন চাঁদ

শিরে শোভে পিঙ্গল কেশিনী ।

গিরি চলে চারি পায় দেখিতে পর্বত[৪২ক]কার

হরিশক্তি মুখ শূকরিণী ॥

শূ। নৃপ রূপ পেখি অক্ষয় কিরণ আঁখি

নৃসিংহরূপিণী দেবী হরা ।

দেবত কাঁপায় সটা বাহুকী নাগের পাটা

গগনে বিকল হইল তারা ॥

ময়গল গজনাথে বজ্র ধরিয়া হাথে

দশ শত নয়নধারিণী ।

পূরন্দর প্রতিনিধি উরে দেবী ভগবতী

ইচ্ছাঙ্গী সমররক্ষিণী ॥

যত দেবী তেজময়ী মহেশে বেঢ়িয়া রহি

আইল দৈত্য গুন গ অধিকে ।

দাক দেবী দেবীদেহে বাহির হইয়া কহে

শতেক শৃগাল যেন ডাকে ॥

শুন দেব কৌর্টিবাস নিগুণ্ড স্তম্ভের পাশ

দুত হইয়া চল বচনে ।

বলিহ ভাহার স্থানে আসিয়া পতক রণে

অধিকার দিব জিহুবনে ॥

শুন দেব ক্রতুভূজ ছাড় তোরা দুই লোক

যদি জিবে প্রবেশ পাতাল ।

নহে বা করিবে রণ ঝাঁট আইস কহি শুন

তোর মাংসে পুরিব শৃগাল ॥

কহে দেবী অদভূত শিবেরে করিয়া দুত

শিবদূতী তোমার খেয়াতি ।

কেহ নাচে কেহ হাসে কেহ রহে রণ আশে

গগনমণ্ডলে কার গতি ॥

দেবীর আদেশে হর চলিলা স্তম্ভের ঘর

দুত হইয়া কথিল সকল ।

চণ্ডীপদসরসিজে শ্রীমুত মুকুন্দ বিজে

বিরচিল সরস মঙ্গল ॥০॥

মহেশের মুখে শুনি ত্রিপুরার বাণী ।

ঝরিয়া খাইল দৈত্যগণ অল্পপানি ॥

কেহ শক্তি শূল বহে কেহ বহে সাজি ।

কেহ গদা আঠি পাশ কেহ বহে টাঙ্গি ॥

কেহ চক্র বহে কেহ প্রবীণ মতিয়া ।

কেহ গজে চাপে কেহ ঘোটকে চাপিয়া ॥

কেহ নেজা বহে শিলি চোকল বিশাল ।

ধামুকী ধমুক ধরে লোহার চেওয়াড় ॥

খাণ্ডা ফলা দোয়াড় তবক কার হাথে ।

মহারথী সারথি সংহতি চলে রথে ॥

ছত্তিশ আতর বহে মাথায় টাটুনি ।

[৪২] উপনীত হইল যথা নিবসে পদ্মিনী ।

সাবধানে মহাবীর লাখে মহাযুদ্ধে ।

কেহ তীর বিদ্ধে কেহ হানে পরশুর্বে ॥

কেহ শক্তি শূল গদা ক্ষেপিল রথাক ।

কেহ তীর বিদ্ধে ভিন্দপাল অর্জুগাল ॥

কোপে লাফ দিয়া চণ্ডী উঠে সেই ক্ষণে ।

যুড়িল অনেক বাণ ধমুকের গুণে ॥

সন্ধান পুরিয়া বিদ্ধে আকর্ণ পুরিয়া ।

টানিল দৈত্যের বাণ হত্কার দিয়া ॥

রড় দিয়া বুলে কালী দেবীর স্তম্ভে ॥

ত্রিশূল বিদ্ধিয়া পাড়ে অস্ত্রের বুক ॥

হান হান বলে দৈত্য যায় রণাগল ।

ব্রহ্মাঙ্গী হাসিয়া পেলো কমণ্ডলুজল ॥

বার গায় লাগে সেই হয়ত নির্বল ।

চলিতে না পারে কেহ চাহে জল জল ॥

মাহেশ্বরী বিদ্ধে কারে ত্রিশূলের আগে ।

চক্রে হানিল কারে বৈষ্ণবী রূপে ॥

কৌমারীরূপিণী দেবী বিদ্ধে শক্তি হাথে ।

শত শত সুররিপু পড়ে বজ্রাঘাতে ॥

বরাহরূপিণী বিদ্ধে দশনের ঘায় ।

দস্তের প্রহারে কেহ গড়াগড়ি যায় ॥

নৃসিংহরূপিণী দেবী বলে হান হান ।
 বুক বিদারিয়া কার করে রক্তপান ॥
 রড় দিয়া বুলে রণে করে জয়গান ।
 রথাজে কাটিয়া কারে করে খান খান ॥
 বধিয়া অনেক দৈত্য শিবহুতী খায় ।
 মাতৃগণ দেখি কোপে রক্তবীজ ধায় ॥
 নৃশূরমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া দৈবরী ॥০॥

। ধানশ্রী ।

কেহ উঠে কেহ পড়ে কেহ বা পলায় রড়ে
 বিষম সমরে কেহ যুঝে ।
 কেহ বিজে কেহ কাটে কুহিড়া লাগিল ঠাতে
 কেহ ভরে ছুই চক্ষু বুজে ॥
 দেখি রক্তবীজ রণ পড়িল অশ্রুগণ
 বহুস্রুত না হয় কাতর ।
 পাশে করি কাতি ছুরি হাথে করি ভরোয়ারি
 কোপে লাগে সময় ভিতর ॥
 ক্রিয়া পশিল রণে অনল [৪৩ক] লাগিল বনে
 যেন অলে পবন সহায় ।
 যা দেখে নয়ানকোণে কুপাণে ছুদিগ হানে
 কার গাণ্ডি মুণ্ডি হাথ পায় ॥
 ইন্দ্রাণী সহিত যুঝে কেবল আপন তেজে
 গদাপাণি সৃজিয়া উপায় ।
 বিষম সময় মাঝে উলটিয়া রক্তবীজে
 ইন্দ্রাণী হানিল বজ্রধায় ॥
 বজ্রহত রক্তবীজ ছুটিল স্রুতেজ রক্ত
 তখি কত অশ্রু বিতব ।
 নানা অস্ত্র ধরি ভুজে মাতৃগণ সঙ্গে যুঝে
 বল বীৰ্য্য সদৃশ দানব ॥
 লাফ দিয়া কালী যুঝে হানিল রক্তবীজে
 ক্রধির খসিল ধারে ছুটে ।
 না জানি পড়িল যত ক্রধিরে অগ্নিল কত
 অশ্রু বিস্তার হইল ঠাতে ॥

গলায় রতনমালা ঘন দেই নৌকে তোলা
 বসিয়া রহিল মধ্যখানে ।
 ক্রধিরসম্ভব যত রণ করে অদভুত
 কবিচন্দ্র শ্রীমুকুন্দ ভনে ॥০॥

॥ কাঁপা ॥

সাজলু রে বীর ক্রধিরাজ দিঠে ।
 পক্ষী চলে চরণ বাণ ঘন নাদ পিঠে ॥
 জ্ঞানারি তরোয়ারি রণছুরি টুটে ।
 ঘন ঘান হান হান ধনি শুনি ঠাতে ॥
 শ্রবণান্ত গদকান্ত হস্তা ললাটে ।
 দেবস্ত জনহাস্ত মুখপদ্ম ফুটে ॥
 এক বাণে ছুই তিন অর্ধ দেবী হানে ।
 গিরিবাস পতিদাস কবিচন্দ্র গানে ॥০॥

॥ ছন্দ ॥

চক্রে বৈষ্ণবী তার কাটিলেক মাথা ।
 ইন্দ্রের যুবতী পেলাইয়া মারে গলা ॥
 শক্তি পেলিয়া মারে ময়ূরবাহিনী ।
 শাশিত কুপাণে হানে বরাহরূপিণী ॥
 সমরে পাগল মাছেধরী অবতরে ।
 ত্রিশূলে বিদ্ধিল রক্তবীজ মহাসুরে ॥
 ক্রবিল সমরে রক্তবীজ মহাসুর ।
 একে একে হানে মাতৃগণ নহে দূর ॥
 ত্রিশূল যুঘল গদা শক্তি কেহ মারে ।
 ধরিয়া আপন অস্ত্র যুঝ [৪৩] রে সকলে ॥
 নানা বাস্ত বাজে জয় জয় কোলাহল ।
 তলানি উঠানি রণ ক্ষিতি টলটল ॥
 নৃশূরমালিনী দেবী হরসহচরী ।
 শ্রীযুত মুকুন্দ কহে সেবিয়া দৈবরী ॥০॥

॥ ভূপালী রাগ ॥

বান্দীর চড়ি রক্তবীজ
 দশনে অঘর চাপে ।

পাক দিলে ফিবে	চাক লোচন	রক্তবীজু ভব	যতেক দানব
অরুণমণ্ডল কোপে ॥		ভক্ষণ না কর আন ॥	
খড়া ঝিকৈ	বাণ ঝিকৈ	সমরচক্রে	খাঙ্কিহ সমরে
মেঘ বরিখয়ে নীর ।		তব মুখে বেই লীন ।	
লাখ পাখর	সমরচক্রে	এমত প্রকারে	নাশ হয়ে যদি
যাকৈ আগল বীর ॥		রক্তবীজ রক্তহীন ॥	
চাপ মুকৈ	বাণ ঝিকৈ	এ বোল বলিয়া	বিদ্বিল [৪৪ক] বাণ্ডলী
হৃদয় চপাই রাগ ।		ত্রিশূল তাহার গায় ।	
খান খান করি	কুধির ফিকিহ	রক্তবীজদেহে	সম্ভব শোণিত
তহ সে না ছাড়ে বাণ ॥		কালী মুখ মেলি খায় ॥	
হৃদয় লোলা	রতনমালা	ভবে গদাভুজ	ধায় রক্তবীজ
বুগল গোফে দেই পাক ।		চণ্ডীর উপরে ক্ষেপে ।	
যুঝে মন দেই	রক্তসম্ভব	দেই গদাঘাত	চণ্ডীকে উতপাত
ছাড়ে ঘন ঘন ডাক ॥		না করিলা কিছু কোপে ॥	
রক্ত কণ খসে	অসুরগণ হাসে	শূলহতাসুর	দেহেতে প্রচুর
দেখিয়া সোদর ভাই ।		শোণিত নির্গত হয় ।	
আন্তর পেলিয়া	গগনে লোফুকিহ	তার গতি সেই	নাম প্রচণ্ডাই
তেম্বাই পড়ে ঠাঙ্কি ॥		পুন পুন স্তখে খায় ॥	
বেঢ়ল চৌদিগ	রক্তনৌ কৌশিক	রক্তসম্ভব	যতেক দানব
সঘনে বলে কাট কাট ।		বদনে খাঙ্কিয়া উঠে ।	
বদনে হাত দিয়া	রহিল দেবতা	দশন কামড়ি	হাড় কড়মড়ি
দেখিয়া অসুরের ঠাট ॥		কালিকা পুরিল পেটে ॥	
শ্রীযুত মুকুন্দ	ভনই বামন	নানা অস্ত্র ধরে	বিবিধ প্রকারে
তনয় চণ্ডীর দাস ।		সাহস না ছাড়ে যুঝে ।	
অসুর সকলে	বেঢ়িল জগতি	শূল চক্র বাণে	সাণি ক্রপাণে
চলিতে নাহি অবগাস ॥০॥		চণ্ডী হানে রক্তবীজে ॥	
॥ স্তই রাগ ॥		সহে প্রাণপণে	হুঃখ নাহি মনে
		খাইল বিষম ধা ।	
বগণ পেখি	বলে শশিমুখী	রণভূমি কোপে	ধর ধর কাঁপে
হৃদয় না ভাব ডর ।		মুখে নাহি সরে রা ॥	
হালী কপালিনী	মণ্ডকমালিনী	অহে নুপ স্তন	যুঝে যত জন
বদন বিস্তার কর ॥প্র॥		সকল ত্রিপুরাধীন ।	
মার অস্ত্র হত	সম্ভব রক্ত	বহুমতীতলে	পড়িল দানব
অই মুখে কর পাম ।		রক্তবীজ রক্তহীন ॥	

সন্তোষ মানস হয় দিবৌকস
দৈত্যগণ গেল নাশ ।
অধিকার কাছে মাতৃগণ নাচে
ধায় হাড় রক্ত মাস ॥
রমানাথ চন্দ্র- শেখর সোদর
সনাতন তিন ভাই ।
তুমি নারায়ণী বিশাললোচনী
রক্ষা পরাপর মাই ॥
মিশ্র বিকর্তন সন্তব কারণ
যারে তুষ্ট জিনয়নী ।
হারা বতীজ্ঞত মুকুন্দ অঙ্কুত
রচিল মঙ্গল বাণী ॥০॥

। কানড়া রাগ ॥

অম্বর সুরমোহিনী শিব শিবদগেহিনী
তুরিত অধমোক্ষদায়িনী ।
অভয় বরদায়িনী পাতকনাশিনী
রুচির শূলিনী পাশিনী ॥
মন্তকমালিনী বিশিখচাপিনী
অয় বিম্ববাসিনী চক্রিণী ।
ভকতবৎসবিধায়িনী হিমশৈলনন্দিনী
জিদেবে তুমি ত্রিনয়নী ॥
[৪৪] কুলুপবরবাহিনী রণরুধিরাজিকিনী
নমহঁ মুণ্ডমালিনী ।
জিগুরবরকামিনী জনহৃদয়যামিনী
ব্রহ্মপরবাদিনী নন্দিনী ॥
অভয় বরদায়িনী পাতকনাশিনী
রুচিকর শূলিনী পালিনী ।

প্রণত জনপালিনী মুগতিলকভাষি
দক্ষমুখনাশিনী কারিণী ॥
তৃতীয় গুণ রক্ষিণী ভূজসমর শক্তি
ডমরু অয় শূলিনী বজ্রিণী ।
মুকুন্দ ইতি ভারতী পদকমল সার
রচয়তি বরপিনাকিনী ॥
নমো বিশাললোচনী বিপত্যনারী
নমো দেবী জগন্মোহিনী ॥০॥

॥ মালসী ॥

রণমুখী রুচি দুর্গা রুধিরাজিকিনী ।
শরদিম্বুখী অয় চকোরনয়নী ॥
হরের ঘরগী শিশু মুগতিলকিনী ।
আভরহিতমনা কঙ্কালমালিনী ॥
সদাই বহুত মতি চরণকমলে ।
তোমা না সেবিলে অম্ব বিকল ভূতলে ॥
তব পদকমল রুচির ভবরেণু ।
তুজিলে পৃথিবী বিধি একানেকা তহু ॥
সহশ্রেক ফণে তার রহে নারায়ণ ।
বহুস্ত্রী ভ্রমের ছলে মাথে জ্বলোচন ॥
ত্রিভুবনে যে অনে তোমার নাহি রূপা ।
হুঃখের ভাজন কি করিব মহাতপা ॥
অজ্ঞান তিমির কাল কিরণমালিনী ।
সত্তরজতমমর তৃতীয় রূপিণী ॥
প্রতিদিন না খায় ক্ষুধা জরা মৃত্যু হরে ।
শতমথ দেবতা প্রভৃতি তহিঁ মরে ॥
সতীনাথ শঙ্কর গরল পিয়ে জিয়ে ।
কে জানে তোমার মায়া কবিচন্দ্র কহে ॥
॥ সাত পালা সমাপ্ত ॥